শরদিন্দু অম্নিবাস

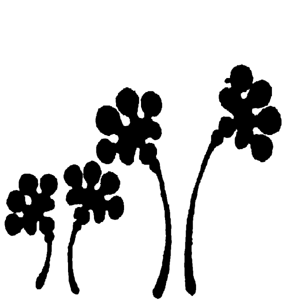

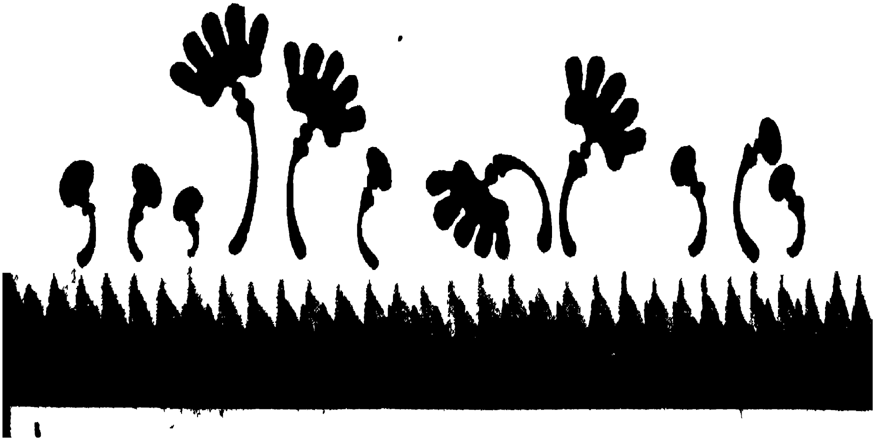

REFERENCE

শরদিন্দু অমনিবাস

চতুর্থ খণ্ড

কিশোর গল্প-সমগ্র

UNDER THE MATCHING
GRANT SCHEME
of R R R. L F
for the Year

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

STATE CENTR'L LIB...
TRIPURA
79601
27.8.82

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

অলঙ্করণ : পূর্ণেন্দু পত্রী
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মদন সরকার

প্রথম সংস্করণ · ডিসেম্বর ১৯৫৪

মূল্য : ৩০ ০০

এক যে ছিল—

মানুষের গল্প বলার অভ্যাস আজকের নয়। মানুষ যেদিন থেকে কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই সে নিজের ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাতে শুরু করে দিয়েছে।

আদিম কালে মানুষ গুহায় বাস করত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, গুহার ভিতর আগুন জ্বলছে, পুরুষেরা তখনও শিকার থেকে ফেরেনি। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের খিদে পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে। মা তাদের কাছে টেনে নিয়ে বলেন—'গল্প বলি শোন্। এক যে ছিল বাঘ—'

প্রথমে গল্প বলতেন মা ঠাকুরমা। তারপর কত হাজার বছর কেটে গেল, এলেন বিষ্ণুশর্মা, ঈশপ। তাঁরাও জীবজন্তু, পশুপক্ষী নিয়ে গল্প বললেন। ক্রমে আলাদিনের প্রদীপ জ্বলে উঠল, বেতালের নৃত্য শুরু হল। গল্পের আসরে প্রবেশ করল ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব পরী-হুরী। কত চমকপ্রদ লোমহর্ষক উপকথা তৈরি হল। পৃথিবীর আদিম গল্প তৈরি হয়েছিল শিশুদের জন্যে, আজও গল্প রচিত হচ্ছে শিশুদের জন্যে। শিশুদের গল্প শোনার আগ্রহে বিরাম নেই।

শিশুদের গল্প শোনানো কিন্তু সহজ কথা নয়। শিশুরা বোঝে কোন গল্পটা ভাল, কোনটা মন্দ। যে গল্প তাদের ভাল লাগে সেটা তারা বারবার শুনতে চায়। গল্পের প্রত্যেকটি কথা তাদের মুখস্থ হয়ে যায়, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যাঁরা গল্প বলেন তাঁদের খুব সাবধানে বলতে হয়।

গল্প সকলে বলতে পারেন না, বিশেষত শিশুদের গল্প। যাঁরা বয়সে বড় হয়েও নিজেদের শৈশবকাল ভুলে যাননি তাঁরাই শিশুদের গল্প বলতে পারেন। তাঁরা জানেন শিশুর মন কী চায়, কিসে আনন্দ পায়।

শিশুরা যখন একটু বড় হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে তখন আবার তাদের গল্পের চাহিদা বদলে যায়। তখন আর বাঘ-ভালুক বুদ্ধু-ভূতুম ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে মন ভরে না। জীবনের সঙ্গে পরিচয় শুরু হয়েছে, জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনা চোখের দৃষ্টিকে রঙিন করে তুলেছে। তারা চায় অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান-বিচিত্র কাহিনী, নূতনত্বের স্বাদ, রোমান্সের গন্ধ। মানুষের জীবন যে কত রহস্যময় কত রোমাঞ্চকর, তাই তারা সারা মন দিয়ে অনুভব করতে চায়।

তারপর কৈশোর পেরিয়ে যখন তারা যৌবনে উপনীত হয় তখনও তাদের গল্পের নেশা কাটে না। কর্মজীবনে শৈশব কৈশোরের গল্পজগৎকে তারা বাস্তব করে তুলতে চায়, গল্প শোনার ভিতর দিয়ে যে আদর্শ অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে তাকে মূর্ত করে তোলে।

আবার বুড়ো বয়সে যখন কর্মশক্তি শেষ হয়ে আসে তখন ছোট-ছোট নাতি-নাতনিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে—'গল্প শোন্। এক যে ছিল রাজা—'

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

বনের বিহঙ্গ	২
পিণ্টু	১২
পুষি-ভুলোর বনবাস	২১
পরীর চুমু	৪০
মোক্তার ভূত	৪৭
রাতের অতিথি	৫৩
সাপের হাঁচি	৬০
টিকিমেধ	৬৯
যাত্রী	৭৬
বিনুর জলপানি	৮৪
জেনারেল ন্যাপলা	৯৪
বীর্যশুল্কা	১০৬
গাধার কান	১১৭
স্বামী চপেটানন্দ	১২৪
আঙুর পরী ডালিম-পরী	১৩০

সূচী

ময়ূরকূট	১৩৬
ঝিলম নদীর তীরে	১৪৬
উভয়-সংকট	১৫৬
স্যমন্তক	১৬৮
ভালুকের বিয়ে	১৭৮
পান্না দিঘির জোড়া রুই	১৮৪
সদাশিবের আদিকাণ্ড	১৯০
সদাশিবের অগ্নিকাণ্ড	২০৫
সদাশিবের দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড	২২০
সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড	২৫০
সদাশিবের ঘোড়া-ঘোড়া কাণ্ড	২৮৫
ভূমিকম্পের পটভূমি	৩০২
নন্দনগড় রহস্য	৩২০
গ্রন্থ-পরিচয়	৩৪৫

শরদিন্দু অম্নিবাস

চতুর্থ খণ্ড

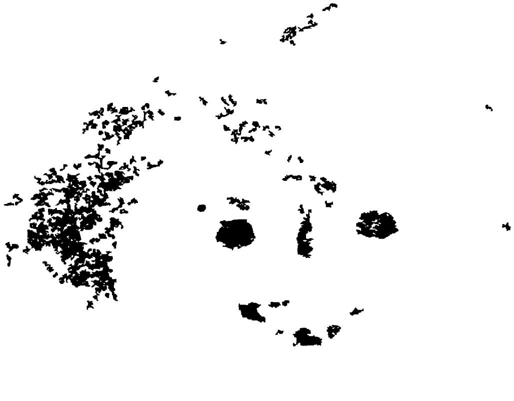

বনের বিহঙ্গ

কঙ্ক ব্যাধের পুত্র। সে অনার্য; নিকষ পাথরের মত কালো সুঠাম তার দেহ—বেতের মত ঋজু অথচ সাবলীল, নিটোল অথচ ক্ষীণ। কৃষ্ণসারের মত দুটি চোখ, মাথার ঝামর কেশ পুষ্পিত লতা দিয়ে পিছনে বাঁধা, হাতে ধনুঃশর। কঙ্কের বয়স তের বৎসর।

উজ্জয়িনী থেকে পনের দিনের পথ দূরে, অবন্তীরাজ্যের সীমানার বাইরে একটি ছোট গ্রামে সে থাকে। গ্রামে সকল জাতির লোকই বাস করে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জালিক, নিষাদ; অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই গ্রামের এক কিনারায় বৃদ্ধ শমীবৃক্ষ যেখানে গ্রামের সীমা নির্দেশ করছে—সেইখানে কঙ্কের ঘর। তার কেউ নেই, বাপ ছিল, সেও সম্প্রতি শিকার করতে গিয়ে চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। কঙ্ক একা। বনে ফাঁদ পেতে সে ময়ূর, বন-কপোত, শশক ধরে আনে, কখনও বা হরিণ মেরে এনে বিক্রি করে। এই তার জীবিকা।

বন-জঙ্গল ছাড়া পৃথিবীতে একজনকে কঙ্ক ভালবাসে,—সে ক্ষত্রিয় বসুদত্তের মেয়ে বট্টা। বট্টা কঙ্কের চেয়ে দুই তিন বছরের বড়, কিন্তু দুইজনের মধ্যে ভারি ভাব। বট্টারও ভাই বোন কেউ নেই, তাই সে কঙ্ককে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসে —সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে তার পাখি ধরবার ফাঁদ তৈরি করে দেয়, নিজের চুল বিনিয়ে কঙ্কের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করে। কঙ্কও বন থেকে হরিণ-শিশু ধরে এনে বট্টাকে দেয়, কত রকমের পাখি নিয়ে আসে, বনের মধ্যে যা-কিছু বিচিত্র বা নূতন পায় তাই বট্টার জন্য সংগ্রহ করে আনে।

কখনো গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে, বনের দিকে চেয়ে চেয়ে কঙ্ক বলে, 'বট্টা, তোর যখন রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, তুই যখন নগরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকবি, তখন আমি কী করব?'

বট্টা মনে মনে জানে সে গরিবের মেয়ে, রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না, তবু বলে, 'তুইও আমার সঙ্গে থাকবি। এখানে আমরা যেমন আছি রাজপ্রাসাদেও তেমনি থাকব। পারবি না?'

কঙ্ক চুপ করে থাকে, জবাব দিতে পারে না। তার মনটা উদাস হয়ে যায়।

এমনিভাবে দিন কাটে।

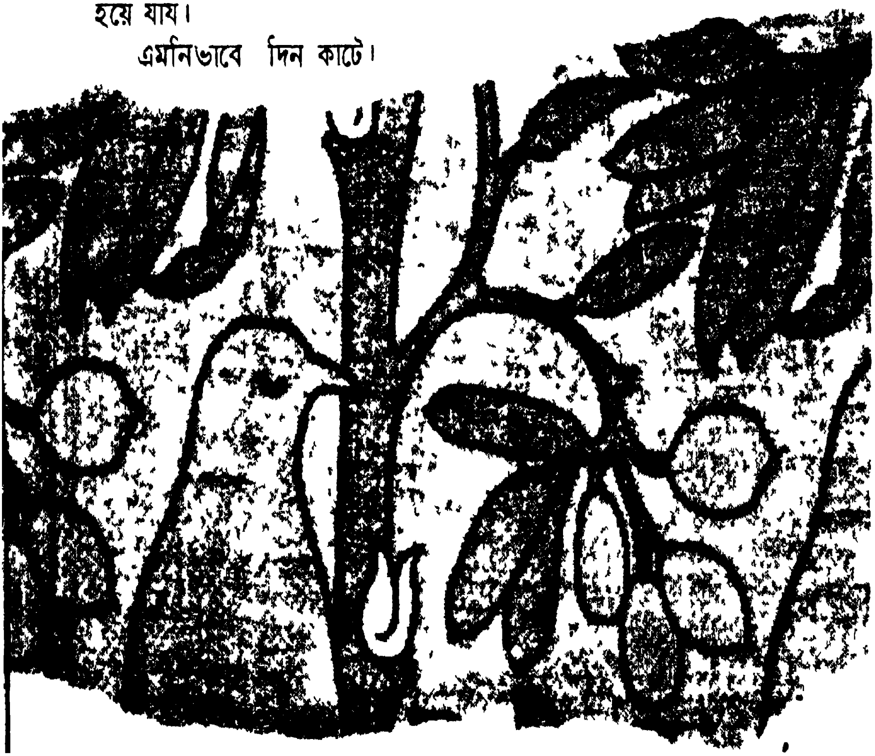

একদিন—তখন শরৎ কাল—কঙ্ক পাঁচ দিন পরে বন থেকে গ্রামে ফিরে এল। এবার সে কিছুই শিকার করে আনতে পারেনি, কেবল তার বাঁ হাতের কব্জির উপর একটি অপরূপ পাখি। পাখির পালকের রঙ দুধের মত সাদা, বাঁকা ঠোঁট পাকা লঙ্কার মত লাল, মাথায় সবুজ রঙের ঝুঁটি। পাখির পায়ের সঙ্গে কঙ্কের আঙুল সুতো দিয়ে বাঁধা—সে মাঝে মাঝে উড়ে পালাবার চেষ্টা করছে, আবার বাধা পেয়ে কঙ্কের মণিবন্ধের উপর এসে বসছে।

কঙ্ক নিজের গৃহে গেল না, একেবারে বসুদত্তের দ্বারে উপস্থিত হল। দেখল, প্রৌঢ় বসুদত্ত দ্বারের সম্মুখে বসে শূন্য দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে আছেন।

জিজ্ঞাসা করল, 'রট্টা কোথায়?'

বসুদত্ত দৃষ্টিহীন চক্ষু ফিরিয়ে কঙ্কের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, 'রট্টা নেই।'

'রট্টা নেই!'—কঙ্কের হাত থেকে ধনুঃশর পড়ে গেল, 'কোথায় গিয়েছে?'

বসুদত্তের মুখ দিয়ে কথা বার হল না, যে পথটি বনের ভিতর দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে গিয়েছে—তিনি নীরবে অঙ্গুলি তুলে সেই পথ দেখিয়ে দিলেন।

কঙ্ক কিছু বুঝতে পারল না, 'ও পথ তো উজ্জয়িনী গিয়েছে।'

বসুদত্তের নিষ্প্রভ চক্ষু সহসা জ্বলে উঠল, বললেন, 'হ্যাঁ—রট্টাও উজ্জয়িনী গিয়েছে। উজ্জয়িনীর রাজকুমার তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আমি অক্ষম—তাকে ধরে রাখতে পারলাম না।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি কঙ্কের দিকে ফিরে বললেন, 'কঙ্ক, তুই রট্টাকে ভালবাসিস?'

কঙ্ক ঘাড় নাড়ল।

বসুদত্ত বললেন, 'তবে তুই এর প্রতিশোধ নে; আমি বৃদ্ধ, আমার বাহুতে শক্তি নেই,—আমি পারব না।—তুই তীর ছুঁড়তে পারিস?'

কঙ্ক মাটি থেকে ধনুঃশর তুলে নিল। সম্মুখেই একটি উঁচু আমলকী গাছে ফল ফলেছিল, কঙ্ক লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ল,—তীর-বিদ্ধ ফল বসুদত্তের পায়ের কাছে পড়ল।

বসুদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণস্বরে বললেন, 'কঙ্ক, তুই পারবি! ভিতরে আয়, সব কথা বলি।'

গৃহের ভিতরে গিয়ে, কঙ্ককে সম্মুখে বসিয়ে বসুদত্ত বলতে লাগলেন, 'চারদিন আগে সন্ধ্যার সময় এক ক্ষত্রিয় যুবক ঘোড়ায় চড়ে আমার দ্বারে এসে দাঁড়াল। তার সুন্দর চেহারা, কিন্তু বেশভূষা সাধারণ লোকের মত। জিজ্ঞাসা করলাম, কী চাও? সে বললে, আজ

রাত্রির জন্য অতিথি হতে চাই।

'আমি তাকে ঘোড়া থেকে নামতে বললাম। সে ঘোড়া থেকে নামল, রট্টা এসে তার ঘোড়া নিয়ে গেল। অতিথির সেবা করা মেয়েদের কাজ, রট্টা যথারীতি অতিথির সেবা করলে। রাত্রে আহারাদির পর আমি অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে আমি ক্ষত্রিয়, দেশভ্রমণে বেরিয়েছি এর বেশি কোন পরিচয় নেই।

'তোমার দেশ কোথায়?

'সে বললে, উজ্জয়িনী।

'আমি বললাম, উজ্জয়িনীর রাজা মহা পাষণ্ড!

'অতিথি চমকে উঠে বললে, আপনি জানেন না- তিনি মহা ধার্মিক।

'আমি বললাম, তিনি আমাকে বিনা দোষে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন—সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। তারই ফলে আমি আজ দরিদ্র—কৃষিজীবী।

'অতিথি আর কোন কথা বললে না। পরদিন সকালে তার বিদায় হবার কথা, কিন্তু সে বিদায় হল না। আমিও অতিথিকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না।

'দুপুরবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখলাম তার ঘোড়া দ্বারের সামনে বাঁধা রয়েছে। বাড়িতে প্রবেশ করতেই সে এসে বললে- আমি আপনার মেয়ে রট্টাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি তাকে আমার হাতে দান করুন।

'আমি বললাম, আমি তোমার হাতে রট্টাকে দেব না।

'সে বললে, কেন? আমি ক্ষত্রিয়, আমি নিতান্ত দরিদ্র নই—

'আমি বললাম, তুমি যদি উজ্জয়িনীর মহারাজাও হও, তবু তোমার হাতে মেয়ে দেব না।

'সে মৃদু হেসে বললে, আর যদি উজ্জয়িনীর রাজকুমার হই?

'—তবু না।

'—তবে শুনুন; আমি উজ্জয়িনীর রাজপুত্র। মহারাজ আমার হাতে রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে চান; তাই রাজদণ্ড গ্রহণ করবার আগে আমি দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। আমি রট্টাকে আমার মহিষী করতে চাই—নতজানু হয়ে আপনার অনুমতি চাইছি।

'রট্টা অদূরে হেঁটমুখে দাঁড়িয়েছিল, আমি তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বললাম। সে আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

'তখন আমি বললাম—তুমি এখনি আমার গৃহ থেকে দূর হও! তুমি আতিথ্যের অবমাননা করেছ। আমি রট্টাকে স্বহস্তে হত্যা করব, তবু তোমার হাতে দেব না।

'সে উঠে দাঁড়াল—বেশ, তবে আমি নিজেই তাকে গ্রহণ করলাম। —এই বলে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'আমি বাইরে এসে দেখলাম, রট্টাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে।

'তীর ধনুক আনতে আবার ঘরের মধ্যে ছুটে এলাম; ফিরে গিয়ে দেখি রট্টাকে নিয়ে সে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

বসুদত্ত নীরব হলেন। কঙ্ক নতমুখে বসে রইল। দীর্ঘকাল পরে ভগ্ন স্বরে বসুদত্ত বললেন, 'কঙ্ক, আমি বৃদ্ধ—আমার পেশীতে শক্তি নেই, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। তুই যদি রট্টাকে ভালবাসিস তবে এর প্রতিশোধ নে।'

কঙ্ক মুখ তুলল, বললে, 'কী করতে হবে?'

বসুদত্ত নিজের তূণীর থেকে দুটি তীর বার করে কঙ্ককে দিলেন, বললেন, 'তুই উজ্জয়িনী যা, যে রট্টাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, একটি তীর তার জন্য, আর—'

'আর?'

'অন্যটি রট্টার জন্য'—বলে বসুদত্ত অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

কঙ্ক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রট্টাকে ফিরিয়ে আনব না?'

'না, সে পিতৃদ্রোহিনী—তাকে ফিরিয়ে আনিস না।' বলে বসুদত্ত দ্রুতপদে সে স্থান থেকে চলে গেলেন।

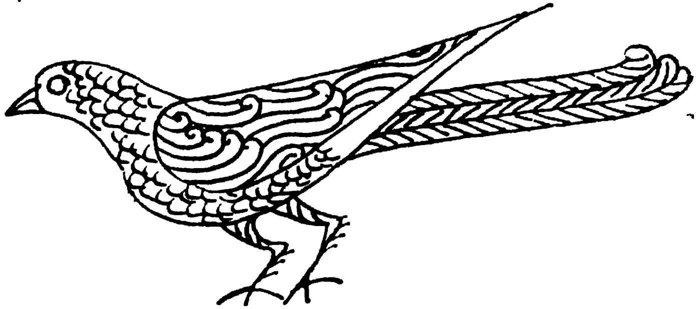

এক হাতে পাখি, অন্য হাতে ধনুঃশর—কঙ্ক একদিন সকালবেলা উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হল। পাখিটি এই একপক্ষ সময়ের মধ্যে বেশ পোষ মেনেছে; এখন আর তাকে বেঁধে রাখতে হয় না, সে আপনি এসে কঙ্কের কাঁধে বসে। কঙ্ক তাকে বুলি শিখিয়েছে, সে কেবল বলে—রট্টা! রট্টা! রট্টা!

এই কয়দিন বনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে কঙ্ক কেবল রট্টার কথাই ভেবেছে। রট্টাকে যে হরণ করে নিয়ে গেছে তাকে বধ করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু রট্টাকেও মেরে ফেলতে হবে এমন আদেশ বসুদত্ত কেন দিলেন? অনেক ভেবে কঙ্ক স্থির

করল যে রট্টাকে মারবার প্রয়োজন নেই; বসুদত্ত বলেছেন রট্টাকে ফিরিয়ে আনিস না। বেশ, তাই হবে। রট্টার হরণকারীকে বধ করে সে রট্টাকে নিয়ে বনে ফিরে যাবে—দু'জনে বনের মধ্যে থাকবে, এক-সঙ্গে শিকার করবে, আর গ্রামে ফিরবে না। তাহলেই তো বসুদত্তের আদেশ রক্ষা করা হবে।

কঙ্ক বনের প্রাণী, কখনও নগর দেখেনি; উজ্জয়িনীর মত জনাকীর্ণ নগরে এসে সে যেন দিশাহারা হয়ে গেল। চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, কারুকার্যমণ্ডিত উচ্চ মন্দির, সুরম্য উদ্যান,—দেখে কঙ্কের মাথা ঘুরে গেল। এত বড় স্থানে, এত লোকের মধ্যে সে রট্টাকে কেমন করে খুঁজে বার করবে?

পথ চলতে চলতে কঙ্ক জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'রট্টা কোথায় তোমরা জান?—রট্টাকে কেউ দেখেছ?—খুব সুন্দর মেয়ে, চিবুকে কালো তিল আছে—রট্টাকে তোমরা কেউ চেনো না?'

সকলে হাসে, রট্টার সংবাদ কেউ দিতে পারে না। কেউ-কেউ বলে, 'জংলী ছেলে, রট্টাকে আমরা চিনি না। তোর পাখিটা ভারি সুন্দর—বিক্রি করবি?'

কঙ্ক পাখি বিক্রি করে না। এ পাখি যে রট্টার জন্য এনেছে—কী করে বিক্রি করবে?

ঘুরতে ঘুরতে শেষে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে একটা কথা হঠাৎ কঙ্কের স্মরণ হল—রাজপুত্রের খোঁজ নিলেই রট্টার সন্ধান মিলবে। সে শূলধারী প্রতীহারীকে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজকুমার কোথায়?'

প্রতীহারী বলল, 'রাজকুমার এখন উজ্জয়িনীতে নেই।'

'কোথায় গিয়েছেন?'

'তিনি এখন নব-পরিণীতা বধূ-দেবীকে নিয়ে শৈলদুর্গে বিরাজ করছেন।'

'শৈলদুর্গ কোথায়?'

প্রতীহারী সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কী চাস?'

কঙ্ক বলল, 'আমি নব-পরিণীতা বধূ-দেবীর জন্য পাখি এনেছি,—রাজকুমারকে বিক্রি করব।'

প্রতীহারী তখন পথ বলে দিল—নগরের বাইরে রেবার তীরে, টিলার মাথায় শৈলদুর্গ আছে, সেখানে রট্টাদেবী আর কুমার আনন্দে বাস করছেন।

তখন দক্ষিণ তোরণ-পথে নগর থেকে বার হয়ে কঙ্ক রেবার তীর ধরে চলল। চলতে চলতে মধ্যাহ্ন কেটে গেল; ক্ষুধার উদ্রেক হলে কঙ্ক অঞ্জলি ভরে রেবার জল পান করে আবার চলতে লাগল।

এইভাবে শৈলদুর্গের নিকটে যখন উপস্থিত হল তখন রেবার জল অস্তমান সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে টলমল করছে। রেবার জল থেকেই ছোট একটি পাহাড় মাথা তুলেছে, তার চূড়ায় শৈলদুর্গ --দেখলে মনে হয় যেন নদী এই দুর্গটির পা ধুইয়ে দিচ্ছে।

পাহাড়ের উপরে উঠবার একটিমাত্র পথ; তার মুখে প্রহরীর ঘাঁটি। কংক উপরে যেতে চাইল, কিন্তু প্রহরীরা তাকে যেতে দিল না; বলল, 'এখন কমারের সঙ্গে দেখা হবে না; কাল সকালে আসিস।'

কংক অনেক মিনতি করল, কিন্তু প্রহরীরা পথ ছেড়ে দিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। কংক শৈলদুর্গের পাদমূল চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখল কোথাও উপরে উঠবার পথ নেই; কর্কশ, নগ্ন পাহাড় সোজা ঊর্ধ্বদিকে উঠে গিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যে পাহাড় অলঙ্ঘনীয় কংকের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। অনেক খুঁজে খুঁজে কংক দেখল, নদীর দিকে একটা স্থানে পাহাড় তেমন খাড়া নয়, মাঝে মাঝে পা রাখবার জায়গা আছে--চেষ্টা করলে উঠতে পারা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে কংক উঠতে আরম্ভ করল।

অনেক কষ্টে, অনেকবার পা ফসকে কংক যখন উপরে উঠল--তখন পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, নিম্নের শিলা শংকুল দৃশ্য যেন কুয়াশায় আবছায়া হয়ে গেছে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠেও কংক বিশেষ সুবিধা করতে পারল না --সামনেই বিশহাত উঁচু দুর্গ-প্রাচীর। দুর্গদ্বার দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে সেখানকার রক্ষীরা ধরে ফেলবে, অথচ প্রাচীর ডিঙিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। এখন উপায়!

চক্রাকৃতি প্রাচীরের তলা দিয়ে শিকারীর মত সন্তর্পণে কংক চলতে লাগল। এক সময় মুখ তুলে দেখল, ঠিক প্রাচীরের উপরেই একটি প্রাসাদের শুভ্র দেয়াল চাঁদের আলোয় ঝক্ঝক্ করছে। দেয়ালের গায়ে একটি মুক্ত বাতায়ন, সেই বাতায়ন দিয়ে দীপের আলো বাইরে আসছে। কংক দূরে সরে গিয়ে ভিতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করল; কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

হঠাৎ এই সময় পিছন থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। কংকের পাখি তার কাঁধের উপর বসে ছিল, প্যাঁচার চিৎকারে ভয় পেয়ে সে উড়ে গেল। পাখা ছট্ফট্ করতে করতে প্রাকারের গায়ে গিয়ে পড়ল, তারপর 'রট্টা' বলে ডেকে মুক্ত জানলা-পথে কক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্ষণকাল পরে একটি মুখ বাতায়নে দেখা দিল, সেই মুখ দেখে কংকের বুকের রক্ত নেচে উঠল। সে কোনোমতে উত্তেজনা দমন করে চাপা গলায় ডাকল, 'রট্টা!'

বট্টা নিচের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'কে?'

'আমি কঙ্ক!'

বট্টা আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'কঙ্ক ভাই! তুই এসেছিস? আমি জানতাম! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? শীঘ্র ভিতরে আয়।'

'কোন্ পথে যাব?'

'কেন, দুর্গের তোরণ দিয়ে।'

'প্রহরীরা যেতে দেবে না। আমি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছি। বট্টা, তুই জানলা দিয়ে একটা দড়ি ফেলে দে, আমি এখনি তোর কাছে যাচ্ছি।'

বট্টা হেসে বলল, 'আচ্ছা।' তারপর নিজের দেহ থেকে উত্তরীয় খুলে তার একটা প্রান্ত নিচে ফেলে দিল। মুহূর্তমধ্যে কঙ্ক সেই উত্তরীয় ধরে উপরে উঠে বট্টার ঘরে প্রবেশ করল।

বট্টার ঘর দেখে কঙ্ক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঘরের মেঝেয় মণিমুক্তার কাজ করা, সোনার শিকল দিয়ে ছাদ থেকে স্ফটিক-দীপ ঝুলছে; গজদন্তের পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা পাতা—তার চারিধারে মোতির ঝালর।

বট্টা সানন্দে কঙ্ককে হাত ধরে টেনে এনে পালঙ্কে বসালো, বলল, 'কঙ্ক ভাই, তুই তাহলে আমাকে ভুলে যাসনি? চলে আসবার সময় তোকে দেখতে না পেয়ে বড় দুঃখ হয়েছিল। তুই কী করে এখানে এলি?—গাঁয়ের সকলে কেমন আছে?—বাবা কেমন আছেন?'

বট্টা বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই কঙ্কের মনে পড়ল কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে সে উজ্জয়িনীতে এসেছে। ধনুক কাঁধেই ছিল, হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বট্টা, যে তোকে হরণ করে এনেছে সে কোথায়?'

বট্টার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল, সে বলল, 'কেন? তাকে কী দরকার?'

দাঁতে দাঁত চেপে কঙ্ক বলল, 'তাকে আমি চাই—তাকে—'

এই সময় একটি সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ কক্ষে প্রবেশ করলেন। কঙ্ককে দেখে বললেন, 'এ কে?'

বট্টা বলল, 'ও আমার ভাই কঙ্ক; তোমাকে ওর কথা বলেছি।'

'তুমিই কঙ্ক?' যুবক হাস্যমুখে তার দিকে অগ্রসর হলেন।

কঙ্ক বলল, 'দাঁড়াও। তুমি বট্টাকে জোর করে ধরে এনেছ?'

যুবক হেসে বললেন, 'অপরাধ স্বীকার করছি।'

'তবে দাঁড়াও—' বলে কঙ্ক ধনুকে শরসংযোগ করল।

বট্টা ভীত স্বরে বলল, 'কঙ্ক, ও কী করছিস? উনি যে আমার স্বামী! তুই কি পাগল হলি?'

কঙ্কের দুই চক্ষু জ্বলতে লাগল, সে বলল, 'বসুদত্তের আদেশ, যে তোকে হরণ করেছে তাকে হত্যা করতে হবে।' বলে ধনুক তুলল।

রট্টা ছুটে গিয়ে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াল, বলল, 'তবে আমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে হত্যা কর।—বাবার আদেশ? কঙ্ক, তুই জানিস না, বাবার কাছে দূত গিয়েছে, তাঁর নির্বাসন-দণ্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকে মহারাজা উজ্জয়িনীর মহাদণ্ডনায়ক নিযুক্ত করেছেন—'

কঙ্ক বলল, 'আমি তা জানি না—বসুদত্তের আদেশ—যে তোকে—'

রট্টা কেঁদে বলল, 'বেশ, তবে আমাকে আগে হত্যা কর; তোর বোনের বুকে আগে তীর বিঁধে দে।'

রট্টার জন্যও বসুদত্ত একটা তীর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেকথা কঙ্কের মনে পড়ল না। তার বুকের মধ্যে কান্নার উচ্ছ্বাস গুমরে উঠল, শিথিল হাত থেকে ধনুক খসে পড়ল। সে কিছুক্ষণ অসহায়ের মত চেয়ে থেকে শেষে বলল, 'রট্টা, তুই সুখে আছিস?'

রট্টা নীরবে ঘাড় নাড়ল।

'ও তোকে কোনো কষ্ট দেয় না?'

সজল নয়নে হেসে রট্টা বলল, 'না, কষ্ট দেয় না।'

'তোর গাঁয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?'

'না।'

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে কঙ্ক যুবাপুরুষকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করল, 'তুমি রট্টাকে ভালবাসো?'

যুবক স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'চিরদিন ভালবাসবে?'

'হ্যাঁ, বাসব।'

'কখনো কষ্ট দেবে না?'

'না।'

কঙ্ক ক্ষণকাল হেঁটমুখে থেকে একটু হাসি টেনে বলল, 'আচ্ছা, তাহলে তোমাকে মারব না।'

রট্টা ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কঙ্ক ভাই!'

এই সময় পাখিটা বলে উঠল, 'রট্টা! রট্টা! রট্টা!'

সকলে চমকে ফিরে দেখল, পাখিটা পালঙ্কের শিথানের উপর বসে আছে। কঙ্ক গিয়ে তাকে ধরে আনল, তারপর রাজকুমারের হাতে দিয়ে বলল, 'এই পাখিটা রট্টার জন্য জঙ্গল থেকে ধরে এনেছিলাম— তোমাকে দিলাম।'

অপরূপ পাখি দেখে দু'জনে খুব আহ্লাদিত হলেন। রাজকুমার রট্টাকে বললেন, 'রট্টা, কঙ্ককে ছাড়া হবে না, ও আমাদের কাছেই থাকবে।'

রট্টা বলল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছা। বাবাও আসবেন; বেশ হবে, সকলে উজ্জয়িনীতে থাকব।'

কুমার বললেন, 'সেই ভাল। কঙ্ক যে-রকম বীর, ওকে আমি আমার প্রধান শিকারী নিযুক্ত করলাম। কী বল কঙ্ক, পারবে তো?'

কিন্তু কঙ্ক কোথায়? দু'জনে ফিবে দেখলেন—ঘরে কঙ্ক নেই। সে যে-পথে এসেছিল সেই পথ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেছে।

সে বনের বিহঙ্গ—তাই রট্টা আজ তাকে ধরে রাখতে পারল না।

কে জানে, হয়তো বনে-বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রট্টার জন্য যখন তার প্রাণ কাঁদবে তখন সে আবার উজ্জয়িনীতে এসে রট্টাকে দেখে যাবে। হয়তো আবার একটি অপরূপ পাখি উপহার দিয়ে যাবে। কিন্তু চিরজীবনের জন্য পায়ে শিকল পরতে পারবে না।

পিণ্টু

আমার একটা দু'নলা বন্দুক আছে। বারো বোরের বন্দুক, ব্রীচ্-লোডিং—অর্থাৎ গাদা বন্দুক নয়। দিশী মিস্ত্রী এই বন্দুক তৈরি করেছে—কিন্তু এত সুন্দর জিনিস যে বিলিতি বন্দুকের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। দেড়শো গজ পর্যন্ত তার পাল্লা—পয়েন্ট ব্ল্যাংক—এ দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁস মারা যায়, যদিও এটা হাঁস-মার বন্দুক—ডাক গান—নয়। এই বন্দুকটি আমার বড় প্রিয়।

পাখি শিকার করতে আমি বড় ভালবাসতুম। শীতকালে যখন খালে বিলে নানা জাতের হাঁস পড়তে আরম্ভ করত তখন আমি বন্দুক কাঁধে করে বার হতুম। সে সময় আমার সংগী থাকত কেবল আমার

কুকুর—পিণ্টু। পিণ্টু খাঁটি দিশী কুকুর—তার গায়ে এক ফোঁটাও বিলিতি রক্ত ছিল না, ইচ্ছে করলে তোমরা তাকে নেড়ি কুত্তাও বলতে পার। তার চেহারাটি ছিল রোগা, গায় সাদা কালো ছাপ মুখটি ছুঁচোলো চোখে একটি ভীত সংকুচিত ভাব। সত্যি কথা বলতে কি, পিণ্টু খুব সাহসী কুকুর ছিল না, ভিনপাড়া দিয়ে যাবার সময় তার ল্যাজটি অলক্ষিতে পিছনের পা দুটির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করত আর পাড়ার কুকুরগুলো যখন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসত তখন সে কেবলি আমার পাশে ঘেঁষে ঘেঁষে আসত আর গলার মধ্যে গরর গরর শব্দ করত। দাদা বলতেন শুধু দুধ ভাত খেয়ে খেয়েই

পিণ্টুর সব সাহস মিইয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, পিণ্টুর একটি অসাধারণ গুণ ছিল; সে খুব ভালো মরা পাখি উদ্ধার করতে পারত। গুলি খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেখানেই পড়ুক—জলে স্থলে কিম্বা পাঁকের মধ্যে—পিণ্টু ঠিক তাকে মুখে করে নিয়ে আসবে। ইংরিজিতে এই জাতের কুকুরকে বলে রিট্রিভার। একবার এক সাহেব পিণ্টুর আশ্চর্য গুণপনা দেখে দুশো টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিল। আমি দিইনি।

যাহোক, শীতকাল এলেই আমরা দু'জনে শিকারে বার হতুম। এমন অনেকবার হয়েছে যে, পাখির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছি, দু'তিন দিন বাড়ি ফেরাই হল না। আমার শিকারের শখ বাড়ির সকলে জানতেন, তাই উদ্বিগ্ন হতেন না।

গত বছর শিকার করতে গিয়ে কি ব্যাপার হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

খবর পেলুম, শহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে যে জলা আছে তাতে বিস্তর হাঁস পড়েছে; হাঁসগুলো আশেপাশের ধানক্ষেতের ক্ষতি করছে। মন উৎসুক হয়ে উঠল। অঘ্রাণ মাস—বেশ শীত পড়েছে. একদিন সকালবেলা পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অজ পাড়াগাঁয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা নেই—যেতে হলে এক গরুর গাড়ি চড়ে যেতে হয়। আমরা পায়ে হেঁটেই গেলুম, কারণ গরুর গাঁড়ি চড়ে কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে বিশ মাইল যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর। অন্তত হাড়গুলো আস্ত থাকে।

জলার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে যখন পেঁছিলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়—পশ্চিম আকাশে একটুখানি সোনালী আলো ঝিলমিল করছে। দূর থেকেই অসংখ্য হাঁসের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। হাঁসের ডাক সকলের ভালো লাগে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমার বড় মিষ্টি লাগে। দেহের ক্লান্তি সত্বেও মনটা আনন্দে নেচে উঠল। পিণ্টুও আমাকে ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

গ্রামে বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস কিন্তু একটি ছোট্ট পোস্ট অফিস ছিল। তারই পোস্টমাস্টারের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করলুম। তিনি ভারি ভদ্রলোক—গরম চা এবং প্রচুর জলখাবার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। গরম গরম খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়তেই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

 নানারকম কথাবার্তায় ক্রমে রাত্রি হয়ে গেল, পূবের আকাশ

উদ্ভাসিত করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। আমি তখন পোস্টমাস্টারবাবুকে বললুম, 'এবার বেরুনো যাক। কোন্ দিক দিয়ে গেলে সহজে জলায় পোঁছনো যাবে আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমার কাঁধে বন্দুক দেখেই পোস্টমাস্টার বুঝেছিলেন যে আমি শিকার করতে এসেছি কিন্তু আমি সে-রাত্রেই পাখি মারতে বেরুব তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'রাত্তিরে পাখি মারতে যাবেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ—রাত্তিরেই তো পাখি মারবার সুবিধা, দেখছেন না কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।'

পোস্টমাস্টার একটু ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'কিন্তু রাত্তিরে জলার দিকে যাবেন? সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যায় না।'

'সেকি! কেন?'

তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কি জানি মশায়, আমি চোখে কিছু দেখিনি। শুনতে পাই জলায় নাকি অপদেবতা আছেন।'

আমি হেসে উঠলুম, 'অপদেবতা! সে আবার কি?'

তিনি বললেন, 'তা জানিনে মশাই, তবে শুনেছি শরবনের মধ্যে নাকি পেত্নী আছে।'

আমি হাসতে লাগলুম, বললুম, 'তা থাক পেত্নী। আমার হাতে বন্দুক আছে দেখলে সে নিজেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'যাওয়া বোধহয় উচিত নয়। একবার এক সাহেব আপনারই মত রাত্তিরে জলায় শিকার করতে গিয়েছিল, সে আর ফিরে আসেনি।'

আমি বললুম, 'কোনো ভয় নেই—আমি এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। আপনি শুধু আমায় পথটা দেখিয়ে দিন।'

তিনি তখন অনিচ্ছাভরে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত এসে আমায় জলা দেখিয়ে দিলেন। জলাটা সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে—চাঁদের আলো তার ওপর ঝক্ ঝক্ করছে আর ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট পাখির সারি তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

চাঁদনী রাতে জলার ধারে কি করে পাখি শিকার করতে হয় তা বোধহয় সকলে জানে না; অথচ ব্যাপারটা খুব সহজ—এমন কি দিনের বেলা পাখি শিকার করার চেয়েও সহজ। রাত্রে জলার পাখিরা চোখে ভাল দেখতে পায় না কিন্তু কেবলই উড়ে বেড়ায়—জলার এধার থেকে ওধারে যায় আবার এধারে ফিরে আসে। তাই, চাঁদ যখন গাছের ডগা ছাড়িয়ে ওঠে তখন সেই চাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকে টোটা ভরে কোন ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পাখির সার যখন চাঁদের কাছ দিয়ে উড়ে যায় তখন চাঁদ লক্ষ্য করে বন্দুক

ছুঁড়তে হয়। ছর্‌রা খেয়ে পাখিগুলো ধপ্‌ ধপ্‌ করে মাটিতে পড়ে তখন কুকুর গিয়ে সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসে। এ রকম শিকারের সুবিধা এই যে পাখির পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে হয় না. এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অনেক পাখি পাওয়া যায়।

যাহোক. আমি আর পিণ্টু আলের ওপর দিয়ে জলার দিকে চললুম। বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু আমার গায়ে গরম কোট হাফ্‌-প্যাণ্ট্‌ ছিল. পায়ে হোস্‌ আর বুটজুতো ছিল. তাই ঠাণ্ডা হাওয়া ভালই লাগল। পকেটে গোটা কুড়ি চার নম্বরের কার্তুজ নিয়েছিলুম—আশা ছিল তাইতেই আজকের মত কাজ চলে যাবে।

ক্রমে জলার কাছে এসে পড়লুম। এখানকার মাটি নরম. মাঝে মাঝে জল সরে গিয়ে আধ-শুকনো পাঁকও রয়েছে। জলাটা প্রকাণ্ড—একটা হ্রদ বললেও চলে; কিন্তু জল খুব গভীর নয়। তার কিনারা ঘিরে ঘন শরবন জন্মেছে. মাঝখানেও স্থানে স্থানে শরের গোছা উঁচু হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটা এমন অস্পষ্ট হয়ে আছে—যেন পৃথিবীর আদিম যুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির চিত্র। দেখলে প্রাণের ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

জলের কিনারা পর্যন্ত যাবার কোনো দরকার ছিল না. চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কতকগুলো কাঁটাগাছের শুক্‌নো ঝোপ ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। তারই মধ্যে একটা বেছে নিয়ে আমি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। বন্দুকে টোটা ভরে পাখির জন্যে তৈরি হয়ে রইলুম।

এইবার পিণ্টুর চালচলন লক্ষ্য করলুম। সে এতক্ষণ বেশ লাফালাফি করতে করতে আমার সংগে আসছিল কিন্তু এখানে এসেই কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল। তার ল্যাজটি করুণভাবে পায়ের মধ্যে প্রবেশ করল. সে শঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা ক্ষীণ কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম. অন্য কোনো কুকুর বা ভয়াবহ কিছুই নেই। ভাবলুম. জলার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্চয়ই তার শীত করছে. তাই অমন করছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি. হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলুম। জলার কিনারা দিয়ে একটা খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে—যেন একটা বিকট হাসির আওয়াজ! কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, শরবনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। এই খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল. দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল. কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের মত একটা শব্দ তখনো শরবনের ভিতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমার ভারি হাসি পেল—এইসব শব্দ শুনেই বোধহয় গাঁয়ের

লোকেরা ভূত-পেত্নীর ভয়ে এদিকে আসে না।

আবার শব্দ! এবারের শব্দ এমনি অপার্থিব যে শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বহুদূর জলার বুক থেকে একটা দীর্ঘ কান্নার সুর, যেন কোনো স্ত্রীলোক কেঁদে উঠল—'আহা—হা—হা হা'—চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে এই কান্না ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

জলাতে অনেক রকম অজানা পাখি থাকে, মনে হল হয়তো তাদেরই কেউ অমন করে কেঁদে উঠল। কিন্তু আমি অনেক পাখি মেরেছি, অনেক ঝিলে জংগলে বেড়িয়েছি, এরকম পাখির ডাক কখনো শুনিনি। একবার মনে হল, পাখি বটে তো? পিন্টুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে আমার পা ঘেঁষে এসে বসেছে আর তার শরীব থরথর করে কাঁপছে। আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে বললুম, 'কিছু ভয় নেই পিন্টু –ও পাখির ডাক।'

পিন্টু করুণভাবে আমার দিকে তাকাল, তারপর ছুটে গাঁয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিবে এসে ব্যগ্র চোখে আমার পানে চেয়ে রইল। কুকুর কথা কইতে পারে না, কিন্তু পিন্টু যেন পরিষ্কাব আমাকে বললে--'ফিরে চল, এ বড় খারাপ জায়গা, এখানে থেকে কাজ নেই।

হায়! পিন্টুর কথা যদি শুনতুম!

হাতের ঘড়িতে দেখলুম, সাড়ে নটা বেজেছে। এই সময় আকাশে শন্-শন্ শব্দে মুখ তুলে দেখি এক ঝাঁক পাখি বোধ হয় মোরগাবি, কারণ মোরগাবিরা এত জোরে ওড়ে যে তাদের ডানাব সাঁই-সাঁই আওয়াজ হয়—চাঁদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে ফায়ার করলুম—চারিদিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি উঠল। তারপর ধপ্ করে একটা শব্দ হল। বুঝলুম পাখি পড়েছে।

পাখি পড়ার শব্দে পিন্টুর ভয় কেটে গেল। সে কান খাড়া করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে যেদিকে পাখি পড়েছিল সেইদিকে ছুটল।

পাখিটা পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিল, পিন্টু সেই ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর চোঁ-চোঁ করে পালিয়ে এসে আমার জুতোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি হয়েছে পিন্টু? পালিয়ে এলি যে?' তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি তার ঘাড়ের রোঁয়া কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে।

পিন্টু কখনও এ রকম করে না, তাই ভারি আশ্চর্য হয়ে আমি নিজেই সেই ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলুম। কাঁটাগাছের ঝোপে পাতা নেই, তার ভিতরে পরিষ্কার চাঁদের আলো পড়েছে। ঝোপের দশ

হাতের মধ্যে গিয়ে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম মরা পাখিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর সাদা কাপড় পরা একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি তার উপর ঝুঁকে পড়ে যেন তাকে আগলে রয়েছে।

এই সময় আবার সেই তীব্র কাতরোক্তি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—'আহা—হা—হা——হা—'

ভয়ের একটা শিহরণ আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কে ও? মানুষ না আর কিছু? অমন করে কেঁদে উঠল কেন?

প্রাণপণে ভয় দমন করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

আবার সেই বুক-ফাটা কান্না—'আহা—হা—হা—হা—'

আমি জড়মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলুম; ইচ্ছে হল পালাই, কিন্তু পালাতে পারলুম না। আমার দুই চোখ সেই ঝোপের মধ্যে নারী-মূর্তির ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।

হঠাৎ নারীমূর্তি উঠে দাঁড়াল, ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি তার মুখ দেখতে পেলুম না, সর্বাঙ্গ কুয়াশার মত সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সে একটা সাদা হাত তুলে আমায় ডাকলে তারপর নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

খানিক দূর গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর আবার হাত তুলে আমায় ডাকলে। আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যেন একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কলের পুতুলের মত আমি তার পিছন পিছন চললুম।

পিণ্টু এতক্ষণ অনেক দূরে পিছিয়ে ছিল, এবাব সে ছুটে এসে আমার পা কামড়ে ধরলে। ভয়ে তার গা কাঁপছে, শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, তবু সে আমায় ফেলে পালাতে পারছে না। আমার পা কামড়ে ধরে পিছন দিকে টানতে লাগল, যেন কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না।

কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণ লোহাকে যেমন টেনে নিয়ে যায়, আমিও তেমনি অন্ধভাবে সেই মূর্তির অনুসরণ করলুম। পিণ্টু পদে পদে বাধা দিতে লাগল, পায়ের কাছে পড়ে কেঁউ কেঁউ করে মিনতি জানাতে লাগল, তবুও আমার গতিরোধ করতে পারল না।

ক্রমে তল্‌তলে নরম পাঁকের ওপর এসে পড়লুম। সে যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তা বর্ণনা করা যায় না। আর এই পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে মরার মত ভয়াবহ মৃত্যুও কল্পনা করা কঠিন। আমি কিন্তু কোথায় যাচ্ছি কিছুই জ্ঞান ছিল না, কেবল সেই মূর্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ক্রমে যখন পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগল তখন দাঁড়িয়ে পড়লুম। মূর্তিও সামনে খানিক দূরে দাঁড়াল। তারপর আবার সেই রক্ত-জল-করা আওয়াজ—'আহা—হা—হা—হা'। এবার কিন্তু কান্না নয়, মনে হল যেন সে একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসার হাসি হাসছে।

আমি আর এগিয়ে যাচ্ছি না দেখে মূর্তি দু'এক পা ফিরে এল, খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। ওদিকে আর বেশী এগোলে এই অতল পাঁকের মধ্যেই ডুবে যাব বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু ঐ হাতছানি অমান্য করবার সাধ্য নেই। বন্দুকটা এতক্ষণ হাতেই ছিল, এবার ফেলে দিলুম। তারপর পাগলের মত সেই পাঁকের ভিতর দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললুম।

পিণ্টু! এই সময় পিণ্টু যে অদ্ভুত কাজ করলে তা জীবনে কখনো ভুলব না। সে এতক্ষণ আমার পিছন পিছন আসছিল, কিন্তু যখন দেখলে যে আমি উরু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছি তখন সে হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করে আমার সামনে এল। আমি দেখলুম, তার সর্বাঙ্গের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে আর সে হিংস্র ভাবে দাঁত বার করে সেই মূর্তির পানে ছুটে চলেছে।

সাদা মূর্তিটার সামনে পেঁাছে সে কণ্ঠ লক্ষ্য করে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত কম্পিত চীৎকার পিণ্টুর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল। যাকে লক্ষ্য করে সে লাফ দিয়েছিল সেই মূর্তি হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; পিণ্টু কোথাও বাধা না পেয়ে কাদায় পড়ে গেল। আর উঠল না।

'পিণ্টু! পিণ্টু!'—আমি আত্মহারার মত ছুটে গেলুম যেখানে পিণ্টু পড়ে ছিল। সেখানে পাঁক তত গভীর নয়, তলায় শক্ত মাটি আছে। পিণ্টুর নিশ্চল দেহ দু'হাতে তুলে নিয়ে দেখলুম তার দেহে প্রাণ নেই—সে মরে গিয়েছে। সেই যে ভয়ার্ত চীৎকার—তারই সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সেই সাদা মূর্তি কোথাও নেই—যেন

জলাভূমি থেকে উত্থিত একটা দুষ্ট বাষ্প আবার জলাভূমিতেই মিলিয়ে গিয়েছে।

'পিণ্টু! পিণ্টু!' বলে তার কাদা-মাখা শরীর বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে জ্ঞান হল। তখনও পিণ্টুর মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে আছি।

সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা আর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে একলা বাড়ি ফিরে এলুম।

ক্রমে সেরে উঠলুম। এখনও মাঝে মাঝে শিকারে যাই, কিন্তু আমার পিণ্টু নেই, শিকারে মন লাগে না।

যখন মনে হয় পিণ্টু আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে—দারুণ ভয়ে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেছে, কিন্তু তবু ভালবাসা এক্তিল কমেনি—তখন কান্নায় বুক ভরে ওঠে।

পিণ্টু সাহসী কুকুর ছিল না; কিন্তু দরকারের সময় তার মত সাহস ক'জন দেখাতে পেরেছে?

79601
17.8.85
21 Rs. 30.00

পুষি-ভুলোর বনবাস

গ্রামের ঠিক কিনারা থেকেই বলতে গেলে বন আরম্ভ হয়েছে। প্রথমটা ফাঁকা-ফাঁকা, এখানে একটা গাছ ওখানে একটা গাছ, তারপর ক্রমে নিবিড় জঙ্গল। বড় বড় ঝাঁকড়া মাথা গাছ স্তম্ভের মতন আকাশের পানে উঠে গেছে, তাদের পাতায় পাতায় জড়াজড়ি মেশামেশি, ডালে ডালে পাক খেয়ে গেছে—কুস্তিগির পালোয়ানদের হাত পা যেমন পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে যায়। নীচে ঘন ঘাস, লতা, কাঁটার ঝোপ আর অন্ধকার। কত জন্তু এই গহন বনের মধ্যে আছে তার ঠিকানা নেই। হাতী আছে, বাঘ আছে, ভল্লুক আছে, অজগর তার বিরাট অনড় শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। দিনের বেলা কেউ তাদের দেখতে পায় না, রাত্রে গাঁয়ের লোকেরা শুনতে পায়—হঠাৎ নেকড়ের ক্ষুধিত চীৎকার, হরিণের ভয়ার্ত কান্না, ক্বচিৎ হাতীর শৃংগনিনাদ, খট্টাসের খট্‌খট্ হাসি। আর দেখতে পায়—অন্ধকার বনের কিনারে জোনাকির

মতন নীল-চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অজগর।

কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে কোনো জন্তুর প্রবেশ-অধিকার নেই। তারা জানে, গ্রামে একটা ভয়ংকর জিনিস আছে, আগুন। তাই তারা দূরে থেকে নিস্ফল গর্জন করে সরে যায়, আগুনের কাছে আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো মানুষ যদি রাত্রে বনের মধ্যে পদার্পণ করে—তার আর পরিত্রাণ নেই, বনের সতর্ক প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রাস করবে। এইভাবে দুই পক্ষই চিরদিন এই সীমানার মর্যাদা রক্ষা করে এসেছে।

গ্রাম আর বনের ঠিক মাঝপথে একটা প্রকাণ্ড গাছ একলা দাঁড়িয়ে আছে; যেন সে এই সীমান্তের প্রহরী। তারই ছায়ায় একদিন দুপুরে পুষি আর ভুলো বসে ছিল। পুষি আর ভুলো গ্রামেরই বাসিন্দা—পুষির গায়ের লোম সাদা, ল্যাজটি কালো; আর ভুলো আগাগোড়া সাদা। বছর দুই আগে পুষি যখন শিশু অবস্থায় এই গ্রামে আসে তখন ভুলো তার উপর ভারি বিরক্ত হয়েছিল—কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে শত্রুতার ভাব কেটে গিয়েছে। এখন দু'জনের ভারি বন্ধুত্ব।

পুষি কিছুক্ষণ করুণভাবে বনের দিকে তাকিয়ে থেকে কাৎ হয়ে শুলো, তারপর পিছনের বাঁ পা দিয়ে কান চুল্‌কোতে-চুল্‌কোতে বললে, 'গাঁয়ে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। ঘেন্না ধরে গেছে!'

ভুলো পিঠের লোমের মধ্যে একটা কুকুরে-মাছির অনুসন্ধান করছিল, বললে, 'আবার কী হল?'

পুষি কান চুল্‌কোনো শেষ করে একটু গম্ভীর হয়ে বসে বললে, 'হবে আবার কি, এমনি বলছি। আমরা বনের প্রাণী—বনই আমাদের ঘরবাড়ি, গাঁয়ে থাকা আমাদের পক্ষে বনবাস।'

ভুলো কুকুরে-মাছিটাকে ধরতে পারলে না, পুষির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ আবার মার খেয়েছিস—না? খুলেই বল না বাপু, অত লজ্জা কিসের?'

পুষি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'দ্যাখ ভুলো, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। ওদের মতন নেমকহারাম জাত আর পৃথিবীতে নেই? নইলে ওদের জন্যে আমি কী না করেছি? একবার ভেবে দ্যাখ দেখি।'

ভুলো আকাশের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ ভাবলে, কিন্তু পুষি মানুষ জাতির কী মহৎ উপকার করেছে তা ভেবে পেলে না। শেষে বললে, 'আজ কী হয়েছিল, শুনি?'

পুষি শিরদাঁড়ার উপর একটা জায়গা সাবধানে চাট্‌তে চাট্‌তে বললে, 'অন্যমনস্কভাবে দুধের কড়ায় মুখ দিয়ে ফেলেছিলুম, এই অপরাধ! অমনি বাড়ির বৌটা ছুটে এসে পিঠে এক ঘা চেলা-কাঠ

বসিয়ে দিলে। আর. যেসব গালমন্দ দিলে সে আর তোর শুনে কাজ নেই।'

ভুলো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে. 'তোর ঐ দোষ কিছুতেই গেল না পুষি। কত বোঝালুম. কিছুতেই বুঝলি না। আচ্ছা. রান্নাঘরে ঢুকতে যাস কেন? আমার মতন ভদ্রভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস না?'

পুষি একটু গরম হয়ে বললে. 'আমি কি তোর মতন ছোটলোক যে. বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব? আমার সর্বত্র গতি। জানিস. আমি কত বড়-বংশের মেয়ে!'

ভুলো চাপা বিদ্রুপের সুরে বললে. 'না। তুই বল না. শুনি।'

পুষি বনের পানে একবার তাকিয়ে খুব আমীরী চালে বললে. 'ঐ বনের রাজা কে—জানিস?'

ভুলো মিটি-মিটি তাকিয়ে বললে, 'জানি -হাতী।'

পুষি বললে. 'ছাই জানিস. তুই একটা গাধা।'

'তবে কে—ভল্লুক?'

'ভল্লুক!' পুষি নাক সিঁটকে বললে 'ভল্লুক তো তার গোমস্তা। বাঘ! বাঘ! নাম শুনেছিস কখনো?'

'শুনেছি। তা. বাঘের সঙ্গে তোর কী সম্বন্ধ?'

পুষি ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে বললে. 'আমি আর বাঘ একই বংশের। আমরা সবাই দীর্ঘ দন্ত ঠাকরের সন্তান—বুঝলি? বাঘ সম্পর্কে আমার বোনপো হয়—চেহারাব আদল দেখিসনি?'

ভুলো হ্যা হ্যা করে হেসে বললে. 'পুষি. তুই থাম্—আর জ্বালাসনি। দীর্ঘ-দন্ত ঠাকরের সন্তান! তোর বোনপো যদি তোকে একবার পায় তাহলে এমনি করে মাথায় একটি থাবা মেরে তোর দফা নিকেশ করে দেবে।' বলে ঠাট্টাচ্ছলে পুষির মাথার উপর নিজের ডান পায়ের থাবাটা রাখলে।

পুষি অমনি ফ্যাঁস করে উঠে বললে. 'খবরদার ভুলো! মাথায় পা দিয়েছিস কি আঁচড়ে নাক ছিঁড়ে দেব।'

ভুলো তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'আর বড়াই করিসনি! একবার যদি টুঁটি ধরে নাড়া দিই তাহলে আর উঠে দুধের পথ্যি করতে হবে না।'

দু'জনে কিছুক্ষণ দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। ভুলো সামনের পায়ের উপর মাথা রেখে মিটিমিটি চাইতে চাইতে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল. এমন সময় দূর থেকে 'ভুলো' 'ভুলো' ডাক শুনে চমকে উঠল। এ তার মনিবের ডাক। ভুলো ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ভুলোর দেখা নেই। পুষি একলা বসে-বসে মানুষের

হৃদয়হীনতার কথা ভাবতে লাগল। একটু কৃতজ্ঞতা কি তাদের নেই? কত ইঁদুর সে ধরেছে তা কি তারা জানে না? গোলা একেবারে নি-ইঁদুর করে দিয়েছে। সেজন্য ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, একটু ভাল ব্যবহারও কি করতে নেই! একটু দুধে মুখ দিয়ে ফেলেছিল বলে একেবারে চেলা-কাঠের বাড়ি মারা! পিঠটা ফুলে উঠেছে। দুত্তোর, মানুষ জাতটাই পাজি! ওদের সংসর্গে থাকতে নেই, তারচেয়ে বনবাস ঢের ভাল।

আর, বনবাসই বা কেন, বনই তার ঘর। সেখানেই তো তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে। গাঁয়েই বরং সব পর।

এই সময় মুখখানি ভারি বিমর্ষ করে ভুলো তার পাশে এসে বসল। পুষি দেখলে, ভুলোর গলায় ছেঁড়া দড়ির ফাঁস তখনো ঝুলছে। সে একটু মুচকি হেসে বললে, 'কি ভুলো, বোষ্টম হলি নাকি? গলায় কণ্ঠি পরেছিস যে?'

ভুলো উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে রইল। পুষি জিজ্ঞাসা করলে, 'বেঁধে রেখেছিল বুঝি?'

ভুলো সংক্ষেপে বললে, 'হুঁ।'

'কেন? কী করেছিলি?'

ভুলো বিরক্ত হয়ে বললে, 'করব আর কি—কিছু করিনি!—আচ্ছা, তুই-ই বল দেখি, তোর তো দু'বছর বয়েস হয়েছে, নেহাত বোকাও নস্,—বেঁধে রাখলে কেউ কখনো তেজী হয়?'

'দূর! তা কখনো হয়?'

'তবে? আমার মনিবের মাথায় ঢুকেছে যে, বেঁধে রাখা হয়নি বলে আমার তেজ কমে যাচ্ছে। কখনো শুনেছিস এমন কথা? বেঁধে রাখলে যদি তেজ বাড়ত তাহলে নিজেরা গলায় দড়ি বেঁধে ঘরে বন্ধ থাকে না কেন? মানুষগুলো সত্যি আহাম্মক। আমার মনিব কী ঠিক করেছে জানিস? আজ থেকে রোজ দিনের বেলায় আমাকে বেঁধে রাখবে আর রাত্তিরে ছেড়ে দেবে। তাহলেই আমি ভয়ংকর তেজী হয়ে উঠবো।'

পুষি মনে-মনে হেসে বললে, 'তাই বুঝি আজ তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল?'

ভুলো মুখ গোমড়া করে বললে, 'হুঁ। আমিও তেমনি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুই ঠিক বলেছিস পুষি, মানুষগুলোর শরীরে এতটুকু মায়া-দয়া নেই। যতই ওদের দেখছি ততই আমার পিত্তি চটে যাচ্ছে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দিয়ে ওরা ভাবে যেন আমাদের কিনে নিয়েছে। একটু দরদ

 নেই, ভালবাসা নেই—আমরাই কেবল মালিকের জন্যে প্রাণ দিতে

ছুটি।' এই সময়ে একটা কুকুরে মাছি ভুলোর ঘাড়ের কাছে কটাস্ করে কামড়ে দিতেই ভুলো খিঁচিয়ে উঠল, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়া!' বলে সামনের দু'পা দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে তাকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুষি ভুলোর গা ঘেঁষে এসে গলা খাটো করে বললে, 'ভুলু, চল আমরা জঙ্গলে পালাই।'

হঠাৎ মাছি ধরায় ক্ষান্ত দিয়ে ভুলো বললে, 'আঁ—?

পুষি ভুলোর গলার দাঁড় খুলে দিয়ে চুপি চুপি বলতে লাগল, 'আমরা তো বনের প্রাণী, বনই আমাদের ঘর। চল, আমরা এই শয়তান মানুষগুলোকে ফেলে নিজেদের দেশে চলে যাই। ওরা জব্দ হোক।'

ভুলো বললে, 'কিন্তু—'

পুষি বলতে লাগল, 'এখানে থাকলে তোর মালিক এসে আবার তোকে ধরে নিয়ে যাবে, দাঁড় ছিঁড়েছিস বলে মারবে, তারপর আবার বেঁধে রাখবে। বুঝেছিস? দরকার কি তোর এত অপমান সহ্য করবার? তারচেয়ে চল দু'জনে বনের মধ্যে থাকব, মনের আনন্দে জীব-জন্তু ধরে ধরে খাব -কারুর তোয়াক্কা রাখব না। সেখানে তো কেউ আমাদের চেলা-কাঠ দিয়ে মারতেও আসবে না আর দাঁড় দিয়ে বাঁধবেও না। কী বলিস?'

পুষির কথায় ভুলোর মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল, তবু সে ইতস্ততঃ করে বললে, 'কিন্তু ভাই, মনিবকে না বলে ছেড়ে যাওয়া, সে যে নেহাত—'

পুষি বাধা দিয়ে বললে, 'কিসের মনিব? যে দাঁড় দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়, তার জন্যে আবার দরদ কিসের? এত লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়েও তোর মনিবের ওপর ছেন্দা হয়? আমি হলে অমন মনিবের মুখে—'

'চুপ কর, ওকথা বলতে নেই, হাজার হোক মনিব। কিন্তু তবু তোর কথাটাও নেহাত মন্দ নয়—' বলে ভুলো ভাবতে লাগল।

পুষি বললে, 'বেশী ভাবিসনি ভুলু—চল এইবেলা বেরিয়ে পড়ি। শাস্ত্রে কী বলেছে জানিস তো—শুভস্য শীঘ্রং। এখনো অনেকক্ষণ বেলা আছে, এইবেলা গিয়ে জঙ্গলের ভেতরটা ভাল করে দেখে-শুনে নিতে হবে।—চল—ওঠ।' এই বলে পুষি বনের পানে পা বাড়াল।

'চল তবে' বলে ভুলোও উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় গাছের উপর থেকে ভারি গলায় কে বললে, 'ওদিকে যেও না যাদু, হুতুম-থুমোর ভয়।'

পুষি চমকে গাছের দিকে চেয়ে দেখলে, একটা টিয়া পাখি বসে আছে। টিয়াটার পায়ে লোহার আংটি, বোধহয় কারুর শিক্‌লি ছিঁড়ে

পালিয়েছে। পুষি রেগে উঠে বললে, 'আ মলো! শুভ কাজে বেরুচ্ছি অমনি পেছু ডাকলি? অযাত্রা কোথাকার! দুর্গা! দুর্গা! আয় ভুলো।'

পাখিটা কেবল টর্‌র্‌ করে হাসলে।

দু'জনে তখন বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। মানুষের মায়া কাটিয়ে যেতে ভুলোর মনটা একটু বিষণ্ণ হল বটে, কিন্তু আজ সে মালিকের ব্যবহারে প্রাণে বড়ই আঘাত পেয়েছিল, তাই আর গাঁয়ের দিকে ফিরে তাকাল না।

নিবিড় আবছায়া বনের ভিতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পুষি আর ভুলো শেষে একটা ফাঁকা জায়গায় পোঁছল। একটি ছোট নদী লতাপাতা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে—কিনারার গাছ তার জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এখানে গাছের ভিড় কম বলে বিকেলের আলোও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দু'জনে খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলে; অনেকদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে তাদের পিপাসা পেয়েছিল, জলের ধারে গিয়ে চক্‌-চক্‌ করে জল খেলে, তারপর একটা গাছের তলায় এসে বসল।

পুষি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'ভুলো, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে —না রে? এই সময় একটু দুধ পাওয়া যেত!'

ভুলোরও ক্ষিদে পেয়েছিল কিন্তু সে তা বললে না, কেবল একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল। পুষি বললে, 'কিন্তু কী আশ্চর্য দেখেছিস? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতদূর এলুম, জনপ্রাণীরও দেখা পেলুম না। জঙ্গলে কি কেউ থাকে না নাকি?'

এই সময় গাছের উপর থেকে শব্দ হল, 'হুঁশিয়ার! পেছনে তাকাও।'

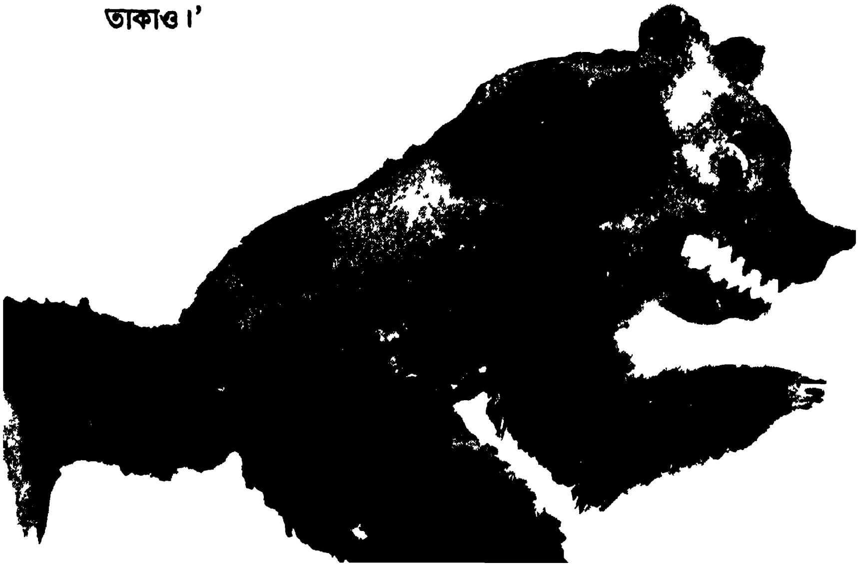

দু'জনে একসঙ্গে পিছু ফিরে দেখলে একটা প্রকাণ্ড কালো ভল্লুক পা টিপে-টিপে প্রায় তাদের ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে! পুষি তো এক চীৎকার ছেড়ে তড়াক করে গাছে উঠে পড়ল; কিন্তু ভুলো কী করে? সে গাছে উঠতে জানে না—প্রাণের দায়ে পোঁ পোঁ করে দৌড়তে আরম্ভ করল। ভল্লুকটাও দুলতে দুলতে আর গোঁ গোঁ করতে করতে তার পিছনে পিছনে ছুটল।

পুষি গাছে উঠেই দেখলে, সেই টিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। পুষি তার কাছাকাছি যেতেই সে দূরের একটা ডালে উড়ে গিয়ে বসল, বললে, 'বনে জনপ্রাণী নেই, কেমন? তোমরা দু'জনে এখানে এসে রাজত্ব করবে ভেবেছিলে—না?'

পুষি নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা! খুব বেঁচে গেছি! ভাগ্যিস গাছে উঠতে জানি, নইলে আমারও ভুলোর দশা হত।'

টিয়া চোখের উপর পাতলা পর্দা টেনে দিয়ে বললে, 'ভল্লুকও গাছে চড়তে জানে—তুমি একলা নয়!'

পুষি ভয় পেয়ে বললে, 'অ্যাঁ! তবে কী হবে! যদি ভল্লুক ফিরে আসে!'

টিয়া গলার মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ টর্‌র্‌ শব্দ করে বললে, 'এই বুদ্ধি নিয়ে জঙ্গলে বাস করতে এসেছ? তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। ভল্লুক যদি গাছে ওঠে, পাতলা ডালে গিয়ে বসবে—বুঝলে? ভল্লুক সেখানে যাবার চেষ্টা করলেই ডাল ভেঙে পড়ে যাবে।'

পুষি আর দেরি না করে একটি খুব সরু ডালে গিয়ে বসল। কি জানি, বলা তো যায় না। সাবধানের মার নেই।

ওদিকে ভুলো চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে; কিন্তু ভল্লুক তাকে ধরলে বলে, আর দেরি নেই। ভল্লুককে দেখলে মনে হয় না যে, সে দৌড়তে পারে, কিন্তু তার ঐ ঝাঁকড়া কালো শরীরটা দরকার হলে হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ভুলোর আর প্রাণের আশা নেই: সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, ভল্লুক ঠিক তার দু'হাত পিছনে এসে পড়েছে, হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে!

কিন্তু ঠিক সেই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার হল। ভল্লুকটা হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থপ্‌ করে বসে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়ে ভুলো ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলে, পিছনে ভল্লুক নেই। সে আরো খানিক দূর গিয়ে থামল। ফিরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে দেখলে, ভল্লুকটা মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, আর ভিতর থেকে একটা শব্দ বেরুচ্ছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

ভুলো কিছু বুঝতে পারলে না; সে ভারি আশ্চর্য হয়ে অনেকখানি ঘুরে আবার সেই গাছের নীচে গিয়ে হাজির হল। গাছের দিকে

তাকিয়ে দেখলে, পুষি সরু ডালের উপর চুপটি করে বসে আছে।

ভল্লুকের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ভুলোর বেশ ফুর্তি হয়েছিল, একটু অহঙ্কারও হয়েছিল। সে বললে, 'কী পুষি, গাছের ঢঙে উঠে বসে আছিস কেন? নেমে আয়। তোর মতন ভীতু দুনিয়ায় নেই।'

ভুলো যে বেঁচে ফিরে আসবে সে আশা পুষির ছিল না, সে চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞাসা কবলে, 'আরে ভল্লুক?'

ভুলো বললে, 'হুঁ—ভল্লুক! সে কি আর আছে? তার দফা রফা করে দিয়েছি।'

'সে কি? মরে গেছে? কী হয়েছিল?'

ভুলোর একটা দোষ, সে নিজের বীরত্বের বড়াই করতে ভালবাসে। বললে, 'মরেনি এখনো—তবে আব দেরি নেই। এমন এক লেঙ্গি মেরেছি তাকে যে আর ওঠবার ক্ষমতা নেই—মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ করছে।'

টিয়া বললে, 'জ্বর এসেছে। লেঙ্গি নয় রে, ভল্লুক জ্বরে ধুঁক্‌ছে। ভুলো, তুই বড় মিথ্যেবাদী—কুকুর জাতটাই মিথ্যেবাদী।'

ভুলোর একটু লজ্জা হল, টিয়ার উপব একটু রাগও হল কিন্তু সে-ভাব চেপে গিয়ে বললে, 'পুষি, আয়, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। শিকার ধরে খাই।'

পুষির পেট জ্বলছিল। সে সাবধানে নেমে এসে বললে, 'কী শিকার করবি? কোথাও কিছু নেই।'

ভুলো বললে, 'ওইদিক দিয়ে আসবার সময় দেখলুম কতগুলো খরগোস দূরে খেলা করছে—চল, দু'জনে মিলে ধরিগে।'

টিয়া টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল, 'হো হো হো! খরগোস ধরবে? আস্পর্ধা দেখে আর বাঁচি না! খ্যাঁকশেয়ালী যার সঙ্গে দৌড়ে পারে না, নেকড়ের নাকের তলা দিয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে তোমরা ধরবে? হো হো হো! তারচেয়ে টিক্‌টিকি ধরে খাওগে যাও।'

টিয়ার উপর মনে মনে চটলেও পুষি আর ভুলো মুখে কিছু বললে না, কারণ টিয়ার কাছ থেকে অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে। এইমাত্র ভল্লুকের হাত থেকে সে-ই প্রাণ বাঁচিয়েছে; তাই কোনো কথা না বলে তারা খরগোস-শিকারে চলল।

একটা উঁচু ঢিবির পাশে সারি সারি গর্ত, আর তারই সামনে ফাঁকা জায়গায় তিনটে খরগোস খেলা করছে। ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনো বা এ-ওর পিঠে চড়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছে।

উঁচু ঘাসের আড়াল থেকে তাদের দেখে ভুলো আর পুষির জিভে জল এল। পুষি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে ওদের আক্রমণ করি আয়, তাহলে আর পালাতে পারবে না।'

দু'জনে গুঁড়ি মেরে দু'দিকে চলে গেল। তারপর একসময় তাক্ বুঝে একসঙ্গে দু'দিক থেকে তীরের মতন আক্রমণ করলে। খরগোস তিনটে তাদের আসতে দেখে একটুও ভয় পেল না; একটা খরগোস তার গন্নাকাটা ঠোঁট নেড়ে বললে, 'দ্যাখ তো, এরা আবার কারা?'

দ্বিতীয় খরগোসটা ভুলোকে দেখে বললে, 'এটা বোধহয় কচ্ছপের ভায়রাভাই, নইলে এত আস্তে চলে কেন?'

তৃতীয় খরগোস পুষিকে দেখে বললে, 'এটা নিশ্চয় কুমীরের ডিম্ন ফোটা বাচ্ছা, এখনো চলতে শেখেনি।'

এতক্ষণে পুষি ভুলো একেবারে তাদের কাছে এসে পড়েছিল— ধরে আর কি! কিন্তু এই সময় তিনটে খরগোসই হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে প্রায় চার-পাঁচ হাত শূন্যে উঠে গেল—ভুলো আর পুষি তাদের ধরতে পারলে না, তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দৌড় থামিয়ে তারা যখন ফিরে এল তখন খরগোসেরা ধীরে-সুস্থে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর মিহি সুরে গান ধরেছে—

'আমায় ধরতে পারলি না—ধিন্‌তা ধিনা—'

গর্তের মুখের কাছে বসে ভুলো জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল, পুষি রাগের চোটে দাঁত কড়মড় করে বললে, 'আবার গান হচ্ছে! দাঁড়াও, গর্তে ঢুকে টুঁটি ধরে বার করে নিয়ে আসছি!' গর্তগুলো সরু হলেও পুষি কোনমতে তাতে ঢুকতে পারে।

টিয়া এতক্ষণ তাদের মাথার উপর উড়ে-উড়ে মজা দেখছিল, পুষি গর্তে ঢুকতে যায় দেখে বললে, 'অমন কাজটি করো না, গোলক-ধাঁধায় ঢুকলে আর বেরুতে পারবে না। অনেক মিঞাকেই ওর মধ্যে ঢুকতে দেখলুম, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি।'

গায়ের ঝাল গায়ে মেরে রাগে গরগর করতে করতে পুষি আর ভুলো ফিরে এল। ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছিল। নদীর ধারে দু'জনে পেট ভরে জল খেলে। কিন্তু জল খেলে কি ক্ষিদে যায়? পুষি বললে, 'ভুলো, কি খাব? পেট যে জ্বলে যাচ্ছে!'

ভুলো জবাব দিতে পারে না; টিয়া উপর থেকে বললে, 'টিক্‌টিকি খা—টিক্‌টিকি খা, তোদের কপালে আর কিছু জুটবে না।'

কোথায় খরগোস আর কোথায় টিক্‌টিকি! তবু পুষি মুখ তুলে বললে, 'টিক্‌টিকিই বা পাব কোথায় যে খাব?'

টিয়া বললে, 'কানা কোথাকার, দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ দ্যাখ—' বলে চোখের ইশারা করে দেখিয়ে দিলে।

একটা কাঁটা-গাছের ডালে ডালে টিক্‌টিক বসে ছিল, যেন ঝিঙের ঝাড়ে শুক্‌নো ঝিঙে ঝুলে আছে। তাই দেখে দু'জনে লাফিয়ে গিয়ে তাদের উপর পড়ল। পুষি থাবার এক ঝাপটায় একটা টিক্‌টিকি

মাটিতে ফেলে কচ্‌মচ করে তার মাথা চিবুতে লাগল। ভুলোও অতিকষ্টে একটা রোগা টিকটিকি ধরলে, কিন্তু খেতে গিয়ে তার গা বমি-বমি করতে লাগল; তবু পেটের জ্বালায় খেয়ে ফেললে। অন্য টিকটিকিগুলো সর-সর করে নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর গাছের কোটরের ভিতর থেকে তাদের টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শোনা গেল—সাবধান! হুঁশিয়ার! টরে-টক্কা টরে! একরকম অদ্ভুত জানোয়ার এসেছে; তারা আমাদের ধরে-ধরে খাচ্ছে। সাপ নয়—চারপেয়ে জন্তু! হুঁশিয়ার! কেউ গাছ থেকে নেবো না—টরে টরে টক্কা টক্কা—

দেখতে দেখতে টিকটিকি-মহলে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; বনের অধিবাসীরা ক্রমে জেগে উঠছে, তার শব্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল। পুষি টিকটিকি-ভোজন শেষ করে ঠোঁট চাট্‌তে চাট্‌তে বললে, 'পেট ভরল না। আর গোটাদশেক হলে হত।'

ভুলো কিছু বললে না, কেবল করুণভাবে টিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল—যদি সে কোনো নতুন খাবারের সন্ধান দিতে পারে।

টিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে বললে, 'সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবার আমি চললুম; রাত হলে আবার প্যাঁচার ভয়!'

টিয়া চলে যায় দেখে পুষি বললে, 'টিয়া, কোথায় খাবার পাওয়া যায় বল না ভাই! তোদের দেশে নতুন এসেছি, তোরা যদি না সাহায্য করিস তাহলে বাঁচি কী করে?'

পুষি নরম হয়েছে দেখে টিয়া বললে, 'আজ আর হবে না, কাল সকাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকিস তাহলে ভাল খাবারের সন্ধান দেব। এখন যা, কোনো গর্ত-টর্ত দেখে লুকিয়ে থাকগে যা।'

পুষি মিনতি করে বললে, 'লক্ষ্মী ভাই, আজ যদি কিছু খেতে না পাই তাহলে শুকিয়ে মরে থাকব। জানিস তো, আমার দু'বেলা আধ-সের করে দুধ খাওয়া অভ্যেস। তার ওপর ভাত, মাছ, ইঁদুর আরও কত কী আছে।'

ভুলো কেবল লালায়িত জিভ বার করে টিয়ার পানে চেয়ে রইল।

তাদের অবস্থা দেখে টিয়ার মনে দয়া হল, সে একটু ভেবে বললে, 'ভাল খাবারের সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু তোরা সেখানে যেতে পারবি? ভয়েই মরে যাবি!'

ভুলো তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে বললে, 'মরব না। বল না কোথায়?'

টিয়া বললে, 'ঐ পশ্চিম দিকের শালবনের মধ্যে। বাঘ একটা হরিণ মেরে রেখে গেছে, আজ এসে খাবে। পারবি সেখানে যেতে? এ বনের কোনো জন্তু কিন্তু বাঘের খাবারে মুখ দিতে সাহস করে না।'

পুষি ল্যাজ ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুই বোধহয় জানিস না, আমি সম্পর্কে বাঘের মাসি হই। ও হরিণ আমার জন্যেই আমার বোনপো মেরে রেখে গেছে। এতক্ষণ বলিসনি কেন? চল্ চল্, শীগ্গির আমাকে সেখানে নিয়ে চল্, আর দেরি করিসনি।'

টিয়া তখন টি-টি করে হাসতে হাসতে উড়ে চলল, ভুলো আর পুষি তার পিছনে পিছনে গেল। শালবনের কাছে গিয়ে টিয়া বললে, 'এবার তোরা যা, আমি বাসায় চললুম। কাল যদি বেঁচে থাকিস তো দেখা হবে।' এই বলে সোজা নদী পার হয়ে উড়ে চলে গেল।

শালবনের মধ্যে ঢুকেই পুষি আর ভুলো মরা হরিণের গন্ধ পেল। পুষি বললে, 'দেখছিস, আমার বোনপো আমায় কত ভালবাসে? আগে থাকতে উয্যুগ-আয়োজন করে রেখেছে।'

ভুলোর তখন পুষির কথায় মন ছিল না, এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলে, আধ-খাওয়া হরিণটা পড়ে রয়েছে। সে উচ্চবাচ্য না করে খেতে আরম্ভ করে দিলে। পুষি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে-ফিরে হরিণটার কোথায় নরম মাংস তাই খুঁজতে লাগল আর বলতে লাগল, 'উঃ, বোনপো আমাকে কী ভালই বাসে! হাজার হোক, দীর্ঘ-দন্ত ঠাকুরের সন্তান তো—উঁচু মেজাজ! খেয়ে নে ভুলো, পেট ভরে, আমার পয়েই আজ খেতে পেলি।'

ভুলো কোঁৎ-কোঁৎ করে খেতে খেতে বললে, 'খা খা, বেশী বাজে বকিসনি। বাজে কথা বলা তোর একটা অভ্যেস।'

পুষি জিভ দিয়ে রক্ত চেটে বললে, 'খাচ্ছি। তোর মতন অমন হাঁউ হাঁউ করে খেতে আমার সুখ হয় না।—কী সুন্দর হরিণের মাংস—যেন তুলতুল্ করছে!' বলে পুষি মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, শালবনের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ভুলোর পেট যখন বেশ ভরে এসেছে--তখনো পুষি ভাল করে আরম্ভ করেনি—এমন সময় 'গাঁক্' করে একটা বিরাট শব্দ হল। সংগে সংগে মড়মড় শব্দ—যেন ঝোপঝাড় ভেঙে কে ছুটে আসছে! দু'জনে ফিরে দেখলে, আগুনের ভাঁটার মতন দুটো চোখ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে!

তারপরেই গর্জন শুনলে—কে রে! কে রে! আমার খাবারে মুখ দিয়েছে কোন্ হতভাগা! আজ তার বুক চিরে মেটুলি বার করব! তারপর আবার 'গাঁক্ গাঁক্' শব্দ!

শুনেই পুষির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, সে ল্যাজ উঁচু করে পোঁ পোঁ করে দৌড় দিলে। ভুলোও দৌড়ে কম নয়—দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মরি-কি-বাঁচি করে পালাতে লাগল।

রাত্রে বেড়াল কুকুর দেখতে পায় বটে, কিন্তু বনের রাস্তা-ঘাট তাদের পরিচিত ছিল না, তার উপর বাঘ পিছনে তাড়া করে আসছে। তাই দু'জনে যে কোথায় যাচ্ছে তার ঠিকানা ছিল না। প্রাণের দায়ে খালি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল।

পালাতে পালাতে হঠাৎ তারা ঝুপ্ করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। পুষি হাবুডুবু খেতে খেতে বললে, 'গেলুম রে, বাবা রে, ও ভুলো, এ কোথায় পড়লুম? কুয়ো নয় তো?' পুষি আগে একবার কুয়োয় পড়েছিল, সেই থেকে তার কুয়োয় বড় ভয়।

ভুলো চার-পায়ে সাঁতার দিতে দিতে বললে, 'কুয়ো নয়—নদী। সাঁতার কাট্—সাঁতার কাট্!'

জলে হাবুডুবু খেয়ে নদীর কিনারা কোন্‌দিকে তা তারা দেখতে পেলে না, তবু সাঁতার কেটে চলল। ক্রমে নদীর স্রোত তাদের টেনে নিয়ে চলল। খানিক পরে তারা শুনতে পেলে বাঘ তীরে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বলছে—খুব বেঁচে গেলি, যা!

এতক্ষণে ভুলো আর পুষি বেশ দেখতে পাচ্ছিল, তারা আর তীরের দিকে গেল না; তীর থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে স্রোতের মাঝখান দিয়ে ভেসে চলল। ক্রমে নদীর ঠিক মাঝামাঝি একটা উঁচু পাথর জেগে আছে দেখতে পেল। ভুলো বললে, 'ঠিক হয়েছে, আজ এখানেই রাত কাটাব। বেশ হবে, আর কেউ কাছে আসতে পারবে না।' এই বলে ছোট্ট দ্বীপের মতন সেই পাথরটার দিকে সাঁতরে চলল।

দু'জনে সেখানে গিয়ে উঠতেই এক কুড়ি ব্যাং কট্-কট্ করে আপত্তি জানিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

পুষি বেচারি ভিজে একেবারে আধখানা হয়েছিল, সে একটা উঁচু শুক্‌নো জায়গায় উঠে বসে হি-হি করে কাঁপতে লাগল। ভুলোও ভাল করে গা-ঝাড়া দিয়ে তার পাশে এসে বসল, বললে, 'কী পুষি, দীর্ঘ-দন্ত ঠাকুরের সন্তানকে দেখে অমন ল্যাজ তুলে পালিয়ে এলি কেন? তোর বোনপো হয়, তোকে দেখলে গড় হয়ে পেন্নাম করে পায়ের ধুলো নিত, তা দিলি না কেন? তোর জন্যে কত উয্যুগ করে রেখেছিল—একটু মুখেও দিলি না?'

পুষি চুপ—মুখে কথাটি নেই। ভুলোর পেট ভরা ছিল, সে একটা ঢেঁকুর তুলে বললে, 'আহা, তোর বোনপো তোকে সত্যিই ভালবাসে; নদীর ধার পর্যন্ত ডাকতে এসেছিল! গেলি নে কেন রে?

পুষি ফ্যাঁচ করে হাঁচলে, জলে ভিজে তার ঠান্ডা লেগে গেছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল উনুনের ধারের সেই গরম জায়গাটির কথা, যেখানে সে রোজ সন্ধ্যাবেলা বসে ঘুমুত। নিজের দুর্বুদ্ধির

দোষে খাবার পেয়েও আজ খেতে পারেনি—ভুলোটা পেট পুরে খেয়ে নিয়েছে—তাতেই তার আরো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ভুলো এমন ঠাট্টা শুরু করে দিয়েছে যে, সহ্য করা দায়। পুষি বুকের মধ্যে ঘাড় গুঁজে চুপটি করে বসে রইল।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল; ভুলো লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোবার আয়োজন করলে। কিন্তু নতুন জায়গায় ঘুম সহজে আসে না, এলেও ভেঙে যায়। নদীর দুই কিনারায় নানারকম জন্তু জল খেতে আসছে, তাদের ডাকাডাকিতে তন্দ্রা চটে যেতে লাগল। একবার একটা পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় দিয়ে চোঁ-চোঁ করে জল টেনে নিয়ে নিজের গলায় ঢেলে দিলে, তারপর ভেঁপু-ভেঁপু করে ডাক দিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল। তারপরে হরিণ এল, শুয়োর এল, ভল্লুক এল—সবাই জল খেয়ে গেল। শেয়াল জল খেতে এসে বললে, 'কে রে তোরা, নদীর টিলাতে ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছিস?'

এরা জবাব দিলে না, শেয়াল তখন ভালভাবে লক্ষ্য করে বললে, 'আরে, এ যে পুষি আর ভুলো! আ মলো! তোরা মরতে বনে এসেছিস কেন?'

ভুলো পুষি কথা কইলে না, শেয়াল তখন খ্যাক্‌-খ্যাক্‌ করে হেসে বললে, 'কি রে ভুলো, একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে! আর, আমি গাঁয়ের সীমানায় পা দিতে-না-দিতে যে ঘেউ ঘেউ করে গাঁ মাথায় করিস! এখন?' এই বলে নদীর ধারে উপু হয়ে বসে শেয়াল

উঁচু করে গান ধরলে। ইতিমধ্যে আরো অনেক শেয়াল এসে জুটেছিল, তারা দোয়ারকি শুরু করলে—

'গাঁয়ের ভুলো ছিল গাঁয়ের গো-ভাগাড়ে,
ঘরের পুষি ছিল ঘরে—
হঠাৎ একি হল! নদীর মাঝখানে
বসেছে টিলাটির 'পরে!
গাঁয়ের পোষা প্রাণী—খাস তো দুদু-ভাতু,
কেন রে এসেছিস বনে?
এখানে থাকি মোরা স্বাধীন জাতি সব
বাঘা ও ভালুকের সনে।
গাঁয়েতে আছে শুধু মানুষ, গরু-ভেড়া,
আগুন, ঘুঁটে আর ধুঁয়া;—
আমরা বনে থাকি স্বাধীন বেপরোয়া
—হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া!

সমস্ত রাত্রি তারা এই গান গাইলে। গান শুনে পুষি আর ভুলোর ভারি লজ্জা হল। মনে মনে ভাবলে, প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আর গাঁয়ে ফিরে যাব না।

ক্রমে অন্ধকার রাত্রি কেটে গেল, পূব দিকে উষার রাঙা শাড়ী গাছপালার মাথার উপর দুলতে লাগল। দু-একটা পাখি বাসা থেকে উড়ে এসে গান গেয়ে উঠল। সকাল হয়ে আসছে দেখে শেয়ালেরা গান বন্ধ করে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেশ পরিষ্কার হতেই টিয়া উড়তে উড়তে এসে হাজির হল, বললে, 'আরে, তোরা এখানে! এখনো বেঁচে আছিস? বেশ বেশ, তোদের ভাগ্যি ভাল!—তা, এখন কিনারায় চল, সকাল হয়েছে, এখন আর তত ভয় নেই।'

দু'জনে তখন সাঁতরে কিনারায় উঠল। পুষি চিঁ চিঁ করে বলল, 'টিয়া ভাই, কাল থেকে কিছু খাইনি, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।'

টিয়া বললে, 'কেন, কাল হরিণের মাংস খাসনি?'

পুষি লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললে, 'সবেমাত্র খেতে বসেছি, এমন সময়—'

ভুলো গম্ভীর মুখ করে বললে, 'এমন সময় বোনপো এসে পড়ল, তাই পুষি জিভ কেটে উঠে পড়ল। ছেলেপুলের খাওয়া না হলে মা-মাসির খেতে নেই জানিস তো?' বলে ভুলো টিয়ার দিকে চোখ টিপলে।

টিয়া হেসে বললে, 'আহা, কাল তাহলে পুষির নিরম্বু একাদশী গেছে! আহা, আয় পুষি, আজ তোকে দ্বাদশীর পারণ করাবো।'

তখন সূর্য উঠেছে। টিয়ার পিছনে পিছনে দু'জন গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পেঁছিল। চারিদিকে বড় বড় গাছ—থামের মতন তাদের গুঁড়ি উপরে উঠে গেছে, তার উপর ডালপালা আর পাতার ঘন ছাউনি, এত ঘন যে আকাশ দেখা যায় না। টিয়া একটা গাছের ডালে বসে বললে, 'পুষি, এই গাছে ওঠ।'

পুষি অবাক হয়ে বললে, 'কেন, গাছে উঠে কী হবে?'

টিয়া বলল, 'এই গাছের মগডালে বাজপাখির বাসা আছে, তাতে ছানা আছে। তুই উঠে আয়, এখন তারা শিকারে বেরিয়েছে, এইবেলা তাদের ছানা খেয়ে তাদের বংশ নির্বংশ করে দে। ওরা আমাদের শত্রু—জ্ঞাতি-শত্রু—ওদের ডিম ছানা খেয়ে শেষ করে দে। এ বনে যত বাজপাখি আছে, সক্কলের বাসায় আজ তোকে নিয়ে যাব।'

পুষি আর দ্বিরুক্তি না করে গাছে উঠতে উঠতে বললে, 'টিয়া, তুই ভাবিসনি, তোর সব শত্রু আমি নিপাত করব। সত্যি কথা বলতে কি, পাখির কচি-কচি ছানা খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।'

ভুলো নীচে থেকে বললে, 'আমিও। পুষি, তুই একাই টিয়ার সব শত্রু নিপাত করিসনি, আমাকেও দু'-একটা নিপাত করতে দিস।'

পুষি তখন অনেক উপরে উঠে গেছে, অবজ্ঞাভরে নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাত-কুড়োনো হাড়গোড় যদি কিছু থাকে, ফেলে দেবঅখন।'

তারপর একে একে দশটা গাছে উঠে বাজপাখির বাসায় যত ডিম আর ছানা ছিল পুষি সব সাবাড় করলে। ভুলো তলা থেকে যে প্রসাদ পেলে তাইতেই তার পেট ভরে গেল। শেষে আইঢাই করতে করতে পুষি নেমে এসে মাটিতে বসল।

টিয়া শত্রুর প্রতিহিংসা সাধন করে মনের আনন্দে একটি পাকা তেলাকুচো ডানহাতে ধরে খাচ্ছিল, বললে, 'কি পুষি, পেট ভরল?'

পুষি প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে বললে, 'হ্যাঁ। এখন একটু নিরিবিলি দেখে ঘুমুতে পারলে হয়।'

টিয়া তখন আধ-খাওয়া তেলাকুচোটা ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'শোন্ পুষি, এবারে আস্তে আস্তে নিজের গাঁয়ে ফিরে যা, এ বনে আর থাকিসনি। তোদের ভালোর জন্যেই বলছি, আমি তো আর অষ্টপ্রহর তোদের সঙ্গে থাকতে পারব না! বনে যদি তোরা আর এক রাত্রি কাটাস তাহলে হুড়ার কিংবা বাঘের পেটে যাবি।'

পুষি টিয়ার কথায় কান না দিয়ে বললে, 'চল্ ভুলো, কোথাও শুয়ে একটু ঘুমুনো যাক। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।'

টিয়া আবার বললে, 'পুষি ভুলো, আমার কথা শোন্, এখনো ফিরে যা, সন্ধ্যে নাগাদ গাঁয়ে পেঁছতে পারবি। আমিও একদিন

মানুষের ঘরে ছিলুম, দাঁড়ে বসে ছোলা খেতুম। মানুষ জাতটা খামখেয়ালী বটে কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন নয়। এখানে চারিদিকে বিপদ—জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, গাছে ভল্লুক-বাঁদর। সবাই নিজের নিজের পেট ভরাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোরা বনের হালচাল জানিস না—বেঘোরে মারা যাবি।'

সকাল থেকেই ভুলোর মালিকের জন্য মন-কেমন করছিল, টিয়ার উপদেশ তার বড় ভাল লাগল। সে একটু কেসে বললে, 'পুষি, টিয়া যা বলছে তা মিথ্যে নয়; চল্, ফিরে যাই—'

পুষির পেট ভরা ছিল, ভরা-পেটে পুষি কারুর কথা শোনে না। সে বললে, 'তোর যেতে হয় যা, আমি এখন ঘুমুতে চললুম। গাঁয়ে

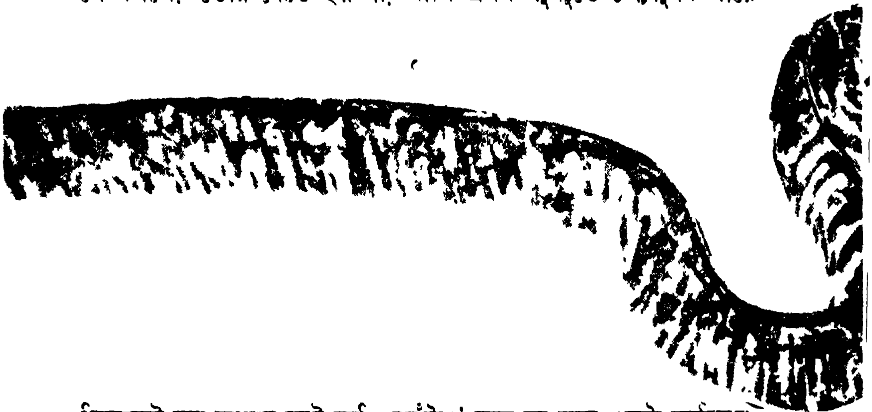

ফিরলেই তো আবার সেই লাথি ঝ্যাঁটা।' বলে সে আর-একটা আলিস্যি ভেঙে উঠে দাঁড়াল।

টিয়া উপর থেকে বললে, 'গুরুর কথা না শোনো কানে, প্রাণটি যাবে হ্যাঁচ্‌কা টানে! যা ভাল বুঝিস কর, আমি এখন চললুম, আমার ছানাদের খাওয়ানোর সময় হল।'

এই বলে টিয়া টি-টি করে ডেকে উড়ে গেল।

এতক্ষণে প্রায় দুপুর হয়েছে, সূর্যের কিরণ সরু সুতোর মতন পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। পুষি আর ভুলো ঘুমুবার জায়গা খুঁজতে খুজতে শেষে একটি গরম অথচ নিরিবিলি ঝোপের মধ্যে এসে পৌঁছল। ঝোপের মধ্যে একটা লম্বা গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল। পুষি তার সামনে খানিক দূরে একটা পরিষ্কার জায়গায় গুঁড়িসুঁড়ি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ভুলোর কিন্তু মন ছট্‌ফট্ করছিল, সে শুলো না, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। গ্রাম যে কোন্ দিকে, বনের মধ্যে এত দৌড়োদৌড়ি করবার পর তা গুলিয়ে গিয়েছিল, তাই গাছপালা শুঁকে সে দিক্-নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল।

 ওদিকে পুষির বেশ ঘুম এসে গিয়েছে, সে চোখ বুজে স্বপ্ন

দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে—এমন সময় তার মনে হল যেন আগুনের হল্কার মতন একটা নিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগল, আর সেই সঙ্গে শুনতে পেলে কে যেন তার কানে-কানে বলছে—চলে আয়—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!

পুষি ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ চেয়ে দেখলে, সেই গাছের গুঁড়িটা প্রকাণ্ড এক হাঁ করেছে, আর দুটো গোল গোল নৃশংস চোখ একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই গরম নিশ্বাস পুষির গায়ে লাগল, আবার সে শুনতে পেলে—চলে আয়—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!

পুষির মনে হল সেই নিষ্পলক নির্মম চোখ দুটো তাকে সেই

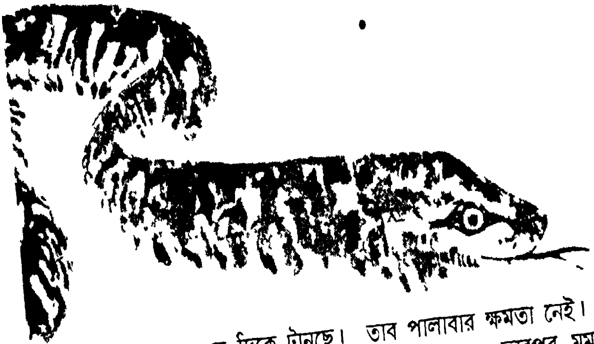

হাঁ-করা মুখের দিকে টানছে। তার পালাবার ক্ষমতা নেই। পুষি অবশভাবে এক পা সেই দিকে এগিয়ে গেল, তারপর মর্মান্তিক আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, 'ম্যাঁ—ও!'

ভুলো দূর থেকে সেই ভয়ার্ত ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে এল। তারপর পুষির সামনে প্রকাণ্ড হাঁ-করা মুখ দেখেই বুঝলে, পুষি অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির ফাঁদে পড়েছে। কাছে যেতে ভুলোর সাহস হল না। সে দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করে কয়েকবার ডাকলে—কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না, অজগরের চোখ পুষির উপর থেকে এক চুলও নড়ল না।

ভুলোর তখন মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। হাজার হলেও পুষি তার বন্ধু, যেমন করে হোক তার প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ভুলো ছুটে গেল অজগরের ল্যাজের দিকে, দেখল, ল্যাজের সরু ডগাটি কেবল লিক্-লিক্ করে নড়ছে। ভুলো প্রাণপণে ল্যাজের ডগায় মারলে এক কামড়!

ল্যাজে কামড় খেয়ে অজগরের চোখ মুহূর্তের জন্য পুষির চোখ থেকে সরে গেল। বাস্—সঙ্গে সঙ্গে পুষি একলাফে তিন হাত

পেছিয়ে গিয়ে দৌড় মারলে। পুষি পালিয়েছে দেখে ভুলোও ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে পুষির সঙ্গে দৌড়ল।

ছুট! ছুট! বন-বাদাড় পেরিয়ে, খানা-নালা ডিঙিয়ে দু'জনে ছুটল। কাঁটায় গা ছড়ে গেল, পা কেটে গেল কিন্তু সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। তাদের ভয়, সেই অজগরটা না ধরে ফেলে।

পুষি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'হে মা ষষ্ঠি, এইবারটি রক্ষে কর মা, আর কখ্খনো এ পোড়া বনের ধারে আসব না। এইবারটি উদ্ধার কর।'

কিন্তু তাদের দুর্গতির তখনো শেষ হয়নি। অন্ধের মতন দৌড়তে দৌড়তে তারা পড়ল গিয়ে একপাল বীর হনুমানের মধ্যে। হনুমানেরা একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসে মীটিং করছিল। একটা গোদা গম্ভীরভাবে লেক্চার দিচ্ছিল, এমন সময় পুষি আর ভুলো হুড়মুড় করে পড়ল গিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে। হনুমানেরা চম্কে উঠল। একটা গোদা পুষির ল্যাজ ধরে টান মেরে তাকে দূরে ফেলে দিলে, আর একটা গোদা মারলে ভুলোর গালে টেনে এক থাবড়া। ভুলোর তো মুণ্ডু ঘুরে গেল; সে গড়াতে গড়াতে উঠে আবার ছুটতে আরম্ভ করে দিলে, পুষিও 'ম্যাঁ—ও' বলে এক চীৎকার করে তার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল।

হনুমানদের মীটিংয়ে বিঘ্ন হওয়ায় তারা ভীষণ চটে গিয়েছিল, তাছাড়া কুকুর-বেড়াল তাদের চিরদিনের শত্রু। তারা হুপহাপ করে পুষি আর ভুলোকে তাড়া করলে।

দেখতে দেখতে বনের যেখানে যত হনুমান ছিল সবাই এসে পড়ল, তারাও কেউ গাছের ডালে ডালে, কেউ বা মাটি দিয়ে পুষি ভুলোর পিছনে তাড়া করলে। পুষি একবার পিছু ফিরে দেখলে, কাতারে কাতারে হনুমান দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসছে।

দৌড়তে দৌড়তে ভুলোর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, পুষির প্রাণ কণ্ঠার কাছে এসে ধুক্-ধুক্ করতে লাগল। পুষি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ভুলো, আর দৌড়তে পারছি না, এবার গেলুম!'

ভুলোরও আর পা চলছিল না, সে কথা কয়ে শক্তিক্ষয় করলে না। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে ততক্ষণ দৌড়বে এই মনে করে সে ক্লান্ত পাগুলোকে জোর করে চালাতে লাগল।

 এদিকে হনুমানগুলো ক্রমেই কাছে এসে পড়েছে—আর আশা

নেই! তাছাড়া, পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? শেষ পর্যন্ত তারা ধরে ফেলবেই। তবে আর কেন মিছিমিছি পালাবার চেষ্টা—তারচেয়ে লড়ে মরা ভাল।

ভুলো ফিরে দাঁড়াবে মনে করছে, এমন সময় একটা ঝাঁকড়া গাছের ফাঁকে তার চোখ পড়ল—গ্রাম! গ্রাম! তাদের গ্রাম! ঐ যে দূরে ছাউনি দেওয়া ঘরগুলো পড়ন্ত রৌদ্রে দেখা যাচ্ছে!

ভুলো ঘেউ ঘেউ করে একটা আনন্দ-ধ্বনি করে বললে, 'পুষি! আর একটু—আর একটু দৌড়ে চল্! আমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি!'

পুষি চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ভুলোর কথা শুনে তার আশা হল, সে দুমড়ে-পড়া পাগুলোকে আবার প্রাণপণে চালাতে লাগল।

দশ মিনিটে অর্ধমৃত অবস্থায় একহাত জিভ বার করে ধুঁকতে ধুঁকতে পুষি আর ভুলো সেই গাছের তলায় এসে বসল—যে-গাছেব তলা থেকে আগের দিন দুপুরবেলা তারা যাত্রা শুরু করেছিল। হনুমানেরা বনের কিনারা পর্যন্ত এসে দাঁত খিঁচিয়ে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে গেল।

পুরো একটি ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে পুষি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বনের দিকে ফিরে ল্যাজটি গলায় দিয়ে গড় হয়ে নমস্কার করে বললে 'এই তোমাকে গড় করছি—যতদিন বেঁচে থাকব আর ওমুখো হব না।—চল্ ভুলো, বাড়ি যাই।'

ভুলোর কিন্তু একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল, মনিবের সঙ্গে বেইমানী করেছে এই ভেবে সে অধোবদন হয়ে রইল।

পুষির লজ্জার বালাই নেই, সে বললে, 'চল্ না, বসে রইলি কেন? ভয় করছে বুঝি?'

ভুলো বললে, 'ভয় করছে না। কিন্তু মনিবের কাছে কি করে মুখ দেখাব ভাই?'

পুষি বললে, 'এই জন্যে তোর ভাবনা? কিছু ভাবিসনে, আমি বলবঅখন যে তোকে পাহারাদার নিয়ে আমি বোনের বাড়ি নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলুম।—আয়।'

এই বলে পুষি গজেন্দ্রগমনে, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গাঁয়ের দিকে চলল। ভুলোও ঘাড়টি নীচু করে অপরাধীর মতন তার পিছনে পিছনে গেল।

পরীর চুমু

অনেক, অনেক দিন আগের কথা। তখন চাঁদ থেকে ছোট-ছোট পরী নেমে এসে পৃথিবীতে খেলা করে বেড়াত। বনের মধ্যে চাঁদের আলোয় কেউ-কেউ তাদের দেখতে পেত;—মৌমাছির মত স্বচ্ছ পাতলা ডানা মেলে তারা বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ত; আর তাদের দেখা যেত না।

যে বনের মধ্যে পরীরা খেলা করতে আসত সেই বনের ধারে একটি বাড়ি ছিল; বাড়িতে একটি ছেলে থাকত, তার নাম মঞ্জু। মঞ্জুর বয়স মোটে ছয় বছর, কিন্তু তার মনে ভারি দুঃখ; বাড়িতে তার খেলার সাথী একটিও নেই। মা-বাবা আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা মঞ্জুর সঙ্গে খেলা করেন না। মঞ্জু বাড়ির মধ্যে একলাটি ঘুরে বেড়ায়, আর একটু সুবিধা পেলেই বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। বনের

মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার বড় ভাল লাগে। সেখানে তার খেলার সাথী নেই বটে, কিন্তু বনের যত পশুপক্ষী সবাই মঞ্জুকে বড্ড ভালবাসে: —খরগোসেরা মঞ্জুকে দেখে লাফালাফি করে তাকে ঘিরে নাচে; কাকাতুয়া উঁচু গাছের ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে কথা কয়; কাঠবেড়ালি পাকা ফলটি তার পায়ের কাছে ফেলে দেয়; ফড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এরা সবাই মঞ্জুর বন্ধু, কিন্তু তবু একটি মানুষ-বন্ধুর জন্য মঞ্জুর মন কেমন করতে থাকে।

বনের মধ্যে কেবল একটা রূপী-বানর আছে, সে মঞ্জুকে দেখতে পারে না। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হলেই সে উপর থেকে তাকে মুখ ভ্যাংচায়, কিচির-মিচির করে ঝগড়া করে। মঞ্জুও তাকে ঢেলা ছুঁড়ে মারে—তখন সে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফাতে লাফাতে পালায়।

আবার মঞ্জুকে বিপদে ফেলবার জন্য রূপী-বানরটা জঙ্গলের মধ্যে গর্তের উপর লতাপাতা ঢাকা দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখে, যাতে মঞ্জু তার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু মঞ্জু সে-সব গর্তে পড়ে না। ফড়িং তাকে সাবধান করে দেয়, বলে,—'হুঁশিয়ার' ওদিক দিয়ে যেয়ো না, দুষ্টু রূপীটা তোমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে।' রূপী তাই শুনে গাছের ডাল থেকে মুখ-বিকৃতি করে ফড়িংকে গালাগালি দেয়। রূপী ভারি বজ্জাত।

একদিন মঞ্জু বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন কিন্তু ফড়িং কাকাতুয়া খরগোস কাঠবেড়ালি কারুর সঙ্গে তার দেখা হল না। ফড়িংএর বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, তাই সে বেরুতে পারেনি; খরগোসেরা রাত্রে চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত লুকোচুরি খেলেছিল, তাই তাদের ঠান্ডা লেগে গেছে—তারা গর্তের মধ্যে গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে শুয়ে আছে; কাকাতুয়াদের বনের অন্যধারে সভা বসেছিল—তারা সবাই সেখানে গিয়েছে। কাঠবেড়ালি তার ছোট খোকার জন্য

ফল খুঁজতে বেরিয়েছিল,—শুকনো ফল খেয়ে খেয়ে খোকার অরুচি হয়েছে, তাই তাজা ফল খাবার জন্য সে বায়না ধরেছে।

একলা বনে বেড়াতে বেড়াতে মঞ্জুর মন উদাস হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল—আহা, আমার যদি একটি খেলার সাথী থাকত, দু'জনে মিলে কেমন খেলা করতুম!

এই কথা ভাবতে ভাবতে মঞ্জু চলেছিল, হঠাৎ সে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। দুষ্টু রুপীটা গর্তের মুখ এমনভাবে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল যে, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে মঞ্জু আবার উঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু চৌবাচ্চার মত গর্তের ধারগুলো এমন উঁচু আর খাড়া যে, সে উঠতে পারলে না। রুপীটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে গাছের ডাল থেকে ঝুঁকে কিচমিচ করে বলতে লাগল, 'কেমন মজা! এবার বাড়ি যাবি কেমন করে? বেশ হয়েছে, এখন গর্তের মধ্যে বসে থাক্! কেমন জব্দ! আর বনের মধ্যে আসবি?'

পড়ে গিয়ে মঞ্জুর হাঁটুতে একটু লেগেছিল; সে বসে হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগল আর ভাবতে লাগল—কী করে সে বাড়ি যাবে! তার মা তাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে কত ভাববেন, তার বাবা বনে-বনে খুঁজে বেড়াবেন। ক্রমে রাত্রি হবে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। তার বিছানাটি খালি পড়ে থাকবে। মা কাঁদবেন, 'মঞ্জু! মঞ্জু!'—বলে ডাকবেন। কিন্তু সে সাড়া দিতে পারবে না। এমনি কত রাত কেটে যাবে—তবু সে এই গর্তের মধ্যে পড়ে থাকবে—বেরুতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে মঞ্জুর ভারি কান্না পেতে লাগল; সে চোখ মুছতে মুছতে ফোঁপাতে লাগল, আর মনে-মনে ডাকতে লাগল—'মা! মা! মা!'

তারপর, অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কখন মঞ্জু ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতেই উপর দিকে চোখ তুলে মঞ্জু দেখলে—একটি ছোট্ট মেয়ে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। মঞ্জু অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুমি কে?'

মেয়েটি ঠোঁটের একটি করুণ ভঙ্গী করে বললে, 'আমি পরী।' বলে পাখনা মেলে উড়ে এসে মঞ্জুর সামনে দাঁড়াল।

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, 'তুমি উড়তে পার!'

পরী বললে, 'হ্যাঁ—তুমি বুঝি গর্ত থেকে উঠতে পারছ না? এস, তোমাকে উপরে নিয়ে যাই।' বলে মঞ্জুর দু'হাত ধরে উড়তে উড়তে উপরে নিয়ে এল।

তারপর দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দু'জনেই প্রায় সমান—পরী বরং মঞ্জুর চেয়ে একটু খাটো। বনের বড় বড় গাছের তলায় আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মঞ্জুর ভারি আহ্লাদ হতে লাগল, সে পরীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোথা থেকে এলে? এত দিন আসনি কেন?'

দু'জনে একটি ফুলে ভরা লতার নিচে গিয়ে বসল। মঞ্জু বললে, 'তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলা করব?'

পরীরও মঞ্জুকে বড় ভাল লেগেছিল, মঞ্জুকে ছেড়ে যেতে তারও ইচ্ছা হচ্ছিল না; সে একটু ভেবে বললে—'আচ্ছা, এক কাজ কর না, তুমিও আমার সঙ্গে পরীর দেশে চল না! সেখানে আমার মতন আরো অনেক খেলার সাথী পাবে।'

মঞ্জু বললে, 'কিন্তু আমি যে উড়তে পারি না, চাঁদে যাব কেমন করে?'

পরী হাসতে-হাসতে বললে, 'সে কিছু শক্ত নয়; আমি এক্ষুনি তোমার ডানা গজিয়ে দিতে পারি, তুমিও আমার মতন পরী হয়ে যাবে।'

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী করে?'

পরী বললে,'আমি যদি তোমায় চুমু খাই, তাহলেই তুমি পরী হয়ে যাবে; আমার মতন তোমারও পাখনা গজাবে।'

মঞ্জু ভাবলে, পরী ঠাট্টা করছে। তাও কি কখনো হয়, মা তো মঞ্জুকে কত চুমু খান, কই তার পাখনা গজায় না তো!

সে বললে, 'যাঃ, সে কি হয়!'

পরী বললে, 'দেখবে?'—এই বলে লতায় যে-সব ফুল ফুটেছিল, তারই একটিতে সে চুমু খেলে। ফুলটি অমনি প্রজাপতি হয়ে রঙিন ডানা মেলে উড়ে গেল।

মঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পরী বললে, 'দেখলে?—তুমি পরী হবে?'

মঞ্জু ভাবতে লাগল। পরী হবার তার খুব ইচ্ছা, কিন্তু পরী হলে যদি মা'র কাছে থাকতে না পায়! মা তার জন্য কাঁদবেন—'মঞ্জু মঞ্জু' বলে ডাকবেন, আর সে তাঁর কাছে যেতে পাবে না—এ কষ্ট মঞ্জু কী করে সহ্য করবে?

সে জিজ্ঞাসা কবলে, 'পরী হলে আমি মা'র কাছে থাকতে পাব?'

পরী মাথা নেড়ে বললে, 'না। তোমাকে তখন পরীর দেশে গিয়ে থাকতে হবে। পরীদের মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া মানা। তুমি ছোট মানুষ, তাই আমি তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি।'

মঞ্জু আবার ভাবতে লাগল। খেলার সাথী পেতে হলে মাকে

হারাতে হয়। কিন্তু মাকে ছেড়ে সে তো কিছুতেই থাকতে পারবে না! তাই, ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'না, আমি পরী হব না; আমি মা'র কাছে থাকব।'

পরী মুখখানি বিষণ্ণ করে বললে, 'আমরা রোজ রাত্রে চাঁদ উঠলে এই বনে খেলা করতে আসি। চাঁদ হচ্ছে আমাদের বাড়ি—সেখানেই আমরা থাকি। কাল রাত্রে খেলা করতে-করতে আমি একটি লতার ঝোপে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভেঙে দেখলুম, চাঁদ অস্ত গিয়েছে, আমার সঙ্গীরা সব চলে গেছে: আমি একলাটি বনের মধ্যে পড়ে আছি।' পরীর রাঙা-রাঙা পাতলা ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

মঞ্জু পরীর গলা জড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব—তুমি কেঁদো না। আমার একটিও খেলার সাথী নেই, আজ থেকে তুমি আমার সাথী হলে। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'জনে বাড়ি ফিরে যাব, এক বিছানায় শুয়ে ঘুমুব—মা তোমায় কত আদর করবেন—তারপর সকালবেলা এখানে এসে আবার আমরা খেলা করব। কেমন?'

পরী দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠলে আমার সখীরা ফিরে আসবে, তখন আমি তাদেব সঙ্গে বাড়ি যাব।'

মঞ্জুর মুখ ম্লান হয়ে গেল। পরীকে সে অনেক অনুনয় করলে, কিন্তু বাড়ির জন্য পরীর মন কেমন করছিল, সে থাকতে রাজী হল না।

পরীরও মনে ভারি দুঃখ হল, কিন্তু সে আব কিছু বললে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; পরী মঞ্জুর হাত ধরে তার বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে গেল। যাবার সময় মঞ্জুর ইচ্ছা হল পরীকে একটা চুমু খেয়ে ফেলে; কিন্তু মা'র কথা মনে পড়তেই আর তা পারলে না। বাড়ি যেতে-যেতে ছলছল চোখে কেবল পবীব পানে ফিরে-ফিরে চাইতে লাগল। পরীরও মঞ্জুকে একলাটি ফেলে যেতে ইচ্ছা করছিল না, সে বললে, 'মঞ্জু, যদি পরী হবার ইচ্ছা হয়, চাঁদ উঠলে বনের মধ্যে যেয়ো।' এই বলে পরী বনে ফিরে গেল।

সেই যে দুষ্টু রূপী বানরটা—যে গাছের উপর থেকে মঞ্জু আর পরীর সব কথা শুনেছিল আর পরীর চুমুতে ফুল কেমন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল তাও মিট্‌মিট্ করে দেখেছিল, তার ভারি লোভ হল পরী হবার জন্য। কিন্তু পরীর চুমু না পেলে তো আর পরী হওয়া যায় না; তাই সে লুকিয়ে পরীর পিছনে-পিছনে ঘুরতে লাগল। তার মতলব—সুবিধা পেলেই পরীকে চুমু খেয়ে নিজে পরী

 হয়ে যাবে।

পরী মঞ্জুকে পৌঁছে দিয়ে সেই লতার তলায় এসে বসল। তখন রূপী এক-পা এক-পা করে তার কাছে এসে বাঁদুরে মুখে হাসি এনে বললে, 'পরী, তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই আমায় একটা চুমু খাবি?'

পরীর একেই তো মন খারাপ ছিল, তার উপর রূপীর এই কথা শুনে তার আরও রাগ হল, সে বললে, 'দূর হ দুষ্টু! পাজি কোথাকার!' বলে মাটি থেকে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলে। রূপী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কিচির-মিচির করতে করতে পালিয়ে গেল।

ক্রমে রাত্রি হল। পূব আকাশে গাছের মাথায় চাঁদ উঠল; তখন একঝাঁক পরী খেলা করবার জন্য চাঁদ থেকে নেমে এল। তারা 'সুধা সুধা' বলে ডেকে ডেকে বনময় খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে পরীটির সঙ্গে মঞ্জুর ভাব হয়েছিল, তার নাম ছিল—সুধা।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে পরীরা দেখল, একটি ফুলে ভরা লতার নিচে সুধা চুপটি করে শুয়ে আছে।

সকলে সুধাকে ঘিরে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল—'কী হয়েছে? কাল রাত্রে ফিরে যাওনি কেন? অমন মুখ ভার করে বসে আছ কেন?' কিন্তু সুধা উত্তর দেয় না, মঞ্জুর জন্য তার মন কেমন করছে।

শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর সুধা সব কথা বললে। শুনে পরীদের মধ্যে মন্ত্রণা-সভা বসল। একটি পরী—তার নাম কণা—বললে, 'মঞ্জু রাত্তিরে এসে আমাদের সঙ্গে খেলা করে না কেন?' সীধু নামে একটি পরী বললে, 'সে যে মানুষ' সে রাত্তিরে ঘুমোয়।' সকলে বললে, 'তবে উপায়?......'

একটি পরী—তার নাম লেখা—তার ভারি বুদ্ধি, সে বললে, 'এস, এক কাজ করি। এখন রাত্তির হয়েছে—মঞ্জু ঘুমুচ্ছে। সুধা

চুপি-চুপি গিয়ে চুমু খেয়ে তাকে পরী করুক। তখন মঞ্জু আর মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না—আমাদের দলের একজন হয়ে যাবে। আমরা তাকে নিয়ে চাঁদে চলে যাব।'

সকলে বললে, 'এই ঠিক হয়েছে—এই বেশ হয়েছে!'

তখন সকলে সুধাকে মঞ্জুর বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিলে। সুধা উড়তে উড়তে গিয়ে মঞ্জুর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, মঞ্জু একলাটি বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সে পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকল। মঞ্জুর ঘুমন্ত মুখে চাঁদের আলো পড়েছে—সে স্বপ্নে হাসছে; বোধ হয় পরীদের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখছে!

সুধা তার বিছানায় ঝুঁকে তার ঠোঁটে একটি চুমু খেলে।

অমনি—আশ্চর্য ব্যাপার! মঞ্জু পরী হল না!

সুধার পাখনাদুটি পিঠ থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। তার চোখদুটো জড়িয়ে এল; সে মঞ্জুর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরীরাজ্যের কথা আর তার মনে রইল না। সে পরী ছিল—মঞ্জুর ঠোঁটের পরশ পেয়ে মানুষ হয়ে গেল।

রূপী-বানরটা পরীদের মন্ত্রণা শুনেছিল, তাই সেও সুধার পিছন-পিছন এসেছিল। জানলা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখলে, মঞ্জু আর পরী পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ভারি কৌতূহল হল; সে গুটি-গুটি ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, পরীর পাখনাদুটি মাটিতে পড়ে আছে। সে ভাবলে,—এই তো ঠিক হয়েছে, আর আমায় পায় কে? এবার আমি পরী হব—এই ভেবে পাখনাদুটি নিজের পিঠে জুড়ে দিলে।

পরীর পাখনাদুটি রূপীর পিঠে জুড়ে গেল বটে, কিন্তু সে পরী হতে পারলে না। রূপী ভারি দুষ্টু, তাই সে পরীও হল না, রূপী-বানরও রইল না,—বাদুড় হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে পরীরা অনেকক্ষণ সুধার পানে চেয়ে রইল। কিন্তু সুধা ফিরল না। তখন চাঁদ অস্ত যায় দেখে তারা সবাই চলে গেল।

অনেক রাত্রে মা মঞ্জুকে দেখতে এলেন। দেখলেন, মঞ্জুর পাশে একটি ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট মেয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনি অনেকক্ষণ তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাদেব মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর একটু হেসে আস্তে আস্তে দুজনের কপালে চুমু খেলেন।

মোক্তার ভূত

শিবু-মোক্তার আর বেণী-মোক্তারকে মহকুমার সকলেই চিনত, তাদের মতন ধূর্ত ধড়িবাজ লোক ও-তল্লাটে আর ছিল না। লোকে যেমন তাদের চিনত তেমনি ভয়ও করত। একবার তাদের পাল্লায় পড়লে আর কারুর রক্ষে ছিল না—জোঁক যেমন গা থেকে রক্ত শুষে নেয় অথচ জানতে পারা যায় না, তারাও তেমনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে টাকা শুষে শুষে মক্কেলকে সর্বস্বান্ত করে দিত।

আদালতে দু'জনের মধ্যে রেষারেষি চলত, আবার বাইরে ভাবও ছিল। শিবু মক্কেলকে বলত, 'বেণীটা জানে কি? ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব।' আবার বেণীও নিজের মক্কেলকে বলত, 'শিবুটা একটা আস্ত গাধা—আইনের প্যাঁচে ফেলে ওর দফা-রফা করব।'—কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একজন আর একজনের দাওয়ায় বসে তামাক না খেলে রাত্রে ঘুম হত না।

এমনিভাবে দুই মোক্তার সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্ব আর ভিতরে শত্রুতা করে ক্রমে ক্রমে বুড়ো হয়ে এলো। দু'জনেরই বেশ টাকাকড়ি বাড়িঘর হয়েছে—বলতে গেলে তারাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। বারোয়ারী দুর্গাপুজোয় এক বছর শিবু প্রেসিডেন্ট হয়, পরের বছর বেণী প্রেসিডেন্ট হয়—স্কুল-কমিটিতেও তাই। কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

ওদের দু'জনের মধ্যে বোধ হয় শিবুরই ফিচেল বুদ্ধি বেশী ছিল। সে একদিন মনে মনে মতলব আঁটলে—বেণীকে ভাল করে ঠকাতে হবে। কারণ এ পর্যন্ত কেউ কাউকে ভাল করে ঠকাতে পারেনি. বুদ্ধির যুদ্ধে কখনো বেণী জিতেছে কখনো শিবু জিতেছে। ফলে দু'জনের মধ্যে কেউই বড়াই করে বলতে পারত না যে. আমি বেশী চালাক।

শিবু-মোক্তার ফন্দি ঠিক করে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হন্তদন্ত হয়ে বেণীকে গিয়ে বললে, 'ভাই বেণী, বড় বিপদে পড়েছি. পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পার, কালই ফেরত পাবে।'

বেণী শিবুর মতলব বুঝতে পারলে না. বললে. 'তার আর কি। নিয়ে যাও।

শিবু টাকা নিয়ে নিজের ধাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসল। পরদিন টাকা ফেরত দেবার কথা. কিন্তু শিবুর দেখা নেই। বেণীর মন উতলা হয়ে উঠল। তারপর আরো দু'দিন কেটে গেল. কিন্তু শিবুর টাকা দেবাব কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

বেণী মহা ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝলে শিবু তাকে বিষম ঠকিয়েছে—কিন্তু লজ্জায় সেকথা কারুর কাছে বলতে পারলে না। হ্যাণ্ডনোট না লিখিয়ে নিয়ে শিবুকে সে টাকা ধার দিয়েছে একথা জানাজানি হলে দেশসুদ্ধ লোক হাসবে: বলবে—'বেণী-মোক্তারটা গাধা!' শিবুও তাই চায়। বেণী-মোক্তার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল।

শিবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয় বেণী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে. 'ভাই শিবু. আমার টাকা?'

শিবু বলে, 'কিসের টাকা?'

বেণী বলে, 'সেই যে সেদিন তুমি ধার নিলে—পঞ্চাশ টাকা।'

শিবু হেসে বলে, 'বেণী ভাই, বুড়ো হয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? টাকা আবার আমি কবে নিলুম?'

বেণী রেগে বলে, 'দেবে না তাহলে? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব।

শিবু হ্যা-হ্যা করে হেসে বলে, 'বেশ তো, মকদ্দমা কর না, হ্যান্ড-নোট আছে নিশ্চয়?'

বেণী রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে চলে যায়।

ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বেণীর পঞ্চাশ টাকা শিবু-মোক্তার বেবাক ঠকিয়ে নিয়েছে। সবাই আহ্লাদে আটখানা, ভাবলে—'আহা, কাকের মাংসও কাকে খায়?' বেণীকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—'হ্যাঁ দাদা, তুমি নাকি লেখাপড়া না করেই শিবুকে টাকা ধার দিয়েছিলে? শেষে তোমারই এই দুর্বুদ্ধি হল?'

বেণী কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না, ঘাড় নেড়ে বলে, 'আরে না না, ওসব শিবেটার মিথ্যে কথা। শুধু হাতে টাকা ধার দেব আমি? আমাকে কি কুকুরে কামড়েছে? দাঁড়াও না, শিবেকে আমি—'

যখন একলা থাকে তখন শিবুর পেজোমির কথা ভেবে দাঁত কড়মড় করে আর গালাগাল দেয়।

এমনিভাবে টাকার কথা ভেবে ভেবে বেণী অসুখে পড়ল। একে বুড়ো বয়স তার উপর টাকার শোক—বেণী যায় যায়। ডাক্তার বদ্যিরা তার অবস্থা দেখে আশা ছেড়ে দিলে।

বেণী কিন্তু তখনও টাকার আশা ছাড়েনি; কেবলই ভাবছে, কি করে শিবুর কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করবে। তার আর অন্য চিন্তা

নেই। যখন বদ্যি নাড়ী দেখে বললে—'হরি-নাম কর! গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! গঙ্গাজল মুখে দাও.' বেণী তখনো ভাবছে কোন ফিকিরে শিবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।

শেষে মরণের আর দেরি নেই দেখে বেণী শিবুকে ডেকে পাঠালে। শিবু এসে তার পাশে বসতেই বেণী আর সকলকে সরে যেতে বললে। সবাই সরে গেলে বেণী কট্‌মট্‌ করে শিবুর দিকে চেয়ে বললে. 'আমার টাকা?'

শিবু মনে-মনে হেসে বললে. 'কিছু ভেবো না ভাই বেণী. তোমার টাকা ঠিক আছে। এখন হরি-নাম কর। তোমার ভাল-মন্দ একটা কিছু হলেই তোমার টাকা তোমার ছেলেকে দেব—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।'

বেণী বললে. 'না, এখুনি দাও।'

শিবু বললে. 'এখন টাকা কোথায় পাব ভাই? কালই তোমার ছেলের হাতে দিয়ে দেব—তুমি ভেবো না।'

বেণীর প্রাণ তখন কণ্ঠায় এসে পেঁাচেছে. তবু সে গোঁ ধরে বললে, 'না, এখুনি টাকা দাও।'

শিবু দেখলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেণী পটল তুলবে. সে বললে. 'আচ্ছা. তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকা আনছি।' বলে সে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে শিবু গম্ভীর ভাবে বসে রইল। তারপর বেণীর বাড়ি থেকে যখন মড়াকান্না উঠেছে, তখন সে আবার বেণীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। যেন কতই শোক পেয়েছে এমনি ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেণীর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বললে. 'আমি আর বেণী একমন একপ্রাণ ছিলুম; তাই শেষ সময়ে আমাকে দেখবে বলে বেণী ডেকে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল—আমার ছেলে নেহাত ছেলেমানুষ—দেখবার কেউ নেই—তুমিই দেখাশোনা করো।—তা কিছু ভেবো না বাবা, তোমাদের সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। বেণী আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, তা সে যাক গে, সে টাকা আমি তোমাকে দিলুম। হ্যান্ডনোটগুলো আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পাড়াপড়শী যারা ছিল তারা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—তাইতো! কি আশ্চর্য! শিবুর সঙ্গে বেণীর এত ভালবাসা ছিল?

ক্রমে বিকেল হয়ে আসছিল; পাড়ার অনেক ছেলে-ছোকরা জুটে বেণীর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলল। শিবুও বন্ধুত্বের খাতিরে সঙ্গে গেল। ইচ্ছেটা, বেণীর শেষ দেখে তবে বাড়ি ফিরবে।

 গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে যখন সবাই পেঁাছুল তখন সন্ধ্যা হয়

হয়; পশ্চিমের আকাশে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করছে। মড়া নামিয়ে ছেলে-ছোকরারা কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু বুড়ো মানুষ, তাই সে মড়া ছুঁয়ে ঘাটেই বসে রইল।

কেউ কোথাও নেই, শিবু একলাটি মড়ার চালি ধরে বসে আছে আর ভাবছে—বেণীকে কি ঠকানোই ঠকিয়েছি, টাকাকে টাকা পেলুম, আবার বেণীটা মরেও গেল। এখন আমি একলাই মোক্তারি করব—আর আমায় পায় কে?

মনের আনন্দে শিবু একটা বিড়ি ধরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে শিবু প্রায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। বেণীর মড়া চালির উপর শুয়ে আছে।

কে চড় মারলে?

শিবু জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছিল, তাই শ্মশানে তার ভয় ছিল না। সে ভাবলে—এ কি হল? তবে কি কোনো শকুনি কিম্বা গীধ তার গালে পাখার ঝাপটা মেরে গেল? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? আকাশে তো একটাও পাখি নেই! শিবুর বড়ই ভাবনা হল। সে সতর্কভাবে বসে মড়া পাহারা দিতে লাগল।

শিবু মড়ার পায়ের দিকটাতে বসেছিল, হঠাৎ মড়াটা এক পা তুলে ক্যাঁৎ করে তার পেটে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার যেমন ছিল তেমনি ভাবে শুয়ে রইল। লাথি খেয়ে শিবু 'কোঁক্‌' করে উঠেছিল, কিন্তু তবু সে সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার মনে হল, বেণীটা নিশ্চয় মরেনি, তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার এই ফন্দি বার করেছে। নইলে মড়া কখনো লাথি মারতে পারে?

শিবু বেণীর নাড়ী টিপে দেখলে—নাড়ী নেই!—গা বরফের মতন ঠাণ্ডা। তখন বুকে কান রেখে দেখলে শব্দ হচ্ছে কি না। কিন্তু বুকও একেবারে নিস্তব্ধ।

এই দেখে শিবুর ভীষণ ভয় হল—বেণী যে মরে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং এ বেণীর ভূত না হয়ে যায় না। বেণী যে ভূত হয়েও সেই পঞ্চাশ টাকার কথা ভোলেনি তা বুঝতে পেরে শিবু উঠে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবার যো ছিল কি! যেই সে মড়ার বুক থেকে মাথা তুলতে যাবে অমনি বেণীর মড়া তড়াক করে চালির উপর উঠে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। শিবু গলা ছাড়াবার জন্যে যতই টানাটানি করে—বেণীর মড়া ততই তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। শেষে সেই শ্মশানের উপর মড়ায়-মানুষে দস্তুরমত কুস্তি বেধে গেল। এ ওঠে তো ও পড়ে, ও পড়ে তো এ ওঠে। শিবু যেই

পালাতে যায় অমনি বেণীর মড়া তাকে লেঙ্গি দিয়ে ফেলে দেয়। শিবু 'বাবারে' 'মারে' 'গেলুম রে' করে চেঁচাতে লাগল আর মড়ার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

কিন্তু ভূতের সঙ্গে শিবু পারবে কেন? বেণীর মড়া একেবারে নাছোড়বান্দা—কিছুক্ষণ পরেই শিবু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেলে-ছোকরারা কাঠ যোগাড় করে ফিরছিল, তারা শিবুর চীৎকার শুনে দৌড়ে এসে যে-দৃশ্য দেখলে তাতে তাদের বুকের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারা দেখলে, বেণীর মড়া আর শিবু চালির উপর পাশাপাশি গলা-জড়াজড়ি করে বসে আছে। মড়ার মুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি নেই, তার একটা হাত সাঁড়াশির মতন শিবুর গলাটি জড়িয়ে আছে। শিবুর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে, সে মাঝে মাঝে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পালাতে পারছে না—বসে পড়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

শিবুর ছেলেও মড়া পোড়াতে এসেছিল, তাকে দেখে শিবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল—'ওরে বাবা, শীগ্‌গির বাড়ি যা। পঞ্চাশটা টাকা বেণীর বৌয়ের হাতে দিয়ে আয়গে যা, নইলে আমাকে ছাড়বে না।'

শিবুর ছেলে বাপের অবস্থা দেখে বাড়ি দৌড়ল। আর সকলে আলো জ্বেলে চালি ঘিরে বসে রইল। পোড়াবার উপায় নেই, পোড়াতে হলে দুই মোক্তারকে একসঙ্গে পোড়াতে হয়। কারণ, বেণীর মড়া তখনো শিবুর গলা জাপ্‌টে ধরে বসে আছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ মড়াটা শিবুর গলা ছেড়ে দিয়ে আবার চালির ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল। সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল, তারপর বুঝতে পারলে যে ওদিকে বেণীর পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়ে গেছে।

বন্ধুর বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে শিবু আর সেখানে দাঁড়াল না, একবার 'বাবাগো' বলেই সেই অন্ধকারে পোঁ পোঁ করে শ্মশান ছেড়ে পালাল।

রাতের অতিথি

তোমরা জান না, সে অনেক দিনের কথা, তখন ভারতবর্ষে প্রথম রেল এসেছে। সেই সময় একবার মৃত্যু দেবতার ক্রুর দৃষ্টি এই বাংলা দেশের উপর পড়েছিল। দেয়ালীর সময় যেমন পোকা মরে তেমনি মানুষ মরে দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

নির্জিত নিস্তেজ জাতির উপর বিধাতার এই ক্রোধ যে মহামারীরূপ ধরে দেখা দেবে এ কেউ কল্পনা করতে পারেনি। শুধু পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার ধারের একটি গ্রামে একজন লোক তার ইসারা পেয়েছিল।

গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ এই গ্রামের সবচেয়ে বড় গৃহস্থ। তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান হাল গরু অনেক আছে। গ্রামের সকলে তাকে ভারি শ্রদ্ধা করে। সে ভারি ভাল লোক, বিষয়-বুদ্ধিও যেমন আছে তেমনি শরীরে দয়া-মায়ারও অভাব নেই।

সে সময় গ্রামের পাশ দিয়ে রেল লাইন যাবার উঁচু বাঁধ তৈরি হচ্ছিল—হাজার হাজার কুলি তাতে কাজ করত, গ্রামের কাছেই তারা ছাউনি ফেলে থাকত; দিনের বেলায় তাদের কোদাল কুড়ুল গাঁইতির

শব্দে চারিদিক চঞ্চল হয়ে উঠত আর রাত্রে তাদের ছাউনির হাজার হাজার আলো গ্রাম থেকে আলেয়ার মত বোধ হত।

গ্রামের লোকেরা হাঁ করে তাদের কাজ দেখত আর ভাবত, না জানি এসব কি হচ্ছে। রেল তারা কখনো দেখেনি তাই এই উঁচু পাড়ের অর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারত না; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে মাথা নেড়ে বলত, 'এসব ভাল ব্যবস্থা নয়, কোম্পানী মাটি কেটে জাঙ্গাল তৈরি করছে, বর্ষার জল বেরুতে পাবে না; তখন দেশের কি অবস্থা হবে!'

কিন্তু তার কথা কে শুনবে? ক্রমে কুলিরা কাজ করতে করতে এগিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু তাদের তৈরি লম্বা উঁচু বাঁধটা। তার পাশে ছোট ছোট গাছ গজাতে শুরু করল, গাঁয়ের ছেলেরা তার উপর উঠে খেলা করত। আস্তে আস্তে জিনিসটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেল।

এমনিভাবে চার-পাঁচ মাস কেটে গেল।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল আর ঝিমচ্ছিল। এক পায়রা-মটর প্রমাণ আফিম্ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল—তার উপর হুঁকোয় মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে মৌতাত বেশ জমে এসেছিল। এমন সময় খট্-খট্ শব্দ শুনে চমকে উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক লাঠি হাতে করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তার চেহারা দেখা গেল না, মৃত্যুঞ্জয় ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'কি চাও? কে তুমি?'

'অতিথি।'

অপরিচিত লোকটার গলার আওয়াজ শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত যেন জমে গেল, এমন আওয়াজ সে জীবনে কখনো শোনেনি। 'তুই থুলি মুই থুলি' পাখির ডাক শুনেছ? ঠিক সেই রকম আওয়াজ—কানে গেলেই গা শিউরে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় কোন-রকমে হাতের হুঁকোটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

'ওপার থেকে।'

মৃত্যুঞ্জয় মনে করলে গঙ্গার ওপার থেকে। সে তখন চাকর ডেকে আলো আনতে বললে। অতিথি অভ্যাগত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে প্রায়ই আসত—কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না, আগন্তুকদের থাকবার জন্যে একটা ঘর ছিল—তারা যতদিন ইচ্ছা থেকে খাওয়া-দাওয়া করে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যেত।

চাকর আলো নিয়ে এল। তখন অতিথির চেহারাখানা দেখা গেল। মাথার উপর মস্ত একটা পাগড়ী, তার ল্যাজটা মুখের চারিদিকে

এমনভাবে জড়ানো যে মুখের কোনো অংশই দেখা যায় না, শুধু চোখ দুটো যেখানে থাকা উচিত সেখান থেকে যেন একটা কালো আভা বেরুচ্ছে। সর্বাঙ্গে একটা কালো চাদর ঢাকা, পায়ে নাগরা জুতো। লাঠিটা যে হাতে ধরে আছে সে হাতের কব্জি পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে— আবলুশের মত কালো! মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে বড় ভয় হল। এই গ্রীষ্মকালে লোকটা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে আছে কেন? মুখ দেখাচ্ছে না কেন? চোর ডাকাত নয় তো? মনে মনে সে এই কথা ভাবছে এমন সময় অতিথি খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠল! হাসি শুনে মৃত্যুঞ্জয় চমকে উঠে বললে, 'তা বেশ, আজ রাত্তিরে এখানেই থাকুন— বসুন এসে। ওরে, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দে।

'দরকার নেই। আলোটা নিয়ে যেতে বলুন।'

চাকর আলো নিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে লোকটা মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে বসল; মৃত্যুঞ্জয়ের গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে মুখে বললে, 'আপনার কোথায় যাওয়া হবে?'

'পুবের দিকে যাচ্ছি।'

তারপর দুজনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এই বৈশাখ মাসের গরমেও মৃত্যুঞ্জয়ের গা একটু শীত শীত করতে লাগল। হুঁকোয় বড় বড় গোটাকয়েক টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তামাক ইচ্ছে করবেন কি? আনিয়ে দেব?'

আবার সেই খল্‌খল্‌ হাসি! আগন্তুক বললে, 'তামাক, বহুকাল খাইনি। কিন্তু থাক, এযাত্রা আর কাজ নেই।'

এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে পড়ল যে আগন্তুকের নাম জানা হয়নি সে বললে, 'মশায়ের নামটি কি?'

অতিথি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অন্ধকারে মনে হল যেন তার চোখ দিয়ে কালো আগুন বেরুচ্ছে, সে বললে, 'অত খবরে দরকার কি, যা বলেছি তাই যথেষ্ট, এখন আমি কোথায় শোব দেখিয়ে দাও, অনেক দূর থেকে এসেছি ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।'

অতিথির এই রূঢ় কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাগও হল আবার ভয়ও হল। একবার ভাবলে, হয়ত কোনো রাজারাজড়া গোছের বড়লোক ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই পরিচয় দিতে চায় না, যা হোক, সে বললে, 'কিন্তু আহারাদি করবেন না?'

'না, আমার পেটের ক্ষিদে তোমরা মেটাতে পারবে না। আবার যখন আসব তখন হবে।'

অতিথির কথার মানে মৃত্যুঞ্জয় কিছুই বুঝতে পারলে না, কিন্তু তবু বাড়িতে অভুক্ত অতিথি থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই সে আবার বললে, 'কিন্তু, অনেক দূর থেকে আসছেন বললেন, ক্লান্তও

হয়েছেন. একটু আহার করে শুলে হত না?'

অতিথি অধীর ভাবে বললে. 'না. কোথায় শোব দেখিয়ে দাও।

মৃত্যুঞ্জয় তখন তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে। অতিথি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল; তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নানারকম দুর্ভাবনা মৃত্যুঞ্জয়ের মনে আনাগোনা করতে লাগল। লোকটা কে? যদি ভাল লোকই হবে তবে অমন মুখ ঢাকা দিয়ে বেড়ায় কেন? লোকটার গলার আওয়াজ কি ভয়ঙ্কর—শুনলেই গা কেঁপে ওঠে. আর গায়ের রঙ কি কালো। শুধু একটা হাত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সেটা যেন আলকাতরার মত! যদি সত্যিই ডাকাত কি বদমায়েস হয় তাহলে উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির ভিতর গিয়ে চাকরবাকরকে সাবধান করে দিলে যেন তারা রাত্রে সতর্ক থাকে। আর নিজে ঠিক করলে ওই অজ্ঞাত অতিথির গতিবিধির উপর নজর রাখবে। মনে মনে এই সঙ্কল্প এঁটে সে রাত্রির মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসল। বাড়িতে একটা বহুকালের পুরনো মরচে-ধরা তলোয়ার ছিল. সেইটে সঙ্গে রইল।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিশ হাত দূরে অতিথির ঘর—সেখান থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত আসছে না। এদিকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে মৃত্যুঞ্জয় ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে আর মাঝে মাঝে চোখ টেনে অতিথির ঘরের দিকে চাইছে। ক্রমে রাত্রি বেড়ে চলল. গ্রাম একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশের বড় বড় তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল।

একবার মৃত্যুঞ্জয় পা টিপে টিপে উঠে অতিথির দরজায় আড়ি পেতে শোনবার চেষ্টা করলে অতিথি জেগে আছে কিনা। কিন্তু কোন শব্দই সে পেল না—এমন কি অতিথির নাক ডাকার শব্দ পর্যন্ত নয়। তখন সে ফিরে এসে আবার তামাক সেজে টানতে লাগল। এমনি ভাবে রাত-দুপুর পার হয়ে গেল।

হুঁকো হাতে করেই মৃত্যুঞ্জয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে চট্‌কা ভেঙে চোখ চেয়ে দেখলে আকাশে হলুদ রঙের এক টুক্‌রো চাঁদ উঠেছে—তারই আলোতে বাইরের প্রকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। শব্দটা কোন্‌ দিক থেকে এল সে ধরতে পারেনি. কান খাড়া করে রইল। কিছুক্ষণ বাদে খুট্‌ করে আবার শব্দ হল। যেন কে খুব সন্তর্পণে অতিথির ঘরের দরজা খুলছে। মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

 কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধ। তারপর অতিথির ঘরের দরজা দিয়ে

একটা মূর্তি বেরিয়ে এল! চাঁদের আবছায়া আলোতে তার চেহারা দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের স্পন্দন যেন হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার উন্মত্ত বেগে ছুটতে আরম্ভ করল। সে দেখলে, মানুষ নয়, একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল উলঙ্গ হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার হাড়গুলো সাদা নয়—কুচ্‌কুচে কালো। পাঁজরার ভিতর দিয়ে এপার ওপার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আর হাতে সেই লম্বা লাঠিটা।

চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকারে বসে মৃত্যুঞ্জয় অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। কঙ্কালটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকে ফিরে দেখলে—তার মাংসহীন মুখে সারি সারি দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় বিকট হাসির মত মনে হল। তারপর সে উঠান পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

তার মূর্তিটা বাইরে মিলিয়ে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করবার ক্ষমতা ছিল না, গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই কঙ্কালটা কোথায় গেল জানবার অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অথচ কঙ্কালের পিছন পিছন যাবার ইচ্ছা—এ এক আশ্চর্য মনের অবস্থা। বাঘের পিছু পিছু যখন ফেউ ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের মনের ভাবও বোধহয় ওই রকম হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে দেখলে কঙ্কালটা লাঠি কাঁধে করে অনেক দূরে এগিয়ে চলেছে। সেও সেইদিকে চলল। ক্রমে কঙ্কাল শ্মশান-ঘাটে গিয়ে পেঁৗছল। মৃত্যুঞ্জয় তখন একটা গাছেব আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

শ্মশানে অনেক ভাঙা কলসী আর মড়ার হাড়গোড় পড়েছিল। চিতা জল দিয়ে নিভিয়ে দেবার পব যেমন সেখানে একটা লম্বা গর্ত হয়ে যায়, সেইরকম একটা জায়গায় কঙ্কালটা গিয়ে দাঁড়াল। তারপব কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে তার মুণ্ডটা সেই গর্তেব মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মুণ্ডটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। তখন পৈশাচিক অট্টহাসির মত একটা চিৎকার করে কঙ্কালটা সেই জ্বলন্ত লাঠি কাঁধে ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

মৃত্যুঞ্জয়ও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে ছুটতে লাগল। তখন তার আর বাহ্যজ্ঞান নেই, স্বপ্নে যেমন নিজের দেহ মনেব উপর কোনো অধিকার থাকে না তেমনি অসহায়ভাবে সে কঙ্কালকে অনুসরণ কবে ছুটে চলল।

লাঠির আগাতে আগুন জ্বলছিল বটে, কিন্তু তা থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশি বার হচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় দেখলে, ধোঁয়াটাও ঠিক যেন ধোঁয়া নয়, যেন রাশি রাশি কালো পোকা বেরিয়ে চারিদিকেব বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন অগণ্য অসংখ্য মশা সেই আগুনে জন্ম-গ্রহণ করে আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে রেলের বাঁধের উপর উঠে কঙ্কালটা ছুটতে লাগল আর এক অপার্থিব হাসি হাসতে লাগল। যেন সে হাসি অন্যান্য অশরীরী সঙ্গীদের ডেকে বলছে—আয় আয়, মানুষের রক্ত শুষে খাবি তো আয়! হা-হা! বড় মজা! শীগ্গির আয়! শীগ্গির আয়!

রেলের পাড়ের উপর উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে—তার বাড়ির দিকটাতে যেন অনেক আলো জ্বলছে, সেদিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-কথা ভাববার তার সময় ছিল না, সে অন্ধভাবে কঙ্কালের পিছনে ছুটে চলল।

কঙ্কাল সমস্ত গ্রামটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে আগুন লেগেছে, সমস্ত বাড়িখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কঙ্কাল তার হাতের জ্বলন্ত লাঠিটা সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর হঠাৎ ফিরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে দাঁড়াল।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে আর তখন ভয় ছিল না, সে কঙ্কালকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?'

কঙ্কাল খল্‌খল্‌ কবে হেসে বললে, 'কে আমি? আমি অগ্রদূত, আমার সঙ্গীরা সব আসছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আসছে। বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে—ঘরে ঘরে মড়াকান্না উঠবে, তারপর চিতায় দেবার লোকও থাকবে না—ঘরে ঘরে পচা মড়া পড়ে থাকবে। রাস্তায় শেয়াল কুকুর মড়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে। হাঃ হাঃ হাঃ! আসছে—তারা আসছে! আমি যাই—এগিয়ে চলি।' এই পর্যন্ত বলে কঙ্কাল যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।

পূর্বদিক তখন ফর্সা হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, মনে হল যেন ধোঁয়ার মত প্রকাণ্ড একঝাঁক মশা সঙ্গে করে নিয়ে লম্বা পা ফেলে কঙ্কালটা পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

গাঁয়ের লোক এসে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির আগুন নেভাবার চেষ্টা করলে; কিন্তু আগুন নেভানো গেল না—বাড়ি একেবারে ছাই হয়ে গেল।

মূর্ছা ভেঙে উঠে মৃত্যুঞ্জয় পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সব কথা বললে। তার গল্প শুনে গাঁয়ের লোকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর যে-বার বাড়ি ফিরে গিয়ে এই কথাটাই আলোচনা করতে লাগল যে কাল রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের আফিমের মাত্রা নিশ্চয় এক-মটর থেকে দু'-মটরে উঠেছিল।

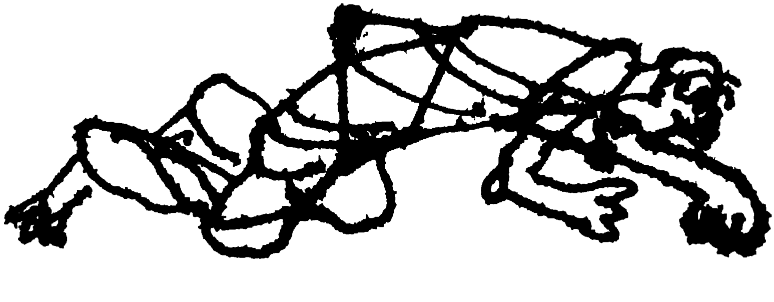

সাপের হাঁচি

পরীক্ষা দিয়ে সুশান্ত তার মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ি; কিন্তু কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়—ডায়মন্ডহারবার লাইনে রেলে চড়লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেখানে পেঁছিনো যায়।

সকালবেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে সুশান্ত দেখল, মামার বাড়িতে হৈ হৈ কাণ্ড বেধে গেছে। মামা বেশ ভারিক্কি লোক, বয়স হয়েছে; কিন্তু তাঁর মাথা আজ একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কখনো দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন, কখনো ভীষণ চীৎকার করে গাঁসুদ্ধ লোককে গালাগাল দিচ্ছেন। ওদিকে বাড়ির ভেতরে মামীমা গলা ছেড়ে কান্না শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর গলার আওয়াজ যদিও খুব উঁচুতে উঠছে, তবু তিনি যে কি বলছেন তা একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

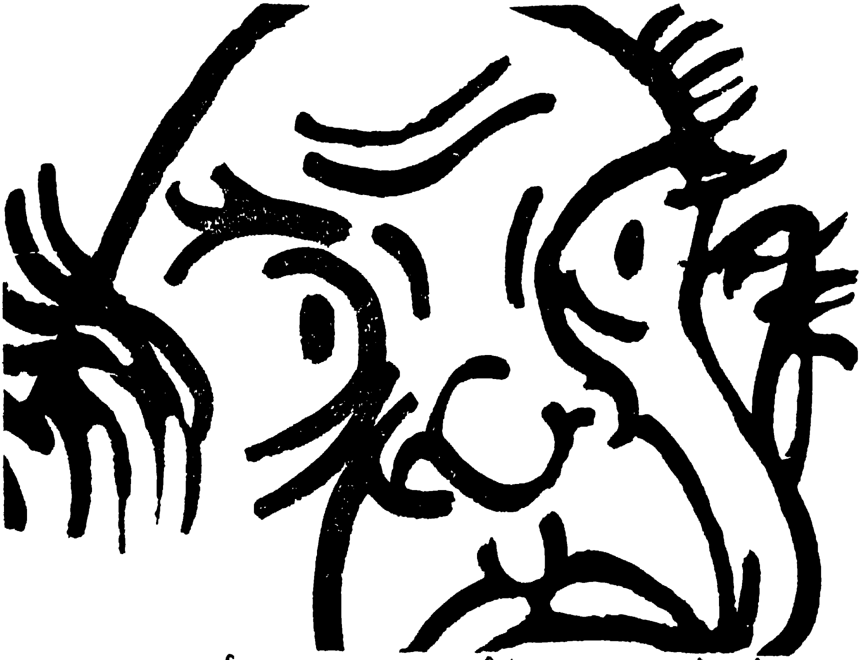

মামা যদিও গ্রামের মধ্যে বেশ বর্ধিষ্ণু লোক তবু তাঁর বাড়ি মাটি-কোঠার—খড়ের চাল। এ অঞ্চলে পাকা বাড়ির বড় একটা রেওয়াজ নেই। চণ্ডীমণ্ডপে মামাকে ঘিরে অনেক লোক বসে ছিল, সুশান্ত সেখানে গিয়ে মামাকে প্রণাম করে বলল, 'কি হয়েছে মামা?'

মামা মাথা থেকে একমুঠি চুল ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'আমার

সর্বনাশ হয়ে গেছেরে বাবা! ঐ শালা নিধের কাজ—এ আর কেউ নয়। নিধে আজ দেড় মাস হল জেল থেকে বেরিয়েছে। বেটা দাগী চোর। ও ছাড়া আর কারুর কাজ নয়।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু হয়েছে কি? নিধে কি?'

মামা গর্জে উঠলেন, 'নিধে? শালা চোর ডাকাত বোম্বেটে। দত্তদের বাড়িতে সিঁধ কেটে আড়াই বছর জেলে গিয়েছিল। এবার তাকে ফাঁসি দিয়ে তবে আমি ছাড়ব।'

মামার কাছে কোনো খবর পাওয়া যাবে না বুঝে সুশান্ত বাড়ির ভেতর গেল। সামনেই তার দশ বছরের মামাতো বোন কালীকে দেখে বলল, 'কি হয়েছে রে কালী?'

কালী অমনি কেঁদে ফেলে বলল, 'ও দাদা, আমার টায়রা আর হার—ইঁ—ইঁ—ইঁ—'

সুশান্ত তাকে অনেক প্রশ্ন করল; কিন্তু ইঁ ইঁ ইঁ ছাড়া আর কোনো কথাই বার করতে পারল না। তখন হতাশ হয়ে মামীমার কাছে

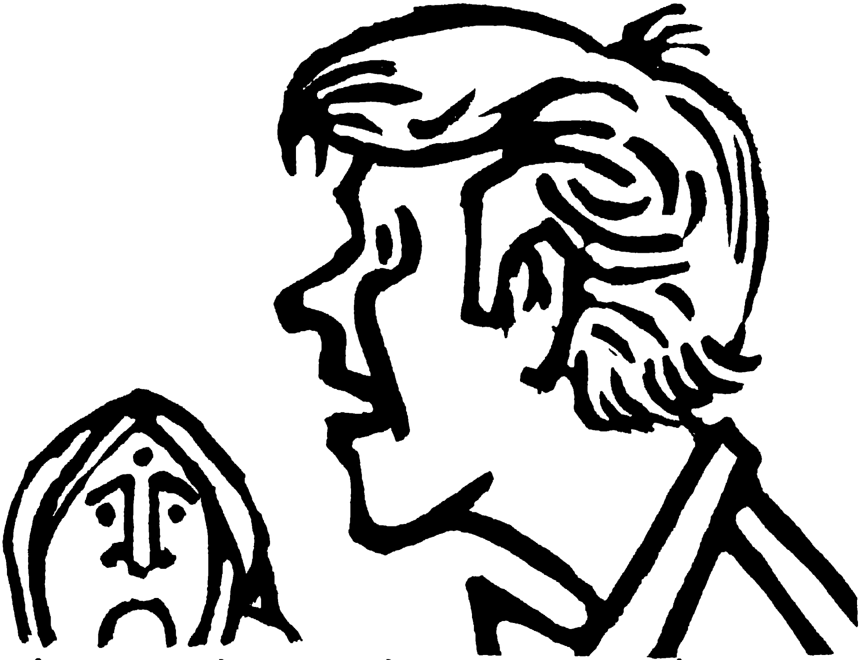

গিয়ে বলল, 'মামীমা, তোমাদের কি হয়েছে আমাকে বলবে কি?'

মামীমার কান্না একটু থেমেছিল—আবার আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর তিনি সুশান্তকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে বললেন, 'ঐ দ্যাখ বাবা, কাল রাত্তিরে চোরে সিঁধ কেটে আমাদের সমস্ত গয়নাগাটি চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কালী বলল, 'আমার টায়রা আর হার—ই'—ই'—ই'—

সুশান্ত দেখল, সত্যিই দেয়ালের মাটি কেটে একটা গর্ত তৈরি করা হয়েছে—বেশ বড় গর্ত। একটা জোয়ান লোক অনায়াসে তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র ঠিকই আছে, কেবল যে বাক্সটার মধ্যে গহনা থাকত তার ডালা ভাঙা—ভেতরে কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে সুশান্ত দালানে বসল। মামীমা চোখ মুছতে মুছতে তাকে মুড়ি আর নারকেল-নাড়ু এনে খেতে দিলেন।

খেতে খেতে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কখন তোমরা জানতে পারলে?'

মামীমা বললেন, 'অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনতে পেলুম, পাশের ঘরে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। প্রথমটা ভাবলুম বুঝি ইঁদুর ধরবার জন্য বেড়াল ঢুকেছে। কিন্তু তার পরই মনে হল, দরজায় তো তালা লাগানো, জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ—বেড়াল ঢুকবে কি করে? তখন তোর মামাকে গা ঠেলে তুললুম। তিনি উঠে তালা খুলে দেখলেন, চোর গয়নার সিন্দুক ভেঙে সমস্ত গয়না নিয়ে পালিয়েছে।'

'কত টাকার গয়না ছিল?'

'তা—আমার আর কালীর মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকার।' বলে মামীমা ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

'তারপর?'

'তারপর তোর মামা চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড় করলেন। সকলেই বলল, এ নিধি হাজরার কাজ। তার মতন পাকা চোর এ অঞ্চলে আর একটি নেই। এই সেদিন আড়াই বছর জেল খেটে বেরিয়েছে।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'নিধি হাজরা লোকটা করে কি? ক্ষেত খামার আছে?'

মামীমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাঁসুদ্ধ লোকের নাড়ীর খবর জানতেন, বললেন, 'দু' বিঘে জমি আছে বাবা, কিন্তু সে-জমি চাষও করে না কিছুই না—এমনি পড়ে থাকে। নিধে কাজকর্মও কিছু করে না, কেবল খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলে বসে বসে মাছ ধরে। অথচ পয়সারও কখনো অভাব হয় না—এই তো জেল থেকে ফিরেই নতুন মাটকোঠা তুলেছে। কোথা থেকে পয়সা পেল ভগবানই জানেন।'

সুশান্ত ভাবতে ভাবতে বলল, 'হুঁ—তারপর কাল রাত্রে আর কি হল?'

মামীমা বললেন, 'তারপর পুরুষেরা বাইরে কি করলেন তা তো জানিনে বাবা; ওই পেল্লাদকে জিজ্ঞাসা কর—ও বরাবর ওঁদের সঙ্গে

ছিল।'

পেল্লাদ বাড়ির চাকর। সে এতক্ষণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল, বলল, 'রাত্তিরেই সকলে মিলে ঠিক করলেন নিধের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক সে বাড়ি আছে কিনা। লণ্ঠন জেবলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে সকলে নিধের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে নিধে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল, যেন ঘুমুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ঠাকুর মশায়রা? এত রাত্রে গোলমাল কিসের?'

'নিধে ভয়ানক ধূর্ত সকলেই জানে, তাই তার কথায় কান না দিয়ে বাড়ির চারদিকে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। আদাড় বাদাড়, ঘর-দোর সমস্ত আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হল কিন্তু কোথাও গয়না পাওয়া গেল না। নিধে দাওয়ায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খেতে লাগল।'

সুশান্ত হেসে বলল, 'ভারি শয়তান তো! তারপর?'

পেল্লাদ বলল, 'কর্তা তখন আমাকে থানায় পাঠালেন—দারোগাবাবুকে খবর দেবার জন্যে। থানা এখান থেকে আড়াই কোশ পথ—ভোর রাত্তিরে গিয়ে দারোগাবাবুকে তুললুম। তিনি সব শুনে বললেন, 'আজ সকালে আসবেন।'

সুশান্ত মুড়ি চিবতে চিবতে বসে শুনছিল; অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মামীমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, গয়না ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি?'

মামীমা কেবল মাথা নাড়লেন; কালী কিন্তু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ দাদা, আমার টিয়াপাখির খাঁচাটাও চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'খাঁচা!'

কালী বলল, 'হ্যাঁ, আমার টিয়াপাখিটা মরে গিয়েছিল তাই তার লোহার খাঁচাটা ঐ ঘরে রেখে দিয়েছিলুম। সেটাও চোরে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত ভুরু কুঁচকে বসে ভাবতে লাগল। তাইতো! এ তো বড় আশ্চর্য চুরি! যে চোর সোনার গয়না চুরি করবার জন্যে সিঁধ কেটেছে, সে একটা তুচ্ছ লোহার খাঁচা চুরি করে কেন?

এই সময় বাইরে একটা গোলমাল এবং মামার হাঁকাহাঁকি—'ওরে, পান নিয়ে আয়—তামাক নিয়ে আয়' শোনা গেল। পেল্লাদ বলল, 'ঐ বুঝি দারোগাবাবু এলেন।' বলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

সুশান্ত শহরের ছেলে, তাই পাড়াগাঁয়ে দারোগাবাবুদের কি রকম খাতির তা সে জানত না। সেও তাড়াতাড়ি মুড়ি খাওয়া শেষ করে বাইরে গিয়ে হাজির হল।

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে ফরাসের ওপর বসে দারোগাবাবু তখন তামাক টানছেন। একজন কনেস্টবল আর গাঁয়ের দু'জন চৌকিদার নীচে একটু দূরে উপু হয়ে বসে আছে। চৌকিদারেরা খাতির করে কনেস্ট-বলকে খৈনি টিপে দিচ্ছে।

দারোগাবাবুর বয়স হয়েছে—মুখ দেখেই বোধ হয় বেশ বিচক্ষণ লোক। তিনি চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন, 'হুঁ—এ নিধে হাজরার কাজ বলেই মনে হচ্ছে। সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ, এ তল্লাটে আর যত সিঁধেল চোর আছে সবাইকে আমি হাজতে পুরেছি। নিধেটা পরিপক্ক শয়তান —মিটমিটে ডান—' চৌকিদারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা তো গ্রাম পাহারা দিস—কাল নিধেকে দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিস?'

চৌকিদারেরা হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে না, হুজুর।'

দারোগাবাবু তখন বললেন, 'আচ্ছা, চলুন, নিধের ঘর খানাতল্লাস করে দেখা যাক। সে দাগী আসামী; তার ঘর যখন ইচ্ছে খানাতল্লাস করা যেতে পারে। সে যখন গাঁ থেকে বেরোয়নি তখন চোরাই মাল তার বাড়িতেই আছে।'

মামা বললেন, 'কিন্তু তার বাড়ি কাল রাত্তিরেই আমরা খুব ভাল করে খুঁজেছি।'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'মুখুজ্জে মশায়, আপনাদের খোঁজা আর আমাদের খোঁজায় অনেক তফাত। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে জানেন তো? চলুন।'

দারোগাবাবুর সঙ্গে অনেকে চললেন; সুশান্তও গেল। নিধিরাম হাজরার বাড়ি মিনিট দশেকের রাস্তা। যেতে যেতে সুশান্ত ভাবতে লাগল কেবল সেই খাঁচাটার কথা। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! চোর খাঁচা চুরি করল কেন? পাখি পুষবে বলে? দূর!

তবে? ভাবতে ভাবতে সুশান্তর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ঠিক তো! খাঁচা চুরি করবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—গয়নাগুলো একসঙ্গে তার মধ্যে পুরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখবে? গাছের ডালে কিম্বা চালের বাতায় টাঙিয়ে রাখলে তো আর চলবে না; তাহলে যে দেশসুদ্ধ লোক দেখতে পাবে! তবে? একটা লোহার খাঁচা কোথাও লুকিয়ে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না?

নিধে হাজরার বাড়িতে নিধে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দারোগা বাবু দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন—কিন্তু নিধের দেখা নেই। অনেকক্ষণ দোর ঠেলাঠেলি আর হাঁকাহাঁকির পর নিধে এসে দোর খুলে দিয়ে সামনে দারোগাবাবুকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল,

'আসতে আজ্ঞে হোক, হুজুর মশাই।'

দারোগাবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে? কি করছিলি?'

নিধে হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরছিলুম।'

নিধের চেহারাটি বেঁটে খাটো, তেল চুকচুকে কষ্টি পাথরের মতন রং। মুখে শেয়ালের মতন ধূর্ততা মাখানো। দারোগাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা, জেল থেকে বেরিয়েই আবার আরম্ভ করেছিস? এবার পাকা দশটি বছর ঘানি টানতে হবে তা জানিস?'

নিধে মিটমিট করে চেয়ে বলল, 'কর্তা, আমি কিছু জানি না -মা কালীর দিব্যি। কাল রাতে ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম, দাদা-ঠাকুর দেশসুদ্ধ লোক নিয়ে এসে ঘরে হানা দিলেন। গরীব মানুষ, কারুর সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না আমারই ওপর এত জুলুম কেন বলুন দেখি? সবাই মিলে ঘর দোর ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গেলেন। এখন আবার হুজুর এসেছেন। বেশ আপনিও খানাতল্লাস করুন। যদি আমার বাড়ি থেকে কিছু পাওয়া যায় তখন আমাকে কড়াক্কড় করে বেঁধে নিয়ে যাবেন।'

'খানাতল্লাস করব বলেই তো এসেছি' এই বলে দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকলেন। মামা, সুশান্ত আর দু'জন সাক্ষী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। কনেস্টবল দোরগোড়ায় পাহারায় রইল পাড়ার লোকেরা বাইরে জটলা পাকাতে লাগল।

দারোগাবাবু নিধের বাড়ির গোয়াল থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সুশান্তের তাতে মন উঠল না; তার কেবলই মনে হতে লাগল এখানে নেই - এখানে নেই -

একটা ঘরে অনেক ভাঙা চোরা পুরোনো জিনিস রাখা ছিল; সেই ঘরে ঢুকে সুশান্ত দেখল একটা পাখির খাঁচা পড়ে রয়েছে। বাঁশের খাঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে সুশান্ত দেখল সেটা বেশ ভাল অবস্থাতেই রয়েছে—ভেঙেচুরে যায়নি। তার মনে বড় ধোঁকা লাগল। নিধের ঘরেই যখন খাঁচা রয়েছে তখন সে অনর্থক খাঁচা চুরি করতে গেল কেন?

তারপর বিদ্যুতের মতন এক নিমেষে সে সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিল। আরে! এটা যে কাঁঞ্চর খাঁচা; এতে কাজ চলবে কি করে?

আবিষ্কারের উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল কিন্তু সে কাউকে কিছু বলল না। দারোগাবাবু তখন নিধেকে

দিয়ে উঠানের একটা কোণ কোদাল দিয়ে খোঁড়াচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সুশান্ত এই ফাঁকে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সামনেই খিড়কির পুকুর। পুকুরটি ছোট্ট কিন্তু খুব গভীর, কালো জল দেখেই বোঝা যায়। জলের ধারে ধারে বাবলার ডাল ফেলা আছে যাতে চোর জাল ফেলে মাছ চুরি করতে না পারে। সুশান্ত দেখল ঘাট থেকে ছিপ ফেলা রয়েছে, ফাৎনাটি পুকুরের প্রায় মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। নিথর জলে ঢেউ নেই, একটা মাছও ঘাই মারছে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সুশান্ত ছিপটি তুলে নিল। ছিপের সুতোর ডগাটি—যেখানে বঁড়শি বাঁধা থাকে—হাতে তুলে নিয়ে বেশ ভাল করে দেখল। তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে আবার ছিপটি যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে আস্তে আস্তে ফিরে এল।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে পেল্লাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'পেল্লাদ দুটো বঁড়শি যোগাড় করতে পারিস?'

পেল্লাদ বলল পারি দাদাবাবু বাড়িতেই আছে।'

'তবে যা—চট্ করে নিয়ে আয়।'

পেল্লাদ চলে গেল। সুশান্ত বাড়ির ভেতর ফিরে গিয়ে দেখল দারোগাবাবু হতাশ হয়ে দাওয়ার ওপর বসে পড়েছেন। মামারও মুখ শুকনো। কেবল নিধের চোখ মুখ দিয়ে যেন একটা আনন্দের জ্যোতি বেরুচ্ছে।

দারোগাবাবু বললেন 'নিধে, এখনো মাল বার করে দে, তোকে অল্পে ছেড়ে দেব।'

নিধে বলল, 'হুজুর মা-বাপ, ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। আমি কিছু জানি না।'

দারোগাবাবু আর কি করবেন—চুপ করে রইলেন। নিধের বিরুদ্ধে প্রমাণও তো কিছু নেই যে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন।

তখন সুশান্ত আস্তে আস্তে বলল, 'আমি জানি নিধে চোরাই মাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

মামা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সেকি! তুই জানলি কি করে?

সুশান্ত সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিধেকে জিজ্ঞাসা করল, 'নিধেরাম, তোমার খিড়কির পুকুরে মাছ আছে?'

নিধিরাম বলল, 'আছে দাদাঠাকুর, ছোট মাছ—পুঁটি, বেলে, ন্যাটা এই সব।'

সুশান্ত বলল, 'তুমি যে সব সময় পুকুরে বসে মাছ ধর, কি দিয়ে মাছ ধর?'

'আজ্ঞে, ছিপ দিয়ে ধরি দাদাঠাকুর।'

সুশান্ত একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'ছিপ দিয়ে? বঁড়শি থাকে তো?

নিধের মুখ এতটুকু হয়ে গেল, চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে—তা—তা—থাকে বৈকি।'

এই সময় পেল্লাদ দুটো সুতোয় বাঁধা বঁড়শি এনে সুশান্তর হাতে দিতেই সে বলল, 'দারোগাবাবু, একটা মজা দেখবেন তো আসুন। কিন্তু তার আগে নিধিরামের হাতে হাতকড়া দিলে ভাল হয়।'

সুশান্তর কথাবার্তা শুনে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল সতেরো বছর বয়েসের ছেলের মাথায় যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দারোগাবাবু কনেস্টবলকে ডেকে নিধিরামকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার হুকুম দিলেন। তারপর সুশান্ত সকলকে নিয়ে খিড়কির ঘাটে গেল।

জল থেকে ছিপ তুলে নিয়ে সুশান্ত সকলকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন, নিধিরাম কেমন মজার মাছ ধরে—বঁড়শি নেই। শুধু একটু রাংতা।'

সকলে অবাক। দারোগাবাবু বললেন, 'তাইতো।'

সুশান্ত বলল, 'নিধিরাম ভারি চালাক। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই পুকুরে ছিপ ফেলে রেখেছে—ছোট্ট পুকুর, তলায় যদি কিছু থাকে বঁড়শিতে আটকে উঠে আসবে। কিন্তু ছিপে যে বঁড়শি নেই তা তো আর কেউ জানে না। তাই সবাই ভাবে পুকুরে কিছু নেই। থাকলে ছিপে উঠে আসত। কি বল নিধিরাম, ঠিক কিনা?'

নিধিরাম নির্বাক—তার মুখে আর একটি কথা নেই।

সুশান্ত বলল, 'এবার দেখুন কি করে সত্যিকারের মাছ ধরতে হয়—এই বলে বঁড়শি দুটো ছিপের সুতোয় বেঁধে জলে ফেলল। বঁড়শি তলিয়ে গেল।

তারপর টান মারতেই বঁড়শি একটা ভারি জিনিসে আটকালো। সুশান্ত সাবধানে সুতো ধরে টানতে টানতে বলল, 'কিসে আটকেছে বলুন দেখি! বুঝতে পারেননি? খাঁচা—কালীর টিয়াপাখির লোহার খাঁচা! পুঁটলি বেঁধে জলে ফেললে পাছে কাপড় পচে গিয়ে গয়নাগুলো হারিয়ে যায় তাই লোহার খাঁচার ব্যবস্থা। কতদিনে পুকুর থেকে চোরাই মাল তোলবার সুবিধে হবে তাতো নিধিরাম জানত না।'

সুতো ধরে টানতে টানতে শেষে সত্যি সত্যিই একটা লোহার খাঁচা বঁড়শিতে লেগে উঠে এল। মামা ছুটে গিয়ে খাঁচার মধ্যে হাত পুরে ভেতর থেকে সব জিনিস বের করলেন। দেখা গেল, মামীমা আর কালীর সমস্ত গয়নাই সেখানে রয়েছে—একটিও খোয়া যায়নি।

মামা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সুশান্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ছেলে নয়--হীরের টুকরো। এমন বুদ্ধি কেউ দেখেছ? আর হবেই না বা কেন? মামার ভাগনে তো! কথায় বলে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ—'

দারোগাবাবুও খুশী হয়ে সুশান্তর পিঠ চাপড়ে বললেন 'খাসা ছেলে! চমৎকার ছেলে! বেঁচে থাকো বাবা। আশীর্বাদ করি দারোগা হও।'

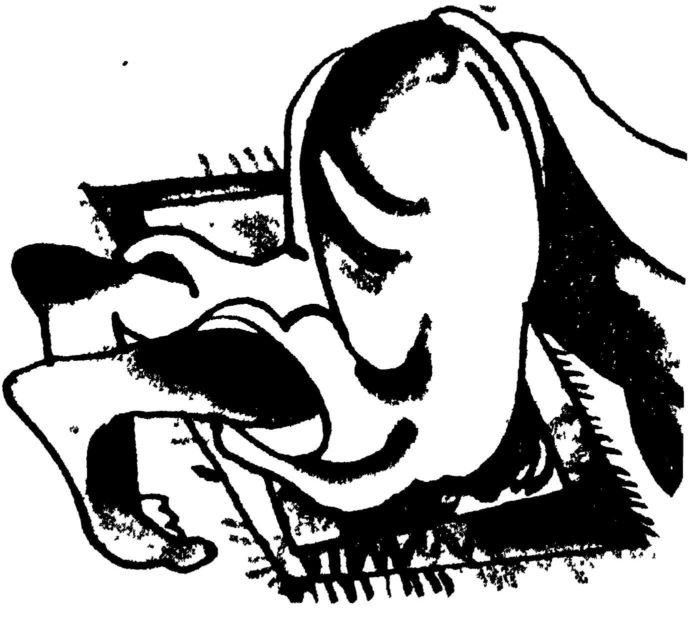

টিকিমেধ

পৈতে হবার পর থেকেই নীলু ইয়া বড় এক টিকি রেখেছিল। তারপর ন্যাড়া মাথায় যতই চুল গজাতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে টিকিও দিব্যি নধর আর পুরুষ্টু হয়ে উঠল।

নীলু ভারি ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় তার মন তো আছেই, তার ওপর আবার সন্ধ্যা-আহ্নিকেও খুব চাড়। রোজ দু'বেলা ঠাকুরঘরে বসে একঘণ্টা ধরে আহ্নিক করে। এমন কি, একাদশীর দিন পাঁজিতে 'সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি' লেখা থাকলেও সে দশবার গায়ত্রী জপ না করে জল খায় না।

তের বছরের ছেলের ধর্মকর্মে এত নিষ্ঠা দেখে নীলুর মা-বাবা খুব খুশী। কিন্তু তার চুকচুকে পালিশ করা লম্বা টিকির ওপর বাড়ির সকলেরই নজর পড়েছে। শুধু বাড়ির নয়, স্কুলের ছেলেরাও নীলুর আদরের টিকির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঐ টিকিটি দেখলেই, কি জানি কেন কুচ্ করে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবার জন্যে সকলের হাত নিসপিস করে।

অন্য কোনো ছেলে ঐ রকম টিকি রাখলে স্কুলের ছেলেরা এতদিনে জোর করে সেটা কেটে ফেলে দিত। কিন্তু নীলুর সঙ্গে চালাকি করবার জো নেই, তার গায়ে ভারি জোর। সে যদি কাউকে একটা চড়

মারে তাহলে তাকে বাড়ি গিয়ে তিন দিন সাবু খেতে হবে। তাই জবরদস্তি করে নীলুর টিকিতে হাত দিতে কেউ সাহস করে না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে নীলুর টিকি নির্মূল করবার ষড়যন্ত্র চলছে—নিরীহ টিকিটা যেন সকলেরই চক্ষুশূল। একদিন নীলুর বন্ধুরা একত্র হয়ে মন্ত্রণা করতে বসল।

বীরেন বলল, 'এক কাজ করা যাক। ফুটবল ফীল্ডে নীলু যখন খেলতে আসবে তখন খেলতে খেলতে কেউ একজন ওর টিকি ধরে ঝুলে পড়ুক। ব্যস্—এক হ্যাঁচকায় টিকি একেবারে সাবাড় হয়ে যাবে।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু মুশকিল এই—হুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? নীলুর চড়ের বহর সকলেরই জানা ছিল। তার টিকি ধরে ঝুলে পড়তে কেউ রাজী হল না।

তখন হাবু বলল, 'আর একটা উপায় আছে। রাত্তিরে নীলু যখন ঘুমোয়, সেই সময় চুপি চুপি গিয়ে ওর টিকি কেটে নেওয়া যাক। সকালবেলা ঘুমিয়ে উঠে নীলু দেখবে টিকি নেই—কিন্তু তখন আর কাকে ধরবে?

এ প্রস্তাবটা আগের চেয়ে নিরাপদ বটে কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, টিকি রাখার পর থেকে নীলু ঘরে দোর বন্ধ করে শুতে আরম্ভ করেছে।

বস্তুত, তার টিকির বিরুদ্ধে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে তা নীলু সন্দেহ করেছিল। তাই টিকি সম্বন্ধে তার সতর্কতার অন্ত ছিল না। কাউকে সে মাথার কাছে হাত আনতে দিত না। আর, কাঁচি কিম্বা ছুরি দেখলেই এমন সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাত যেন একটু অনামনস্ক হলেই তারা আপনা থেকে এসে তার টিকিটি শেষ করে দেবে।

এসব ছাড়া আলটপকা বিপদও অনেক ছিল। একদিন হঠাৎ নীলুর মামা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নীলুর টিকি দেখে বললেন, 'আরে! নীলেটা আবার চৈতন-চুটকি রেখেছে। নিয়ে আয় তো একটা কাঁচি।'

মামার কথা শুনে নীলু একেবারে তার পিসির বাড়িতে চম্পট দিয়েছিল। যতদিন মামা রইলেন ততদিন আর ফিরে আসেনি।

এইভাবে অতি সন্তর্পণে বেচারা তার সাধের টিকিটি বাঁচিয়ে রেখেছিল।

নীলুদের পাশের বাড়িতে একটি আট-নয় বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ছিল—তার নাম পুতুল। সে ছিল নীলুর ছাত্রী—অর্থাৎ শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে নীলুর কাছে অঙ্ক শিখতে আসত। কখনো বা ফার্স্ট বুকের পড়া জেনে নিত। পুতুল নীলুকে ভারি ভাল-

বাসত। নীলুও পুতুলকে ভালবাসত. কিন্তু মনে মনে তাকে একটু ভয়ও করত। কারণ, পুতুল তার মাস্টার মশাইকে যত না খাতির করত তার চেয়ে ঢের বেশী করত শাসন। সে ছিল একেবারে পাকা গিন্নী। ফুটবল খেলতে গিয়ে নীলু যদি কোনদিন পা ভেঙে ফেলত—অমনি পুতুলের কাছে তাকে হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হত। একজামিনে কম নম্বর পেলে পুতুল তাকে ধমক দিত। যেন নীলুই ছাত্র—পুতুল তার মাস্টার মশাই। পুতুলের শাসনে নীলু মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত বটে—চড়টা চাপড়টাও কখনো কখনো মারত—কিন্তু তবু তারা পরস্পরকে এত বেশী ভালবাসত যে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ঝগড়া কোনোদিন হয়নি।

কিন্তু এই টিকির ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধবার উপক্রম হল।

প্রথম যেদিন পুতুল টিকি দেখল—নীলুর পৈতের সময় পুতুল ছিল না. মামার বাড়ি গিয়েছিল—সেদিন সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'ওমা. ও আবার কি! নীলুদা. তুমি একটা বিচ্ছিরি টিকি রেখেছ কেন?'

নীলু চোখ পাকিয়ে বলল. 'বিচ্ছিরি টিকি? জানিস. পুরাকালে ঋষিরা টিকি রাখতেন?'

পুতুল বলল, 'তা রাখুন গে। তুমি টিকি কেটে ফেল, তোমাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে—ঠিক ভট্চাযি্য মশায়ের মতন।'

নীলু সজোরে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'নাঃ, টিকি আমি কাটব না—টিকি হচ্ছে ব্রাহ্মণের লক্ষণ।'

পুতুল গাল ফুলিয়ে বলল, 'ভারি তো লক্ষণ! ঠিক ছাতুখোরের মতন দেখায়।'

'দেখাক্।'

'টিকি কাটবে না?'

'না।'

'আচ্ছা বেশ, আমিও দেখব কেমন তুমি টিকি রাখ।'

নীলুর মনে একটু ভয় হল। ছোট মেয়ে হলে কি হয়. পুতুলের ভারি ফিচেল বুদ্ধি—সে যে কোন দিক দিয়ে কি করবে কিছুই বলা যায় না। নীলু তাকে ভয় দেখিয়ে বলল. 'খবরদার পুতুল! আমার টিকিতে নজর দিলে ভাল হবে না। আমিও তাহলে তোর বিনুনি কেটে বেঁড়ে করে দেব।'

'আচ্ছা, বেশ'—বলে রাগ-রাগ মুখ করে পুতুল চলে গেল।

পুতুল মামার বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনেছিল। যাঁরা ভাল লোক তাঁরা কথা দিয়ে কখনো তা লঙ্ঘন

করেন না, কর্ণের উপাখ্যান শুনে সে তা জানতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে নীলুকে অনুনয় করে বলল, 'নীলুদা, তুমি যে বলেছিলে আমাকে একটা জিনিস দেবে, কৈ দিলে না?'

নীলু জিজ্ঞাসা করল, 'কবে বলেছিলুম?'

পুতুল ভালমানুষের মত বলল, 'সেই যে বলেছিলে, আমি মামার বাড়ি থেকে ফিরে এলে দেবে।'

নীলু কোনো প্রতিজ্ঞা করেছিল বলে মনে করতে পারল না। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কী জিনিস রে?'

পুতুল বলল, 'আগে বল দেবে। তুমি নতুন বামুন হয়েছ, এখন তো আর দেব বলে পরে 'না' বলতে পারবে না।'

নীলুর অমনি সন্দেহ হয় যদি টিকি চেয়ে বসে? সে বলল, 'না, আগে বল কি জিনিস চাই?'

'আগে বল দেবে?'

'না, আগে তুই বল কি চাস্?'

পুতুল তখন বলল, 'তোমার টিকিটি আমায় দাও। সত্যি বলছি, আর কখ্খনো তোমার কাছে কোনো জিনিস চাইব না।'

নীলু দাঁত বার করে হেসে বলল, 'আমি বুঝেছিলাম তোর মতলব। সেটি হচ্ছে না। তার চেয়ে—যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দেব। টিকির সঙ্গে মাথা। তবু সিংএর গল্প জানিস তো?'

পুতুল রাগের জ্বালায় দু'মুঠিতে নীলুর চুল ধরে দু'বার ঝাঁকানি দিয়ে দুপ্ দুপ্ করে চলে গেল—'তোমার চেয়ে কর্ণ ঢের ভাল—ব্রাহ্মণকে অঙ্গদ-কুণ্ডল দিয়ে দিয়েছিল। তুমি খারাপ—বিচ্ছিরি—যাচ্ছেতাই—'

অতঃপর নীলু টিকির জন্যে সর্বদা সতর্ক হয়ে বেড়াতে লাগল। বেচারার প্রাণে আর শান্তি রইল না।

এমনিভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন সকালবেলা নীলু নিজের পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে স্কুলের পড়া মুখস্থ করছিল। এমন সময় পুতুল এসে আস্তে আস্তে তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল। নীলু

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখে বলল, 'এই মুখপুড়ি, তোর হাতে কি আছে দেখি?' পুতুলের হাতে ছুরি কিম্বা কাঁচি আছে কিনা—না দেখে নীলু তাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না।

পুতুল হাত তুলে দেখাল, 'এই দেখ।'

অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই দেখে নীলু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাস্?

'কিছু না।'

নীলু তখন পড়ায় মন দিল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড় বিড় করে আকবর বাদশার চরিত্র কেমন ছিল তাই মুখস্থ করতে লাগল।

পড়ায় বেশ মন বসে গিয়েছিল এমন সময় হঠাৎ সে চুলের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি টের পেল। তাড়াতাড়ি মাথা ফেরাতেই টিকিতে পড়ল টান। 'তবে রে পোড়ারমুখী।' বলে নীলু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। পুতুল ধরা পড়ে গিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

টিকিতে হাত দিয়ে নীলু দেখল—হায় হায়! পুতুল দাঁত দিয়ে তার টিকির অর্ধেকের বেশী গোড়া পেড়ে কেটে নিয়েছে। লম্বায় ছোট হয়নি বটে—কিন্তু নেংটি ইঁদুরের ল্যাজের মত একেবারে লিক্‌লিকে সরু হয়ে গেছে।

রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে নীলু পুতুলকে চারদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল, আর গর্জাতে লাগল, 'আজ ঐ ইঁদুর-দাঁতী পেত্নীর দাঁত আমি ভাঙব।' কিন্তু পুতুল এমন জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে ছিল যে অনেক খোঁজাখুঁজিতেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

একটু ঠাণ্ডা হয়ে নীলু ভাবতে বসল। অনেক ভেবে সে শেষে এক বুদ্ধি বার করল। বাড়িতে খালি চায়ের প্যাকেটের অনেক রাংতা পড়ে ছিল, তাই দিয়ে সে তার শীর্ণ টিকিটি আচ্ছা করে আগাগোড়া জড়িয়ে ফেললে—যাতে কোনো অবস্থাতেই কেউ তাতে দাঁত বসাতে না পারে। এইভাবে টিকির দুর্ভেদ্য বর্ম তৈরি করে সে সগর্বে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার খাপে ঢাকা টিকি দেখে সকলে হি হি করে হাসতে লাগল বটে কিন্তু নীলু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। যারা তার টিকি কাটার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা কিন্তু ভারি মুষড়ে গেল। কারণ এর পর তার টিকিতে হস্তক্ষেপ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এমনিভাবে দিন যেতে লাগল। পুতুলের সঙ্গে নীলুর কথা বন্ধ। পুতুল মারের ভয়ে নীলুর কাছে বড় একটা ঘেঁষে না—কেবল দূর থেকে জিভ ভেঙচিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন পুতুল অসুখে পড়ল। প্রথমে একটু জ্বর, তারপর ক্রমশঃ অসুখ শক্ত হয়ে উঠল। ডাক্তার বললেন, টাইফয়েড।

অসুখের কথা শুনে নীলুর আর রাগ ছিল না--সে রোজ পুতুলকে দেখতে যেত। পুতুল অন্য সময় ছট্‌ফট্‌ করত কিন্তু নীলু এসে তার পাশে বসলে সে শান্ত হয়ে থাকত; কখনো নিজের ছোট্ট রোগা হাতটি নীলুর মুঠির মধ্যে পুরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

টিকির কথা তাদের মধ্যে আর উঠতো না।

অসুখ কিন্তু ক্রমে বেড়েই চলল। সাত দিনের দিন নীলু খবর পেল—ডাক্তার বলেছেন পুতুলের মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে। তাই শুনে পুতুল ভারি কান্নাকাটি করেছে, সে কিছুতেই মাথা মুড়োতে চায় না। কেঁদে কেঁদে তার জ্বর আরো বেড়ে গেছে।

শুনেই নীলু পুতুলের বাড়ি গেল। দেখল, পুতুল বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে—তার দু'চোখ জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে'

নীলুকে দেখে পুতুল বলে উঠল, 'না নীলুদা, আমি মাথা ন্যাড়া

করব না। আমাকে ভারি বিচ্ছিরি দেখাবে।' বলেই জোরে কেঁদে উঠল।

নীলু তার রুক্ষ কটা চুলের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, 'ছি পুতুল, কাঁদতে নেই। অসুখ হলে ডাক্তারবাবুর কথা কি অমান্য করে? দেখিস না, এবার তোর কেমন সুন্দর চুল গজাবে। একেবারে কুচ্‌কুচে কালো।'

'না না না। আমি ন্যাড়া হব না।' বলে পুতুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নীলু তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল—কিন্তু পুতুল কিছুতেই বুঝল না, কেবল কাঁদতে লাগল। ডাক্তারবাবু আর বাড়ির লোকেরা তার কান্না দেখে ভারি বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু উপায় নেই, মাথা ন্যাড়া করতেই হবে। তা না হলে ভাল রকম চিকিৎসা হবে না।

নীলু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবল। কি করা যায়? পুতুলের এমন কোঁকড়ানো চুল কামিয়ে ফেলতে হবে শুনে তারও মন কেমন করছিল কিন্তু কি করবে? উপায় তো নেই। ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন তখন পুতুলকে ন্যাড়া হতেই হবে।

একটা উপায় আছে পুতুলকে রাজী করাবার। কিন্তু সে কথা ভাবতেই নীলুর বুকের ভেতরটা টন্‌টন্‌ করতে লাগল। আহা, তার এত আদরের-

যাহোক, সে জোর করে টিকির শোক মন থেকে দূরে সরিয়ে দিল। তারপব পুতুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, 'আচ্ছা পুতুল, আমি যদি টিকি কেটে ফেলি তাহলে তুই ন্যাড়া হবি?'

পুতুল কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'তুমি টিকি কেটে ফেলবে? সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তুই যদি ন্যাড়া হোস্‌।'

পুতুলের রোগা মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, সে চোখ মুছে বলল, 'আচ্ছা। কিন্তু তুমি আগে টিকি কাটো আমি দেখি।'

নাপিত হাজির ছিল। সে এসে নীলুর বাংতা-মোড়া টিকি কচাং করে কেটে ফেলল।

তখন কাটা টিকিটি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে পুতুল বলল, 'এবার আমায় ন্যাড়া করে দাও।' তারপর নীলুর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হেসে বলল, 'বলেছিলুম কিনা যে তোমার টিকি কেটে তবে আমি ছাড়ব?'

নীলু লজ্জিতভাবে হেসে বলল, 'তুই ভারি দুষ্টু।'

যাত্রী

প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা।

সন্ধ্যে হয়-হয়। পশ্চিম আকাশে তখনো সোনালী আলো ঝিক্‌মিক্ করছে, কিন্তু মাটির ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে। গাছপালার চেহারা কালো আর অস্পষ্ট হয়ে আসছে। দু' একটা পাখি, যাদেব বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেছে তাবা অস্ফুট আশঙ্কায় কিচমিচ করে ডাকতে ডাকতে দ্রুত পাখা নেড়ে উড়ে চলেছে।

একজন পথিক মাঠেব ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাব অবস্থাও অনেকটা ঐ বিলম্বিত পাখির মতন। ভোর থেকে সে হাঁটছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা গ্রামে পৌঁছুতে পাবল না। যে মাঠের ওপর দিয়ে সে চলেছে, সে মাঠের ঘাসেব ওপব পায়েব চিহ্ন আঁকা সরু পথ নেই। শেষ পর্যন্ত মানুষের আস্তানায় পৌঁছুতে পারবে কিনা তাও অনিশ্চিত। তবু সে আশায় ভর করে চলেছে—যদি রাত্রির গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবার আগে কোন একটা পল্লীতে গিয়ে উঠতে পারে।

পথিকের বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ। সে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে। তার বাড়ি পশ্চিম বাংলায়, কিন্তু এগারো দিন হেঁটে হেঁটে সে যে কোথায় এসে হাজিব হয়েছে, তা সে নিজেই জানে না। কাল একটি ছোট্ট গ্রামে রাত্রি কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই সে বেরিয়েছিল—কিন্তু সমস্ত দিন চলেও কোথাও একটি গ্রাম পায়নি। দুপুরে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে নিজের পুঁটলিতে যেটুকু শুকনো চিঁড়ে বাঁধা ছিল তাই খেয়েছিল। তারপর লাঠির ডগায় পুঁটলি বেঁধে লাঠি কাঁধে করে আবার যাত্রা করেছে। কিন্তু পথ তার এখনো শেষ হয়নি।

সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে পথিক এক সময় ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল—খানিক দূবে কতকগুলো গাছপালার আড়ালে একটা জায়গা চক্‌চক্ করছে। পথিক দাঁড়িয়ে পড়ল, সন্ধ্যার আবছায়ায় তার মনে হল, যেন একটা মস্ত দীঘি। তেষ্টায় তাব বুক

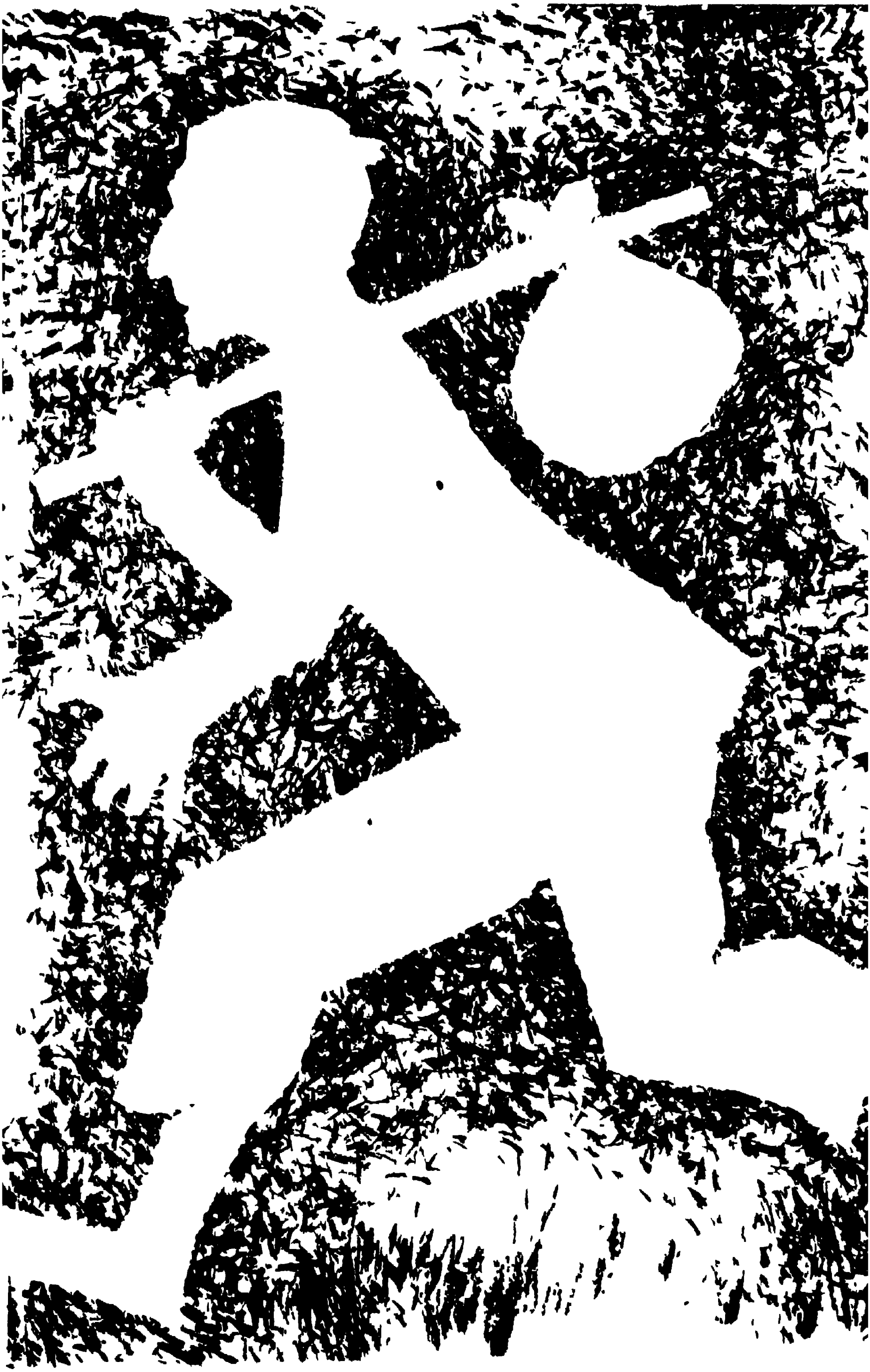

পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। সে আর দ্বিধা না করে পা চালিয়ে সেই দিকে চলল। মনে মনে বলল, দীঘি যদি হয় তাহলে নিশ্চয় কাছে গ্রাম আছে। যাক্, ঠিক সময়েই আশ্রয় পেয়েছি।

আরো কিছু দূর এগিয়ে সে দেখল,—হ্যাঁ, দীঘিই বটে। প্রকাণ্ড দীঘি। এপার থেকে ওপারের বাঁধানো ঘাট ভাল দেখা যায় না।

দীঘির কিনারায় বসে পথিক অঞ্জলি ভরে জল খেল। চোখে মুখে জল দিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। দিনের আলো তখন আরো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দীঘির ওপার পর্যন্ত ভাল নজর চলে না। তবু তার মনে হল, দীঘির ঘাটের ওপর একটি সাদা কাপড় পরা মেয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে উঠে চলে গেল। পথিক তখন নিশ্চিন্ত হল যে কাছে নিশ্চয় গ্রাম আছে। সে তাড়াতাড়ি লাঠি কাঁধে ফেলে যেদিকে ঐ মেয়েটি গোধূলির আঁধারে মিশিয়ে গেল, সেই দিকে চলতে আরম্ভ করল।

দীঘির অপর পারে পোঁছে সে দেখল, সামনেই এক সারি বাবলা গাছ, আর তার ফাঁক দিয়ে এক মস্ত গ্রামের অনেক চালাঘর দেখা যাচ্ছে।

পথিকের তখন ক্ষুধায় ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। তাই সে ভাল করে সব দিক লক্ষ্য না করেই সেই দিকে ছুটে চলল। যদি ভাল করে লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত যে, মেটে বাড়িগুলির দেয়াল অনেক জায়গায় ধ্বসে গেছে। ওপবে খড়েব চাল রোদ বৃষ্টিতে খসে পড়েছে। যেন কত কাল এসব বাড়িতে কেউ বাস কর্বেনি। সমস্ত গ্রামটা শূন্য খাঁ খাঁ করছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবু একটা বাড়িতেও প্রদীপ জ্বলছে না—এসব কিছুই সে লক্ষ্য করল না।

গ্রামের সদব রাস্তা দিয়ে ঢুকেই সে দেখল সামনে একটা বড় খোড়ো বাড়ি। সে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। জীর্ণ দরজা নড়বড় করে উঠল, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সে হাঁক দিয়ে বলল, 'কে আছো—একবার বাইরে এসো।'

তবু সাড়া নেই। পথিক একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবল—তাইতো বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

তখন সে দরজায় জোরে একটা ধাক্কা দিল—সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। কিন্তু তবু কোনো মানুষের পায়ের শব্দ, কি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। পথিক একটু ইতস্তত করে, মাটিতে লাঠি ঠুকে গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকেই সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। এ কি! বাড়ির উঠানে হাঁটু পর্যন্ত কাঁটাগাছ আর আগাছার জঙ্গল। ওদিকের
 ঘরগুলো সব অন্ধকার। পথিকের হঠাৎ গা ছমছম করে উঠল। এ

বাড়িতে কি কেউ থাকে না? পোড়ো বাড়ি!

সে সাহসে ভর করে আর একবার ডাক দিল, 'বাড়িতে কেউ আছো?'

এইবার তার প্রশ্নের জবাব এল। ওদিকের অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে কে যেন মেয়েলি গলায় বলল, 'কে গা তুমি?'

পথিকের এবার সাহস হল। যাক্, তাহলে বাড়িতে লোক আছে। সে বিনীতভাবে বলল, 'মা, আমি যাত্রী। অনেক দূর থেকে আসছি। আজ রাত্তিরের জন্যে আমাকে থাকতে দিতে পারবে?'

ওদিক থেকে জবাব এল, 'পারব। তুমি বোসো।'

কোথায় বসবে? চারদিকে জঙ্গল। পথিক এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখল, তার ঠিক সুমুখে একটি স্ত্রীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এমন আচমকা স্ত্রীলোকটি এসে উপস্থিত হল যে পথিকের মনে হল যেন ভোজবাজি। স্ত্রীলোকটির মুখ সে দেখতে পেল না, কারণ মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'মা, তোমাদের পুরুষেরা কোথায়? তাদের তো কাউকে দেখছি না।'

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভেতর থেকে বলল, 'পুরুষ কেউ নেই। তুমি এসো।'

স্ত্রীলোকটির পেছন পেছন পথিক দাওয়ার ওপর উঠল। দাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। সে পুঁটলি নামিয়ে খুঁটি ঠেসান দিয়ে বসল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'তুমি সমস্ত দিন কিছু খাওনি, নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। ঘরে ঠাণ্ডা ভাত আছে, খাবে?'

পথিক খুশী হয়ে বলল, 'তাহলে তো ভাল হয়। আবার রেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সত্যিই বড় ক্ষিদে পেয়েছে।'

ঘোমটা-ঢাকা মেয়েমানুষটি এতক্ষণ তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। পথিক কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তার বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে লাগল। পোড়ো বাড়ির মধ্যে এ কি অলৌকিক ব্যাপার! সে পালাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় দূর থেকে আওয়াজ এল, 'চলে যেও না। তুমি অতিথি, না খেয়ে গেরস্তর বাড়ি থেকে যেতে নেই।'

পথিক আবার বসে পড়ল। তার পা দুটো এমন কাঁপছিল যে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরে ভাতের থালা হাতে করে স্ত্রীলোকটি তেমনি আশ্চর্য ভাবে তার সামনে আবির্ভূত হল। থালাখানা তার সুমুখে নামিয়ে রেখে বলল, 'খাও।'

তারপর দেয়াল ঘেঁষে বসল।

অন্ধকারে থালায় কি আছে পথিক কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

কম্পিত স্বরে বলল, 'একটা বাতি নেই কি?'

জবাব এল, 'বাড়িতে তেল নেই।'

ভয়ে পথিকের গলা বুজে এসেছিল। তবু সে থালায় যা ছিল তাই তুলে মুখে দিতে লাগল। কিন্তু কি যে খাচ্ছে তা বুঝতে পারল না।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পথিক কলের পুতুলের মতন খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার সমস্ত অন্তরাত্মা পড়ে আছে ঐ কাপড়-ঢাকা স্ত্রীলোকটির দিকে। তাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে হয়তো বা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে আর নীরবতা সহ্য করতে না পেরে সে বলে উঠল, 'এ গ্রামের নাম কি?'

'বীরগাঁ।'

পথিক চমকে উঠল—বীরগাঁ! তার মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে আগের গ্রামে সে শুনেছিল যে এ অঞ্চলে বীরগাঁ বলে এক মস্ত গ্রাম ছিল। পাঁচ বছর আগে প্লেগ মহামারীতে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে - সেই থেকে সেখানে আর মানুষ বাস করে না। এই সেই বীরগাঁ!

হঠাৎ প্রশ্ন হল, 'আর কিছু চাই?'

'না না' বলে পথিক ওঠবার উপক্রম করল।

অন্ধকার থেকে আবার আওয়াজ এল 'উঠো না, তোমার এখনো পেট ভরেনি। শুধু নুন দিয়ে পান্তাভাত কি খাওয়া যায়? তোমাকে একটা লেবু এনে দি, কেমন? গাছেই আছে।'

পথিক কোনো জবাব দিতে পারল না। কিন্তু তারপরই যে ব্যাপার ঘটল, তাতে তার মাথার চুল শজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠল। আবছায়া অন্ধকারে সে দেখল, একটা হাত লম্বা হয়ে ঠিক তার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। উঠানের এক কোণে প্রায় বিশ হাত দূরে একটা পাতি লেবুর গাছ ছিল। সেই গাছ থেকে লেবু পেড়ে হাতখানা আবার ফিরে এল।

'এই নাও লেবু।'

'বাবাগো' বলে পথিক দাওয়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর উঠি কি পড়ি করে ছুটতে আরম্ভ করল। তার পুঁটলি আর লাঠি সেখানেই পড়ে রইল।

ক্ষীণ একটা স্বর সে শুনতে পেল, 'যেও না, যেও না।'

পথিকের তখন আর দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান নেই। সে রাস্তায় বেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। রাস্তার দু'ধারে বাড়িগুলো অস্পষ্টভাবে তার পাশ দিয়ে সরে যেতে লাগল। কোনোটা ভেঙে পড়েছে, কোনোটা অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথাও একটি জীবন্ত প্রাণীর সাড়া নেই—যেন পরিত্যক্ত শ্মশান।

 তখন রাত্রি গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে—আকাশে চাঁদ নেই। কেবল

কয়েকটা নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। পথিক হোঁচট খেয়ে দু'বার পড়ে গেল, কিন্তু তার গতি হ্রাস হল না। গড়াতে গড়াতে উঠে আবার দৌড়তে লাগল। তার মনে হতে লাগল, যেন সেই সাদা কাপড় পরা মূর্তিটা এখনো তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে। এখনি লম্বা হাত বাড়িয়ে তার গলা টিপে ধরবে।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ দৌড়োবার পর পথিক গ্রাম পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুল। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কান ভোঁ ভোঁ করছিল। বুকের ভেতর দুম্‌দুম্‌ করে মুগুরের ঘা পড়ছিল যেন এইবার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। সে তৃতীয়বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আব তার উঠে পালাবার শক্তি ছিল না। সে কিছুক্ষণ মাঠের মাঝখানে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

এইভাবে পড়ে থেকে হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দন যখন একটু কমে এসেছে, তখন সে মুখ তুলে আস্তে আস্তে উঠে বসল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার আলকাতরা মাখানো দেয়ালের মতন তাকে ঘিরে আছে। কোনো দিকে কিছু দেখা যায় না। এমন কি যে গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে এসেছে, সে গ্রাম তাব পিছনে কি সুমুখে কি পাশে তাও সে আন্দাজ করতে পারল না।

কিন্তু এই জনমানবশূন্য দেশে ঘুটঘুটে কালো মাঠের মাঝখানে মানুষ কতক্ষণ একলা বসে থাকতে পারে? পথিক টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। হাঁটু দুটো তার ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু তবু এই ভয়ঙ্কর জায়গা ছেড়ে তাকে পালাতেই হবে। একটা দিক ঠিক করে সে যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে লাগল।

কিন্তু বেশীদূর তাকে যেতে হল না। পাঁচ মিনিট চলবার পরই সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। যেন কাছেই কোথাও অনেকগুলো লোক একসঙ্গে বসে জটলা করে গল্প করছে।

তাদের গলার আওয়াজ ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট। পথিকের মন আশায় ভরে উঠল। সে ভাবল, দৌড়ুতে দৌড়ুতে নিশ্চয় কোনো লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে। সে আগ্রহভরে কান খাড়া করে সেই শব্দ যেদিক থেকে আসছিল, সেইদিকে চলতে লাগল।

শব্দের দিকেই তার লক্ষ্য ছিল। তাই তার পথ যে ক্রমে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে চলেছে, তা সে খেয়াল করল না। ছোট ছোট বাবলার ঝোপে তার গা ছড়ে যেতে লাগল। পায়ে কাঁটা বিঁধতে লাগল—তাও সে অগ্রাহ্য করে শুধু শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

ক্রমশঃ একটা স্যাঁতসেঁতে উদ্ভিদ-পচা গন্ধ তার নাকে আসতে লাগল। একটা ভিজে নিশ্বাস-রোধকর বাতাস তার গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। এদিকে পায়ের নীচে মাটিও ক্রমে নরম তলতলে হয়ে

আসছে। চলতে গিয়ে পা বসে যাচ্ছে, যেন দুর্গন্ধ পাঁকে ভরা জলার দিকেই সে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু যতই এগিয়ে চলেছে মানুষের গলার আওয়াজ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পথিক ভাবছে, এই কাদাটুকু পেরিয়ে যেতে পারলেই সে মানুষের আস্তানায় পোঁছুবে।

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে এক বাবলার ঝোপের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক তার সামনে, প্রায় দশ হাত দূরে, একটা আলোর গোলা মাটি থেকে উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তারই নীল আলোতে পথিক নিমেষের জন্যে সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল। একটা পাঁকে-ভরা কুণ্ডের মাঝখান থেকে ঐ আগুনের পিণ্ডটা উঠছে; আর সেই কুণ্ড ঘিরে অনেকগুলো মূর্তি গোল হয়ে বসে আছে।

পথিকের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ যে আলেয়া! তবে কি সে শ্মশানে এসে পড়েছে? শ্মশানেই তো আলেয়া জ্বলে। আর ঐ যে মূর্তিগুলো বসে আছে, ওরা কারা? মানুষ? কিন্তু মানুষ এই রাত্রে আলেয়া ঘিরে বসে থাকবে কেন? ওদের চেহারা সে ভাল করে দেখতে পায়নি—কিন্তু যেটুকু দেখেছিল—

এই সময় আর একবার আলেয়ার নীল আগুন জ্বলে উঠল। এবার পথিক তাদের ভাল করে দেখতে পেল। মানুষ নয়, তারা মানুষ নয়। শুধু এক পাল আস্ত কঙ্কাল। তাদের গায়ে মুখে কোথাও এতটুকু মাংস নেই।

পথিকের আর চীৎকার করবারও ক্ষমতা ছিল না। সে পিছু ফিরে পালাবাব চেষ্টা করল, কিন্তু—

তার কাপড় বাবলার ড়ালে আটকে গিয়েছিল। যেমনি পালাতে গেল অমনি কাপড়ে টান পড়ল, যেন কে তাকে পিছন থেকে টেনে ধরছে।

পথিকের মুখ দিয়ে কেবল একটা চাপা গোঙানি বার হল। সে কাদার ওপর মুখ গুঁজে পড়ে গেল।

তারপর সব স্থির।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে পথিক দেখল, সেও সেই আলেয়া-কুণ্ডের ধারে বসে আছে। তার মনে আর একটুও ভয় নেই।

আবার আলেয়া জ্বলে উঠল। যারা কুণ্ড ঘিরে বসেছিল তারা নড়েচড়ে বসল। তাদের হাড়গুলো খট্‌খট্‌ করে উঠল।

 পথিকের পাশে যে কঙ্কালটা বসেছিল সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা

করল, 'কি হে, তুমি কতক্ষণ এলে?'

পথিক কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। যেন ইতিপূর্বে কি হয়েছে, তা সে মনে করতে পারছে না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে অদূরে বাবলা গাছের একটা ঝোপ সে দেখতে পেল। মুহূর্ত মধ্যে সে ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, ঝোপের নীচে একটা তাজা মড়া ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

তখন সে সব বুঝতে পারল।

ফিরে এসে বলল, 'আমি এইমাত্র আসছি।'

কঙ্কালটা বলল, 'বেশ, বেশ। ওইখানে অনেক কঙ্কাল পড়ে আছে, তারই একটার মধ্যে ঢুকে পড়। তোমার নিজের কঙ্কাল তৈরি হতে এখনো ঢের দেরি। যতদিন মাংস পচে হাড় না বেরোয় ততদিন ধারেই কারবার চালাও।'

অন্য কঙ্কালগুলো একসঙ্গে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

বিনুর জলপানি

বিনোদ যখন সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্স্ট ক্লাশে উঠল, তখন তার স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'বিনু, এখন থেকে তোমাকে স্কুলের মাইনে দিতে হবে; না দিলে নাম কাটা যাবে।'

বিনুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভারি গরীবের ছেলে; মাইনে দিয়ে স্কুলে পড়বার তার ক্ষমতা নেই। এতদিন সে বিনা বেতনেই পড়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কি হল? সে ক্ষীণস্বরে বললে—'কিন্তু স্যার, আমি তো বেশ ভাল করেই পাস করেছি।'

হেডমাস্টার মহাশয় দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন—'সে আমি জানি বিনু; তুমি ভাল ছেলে। আমার যদি কোন হাত থাকত তাহলে আমি তোমায় জলপানি দিতাম—কিন্তু—' বলে তিনি আবার মাথা নাড়লেন।

বিনু ধরা-ধরা গলায় বললে—'আমি কি কোনো দোষ করেছি, স্যার?'

মাস্টার মহাশয় বিনুর পিঠে হাত রেখে বললেন—'না, তুমি কোনো দোষ করনি। কিন্তু তোমার বাবা—' এই পর্যন্ত বলে কথাটা পাল্‌টে নিয়ে বললেন—'এর ভেতর অনেক কথা আছে, তুমি ছেলেমানুষ, সব বুঝবে না। আমি বলি তুমি এক কাজ কর। জমিদার ভূপতিবাবু হচ্ছেন স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট, তুমি তাঁকে গিয়ে ধর। তিনি যদি হুকুম দেন তাহলে আর কোনো গোল থাকবে না।'

বিনু আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। দশখানা গ্রামের মধ্যে এই একটি হাই স্কুল। বিনুর কত আগ্রহ, কত উৎসাহ ছিল, এখন থেকে জলপানি পেয়ে যদি পাস করতে পারে তাহলে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে। বি-এ, এম-এ পাস করে আবার গ্রামে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন ? কলেজে পড়া তো দূরের কথা, স্কুলের মাইনে যোগাবে সে কোথা থেকে ? তার বাবা অন্য ধরনের লোক। বিনু লেখাপড়া ছেড়ে দিলেই বোধহয় তিনি বেশী খুশী হন। তিনি কেবল দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াতে ভালবাসেন। বিনু নিজের আগ্রহেই এতদূর পর্যন্ত পড়তে পেরেছে—বাবাকে পড়ার খরচ দিতে হলে কোন্ কালে স্কুল ছেড়ে দিতে হত।

রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, জমিদার ভূপতিবাবু বেশ ভাল লোক—খুব দয়ালু আর ধার্মিক। তিনি কি তার এই সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন না? তাঁর এত টাকা আছে—তা থেকে কয়েকটা

টাকা তিনি মাসে মাসে বিনুকে দেবেন না? ভূপতিবাবুর দয়ার ওপরেই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—ভাবতে ভাবতে বিনুর চোখ দিয়ে জল পড়ল।

জমিদার বাড়িতে গিয়ে সে দেখলে. ভূপতিবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন। সে বিনীতভাবে নমস্কার করে দাঁড়াতেই জমিদারবাবু তার দিকে ফিরে বললেন—'কি চাও?'

বিনু সংকুচিতভাবে থেমে থেমে নিজেব বক্তব্য বললে। নিজের দারিদ্রের কথা প্রকাশ করতে তার ভাবি লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু তবু সে সব কথা বললে। লেখাপডাব দিকে তার এত আগ্রহ যে সেজন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা কবত না।

সমস্ত শুনে জমিদাব ভূপতিবাবু বললেন—'হুঁ। তুমি হারাণ হালদারের ছেলে না?'

ক্ষীণস্বরে বিনু বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জমিদার প্রশ্ন করলেন—'তোমাব বাবা তোমার স্কুলের মাইনে দিতে পারে না?'

বিনু চুপ করে রইল।

জমিদার তখন চড়া সুরে বললেন—'ছেলের স্কুলের মাইনে যে দিতে পারে না, সে জমিদারের সঙ্গে মামলা করতে আসে কোন সাহসে?'

এ কথার বিনু কি উত্তর দেবে? সে ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের মধ্যে কান্না গুমরে উঠতে লাগল।

জমিদারবাবু ফটকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—'যাও। এখানে কিছু হবে না।'

গ্রামের পূর্বদিকে তিন-চার মাইল জায়গা জুড়ে জঙ্গল। আগে বোধহয় ঐ জায়গাটায় কোনো বড় শহর ছিল তারপর ভূমিকম্প বা ঐ রকম কোনও কারণে নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনো জঙ্গলে ঢুকলে বড় বড় বাড়ির ইট-পাথর স্তূপীকৃত হয়ে আছে দেখা যায়। সেই সব ভাঙা ইমারতের ফাটলে ফাটলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট-অশ্বত্থ আরো কত রকম গাছ গজিয়েছে। কেবল একটি পাথরের কালীমন্দির এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে অটুট আছে—এমন কি তার লোহার ভারি দরজাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়নি। কিন্তু দিনের বেলায়ও এখানে অন্ধকার হয়ে থাকে—জঙ্গলের ঘন পাতা আর ডাল-পালা ভেদ করে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। গ্রামের লোকেরা সহজে এ জঙ্গলে ঢুকতে চাইত না; তবে মেয়েরা কখনো মানতের পুজো দেবার জন্যে কালী-মন্দিরে যেত কিন্তু সন্ধ্যে হবার আগেই আবার গ্রামে ফিরে আসত। সন্ধ্যের পর এ জঙ্গলে ঢোকবার কারুর সাহস ছিল না।

এই জঙ্গলটি ছিল বিনুর বেড়াবার জায়গা। দিনের বেলা একটু অবকাশ পেলেই সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। বনের মাঝখানে, কালী-মন্দিরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড উঁচু অশ্বত্থ গাছ ছিল। তার মাথা অন্য সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে দেখা যেত। এই গাছটি ছিল বিনুর বৈঠকখানা। ছুটির দিনে সে বই পকেটে করে সেই গাছে গিয়ে উঠত। গাছের প্রায় মগডালের কাছে সে দড়ি দিয়ে একটি দোল্না বানিয়েছিল। তাইতে আরাম করে বসে সে বই পড়ত—ঘুম পেলে ঘুমিয়েও নিত। তার এই গোপন আস্তানাটির কথা কেউ জানত না।

সেদিন বিকেলবেলা জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনু বাড়ি গেল না। পা দুটো তার অজান্তেই তাকে বনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। জমিদারবাবুর কড়া কথাগুলো তার প্রাণে বিঁধেছিল; কিন্তু তার চেয়েও বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তাকে এই চিন্তা যে, সে আর

পড়তে পাবে না। কোথায় পাবে সে টাকা? বাবাকে বলতে গেলে তিনি বলবেন—'ঢের ল্যাখাপড়া হয়েছে; এবার আদালতের মুহুরীর কাজ শেখ। কাল থেকে আমার সঙ্গে সদরে বেরুতে হবে।' বাবার সঙ্গে মোকদ্দমার কাগজ বগলে করে সদরে যেতে হবে, ভাবতেই বিনুর চোখ জলে ভরে উঠল।

ঘন ঘন চোখের জল মুছতে মুছতে যখন সে তার প্রিয় গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই—গাছের নীচে অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। কিন্তু তবু বাড়ি ফিরে যেতে আজ তার মন সরল না। সে গাছে উঠে দোল্‌নার ওপর চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। গাছের মগডালে তখনো বেশ আলো আছে; সেখান থেকে জমিদারবাবুর উঁচু পাকা বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভেবে ভেবে বিনু কোনো কূল-কিনারা পেল না। জমিদারবাবুর ওপর বিনু রাগ করতে পারেনি, শুধু নিজের ব্যর্থ জীবনের কথাই সে ভাবছিল। ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল। পাখিরা যে-যার বাসায় রাত্রির মত আশ্রয় নিলে। তখন সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামতে আরম্ভ করলে।

যখন সে গাছের প্রায় গুঁড়ির কাছ পর্যন্ত নেমেছে তখন হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে থম্‌কে দাঁড়াল।

নীচের অন্ধকারে হাঁড়ির মত গলায় কে বললে—'গঙ্গারাম বাতি জ্বাল।'

কিছুক্ষণ পরে একটা ধোঁয়াটে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলল। বিনু ছিল মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে, সে ঘন পাতার আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখলে দু'জন ভীষণ কালো আর ষণ্ডা লোক ঠিক তার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, হাতে সড়্‌কি লাঠি। তাদের মধ্যে যে-লোকটা সবচেয়ে জোয়ান আর কালো, তার কোমরে তলোয়ার বাঁধা। তাদের চেহারা দেখেই বিনু বুঝলে—এরা ডাকাত, ঐ তলোয়ার-বাঁধা লোকটা এদের সর্দার।

গাছের ওপর একজন লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখছে, এ যদি ডাকাতরা জানতে পারত, তাহলে বিনুর প্রাণের আর কোনো আশা থাকত না, তখনি তাকে কেটে তারা মাটিতে পুঁতে ফেলত। তাই বিনুর বুকের ভেতর যদিও ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছিল, তবু সে মাটির পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল—একটু নড়লে চড়লে পাছে শব্দ হয়।

ডাকাতের দল লণ্ঠন ঘিরে বসল। সর্দার বললে—'আমি সব খবর নিয়েছি। দেউড়িতে দু'জন খোট্টা দারোয়ান থাকে; কিন্তু খিড়কির

দরজায় কেউ পাহারা দেয় না—বুঝেছিস?'

একজন ডাকাত জিজ্ঞাসা করলে—'গয়নাগাঁটি কোথায় থাকে?'

সর্দার বললে—'দোতলার একটা ঘরে। ঘরটা আমি বাইরে থেকে চিনে রেখেছি। গঙ্গারাম, তামাক সাজ।'

গঙ্গারাম বোধহয় ডাকাতের দলে নূতন ভর্তি হয়েছে—লোকটা ওদের মধ্যে সব চেয়ে রোগা। তার কোমর থেকে একটি ছোট্ট ডাবা হুঁকো ঝুলছিল সে সেটা খুলে নিয়ে তামাক সাজতে বসল—'কিন্তু সর্দার, শুনেছি জমিদারের বন্দুক আছে। যদি—'

সর্দার বিদ্রূপ করে বললে—'তোর ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে? এত প্রাণের ভয় যার সে ডাকাতের দলে ভিড়েছে কেন? তুই যা, ছাগল চরাগে।'

অন্য ডাকাতগুলো হেসে উঠল।

গঙ্গারাম মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—'ভয় আমি কাউকে করি না। কিন্তু যদি তারা বন্দুক চালায় তখন কি করবে? মালও হাতছাড়া হবে, মাঝ থেকে প্রাণটা যাবে।'

সর্দার তখন বললে—'সে বন্দোবস্ত কি আমি না করেই এসেছি রে! এই দ্যাখ, যে ঘরে জমিদারের বন্দুক পিস্তল সে ঘরের চাবি চুরি করে এনেছি। দু'দিন যে তার বাড়িতে বাসন মেজেছি সে কি আর সাধে?'

এই শুনে ডাকাতরা ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠল, বললে—'সাবাস সর্দার! তোমাব সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। আমাদের সর্দার হবার উপযুক্ত লোক তুমি।

সর্দার আরাম করে তামাক টানতে টানতে বললে—'এই কাজটা যদি মা-কালীর দয়ায় ভালয় ভালয় উৎরে যায়, তাহলে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল লোটা যাবে—বুঝেছিস? আখেরে আমাদের আর খেটে খেতে হবে না।'

বিনু ডালে বসে বসে তাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। তারা যে কার বাড়িতে ডাকাতি করবার মতলব আঁটছে তা বুঝতে তার বাকি ছিল না। তার ইচ্ছে হল, কোনোমতে ছুটে গিয়ে যদি খবরটা জমিদার-বাবুকে দেওয়া যায় তাহলে এখনো ডাকাতদের ধরা যেতে পারে। কিন্তু গাছ থেকে নামবার তো উপায় নেই। ঠিক নীচেই ডাকাতগুলো বসে আছে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিনুর মা নিশ্চয় তার জন্যে ভাবছেন। হয়তো চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু বিনুর এই

 আস্তানাটির কথা তো কেউ জানে না, কাজেই এদিকে কেউ খুঁজতে

আসবে না। আহা! যদি আসত তাহলে কী ভালই হত! ডাকাত-গ‍ুলোও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে যেত।

গাছের ডালে নিঃসাড়ে বসে বসে বিন‍ুর হাত পায়ে ঝি' ঝি' ধরে গেল। কিন্তু তব‍ু ডাকাতদের নড়বার নাম নেই—তারা বসেই আছে। বসে বসে গল্প করছে আর তামাক খাচ্ছে।

শেষে যখন রাত্রি দ‍ুপ‍ুর হতে আর দেরি নেই, তখন সর্দার হ‍ুঁকো রেখে উঠে দাঁড়াল। কোমরে তলোয়ার কষে বললে—'জোয়ান সব, এবার চল সময় হয়েছে। গঙ্গারাম, তুই এই গাছতলায় লণ্ঠন নিয়ে বসে থাক। এ জঙ্গলটা ভারি বিশ্রী, পথ হারিয়ে যাবার ভয় আছে। কাজ সেরে ফিরে এসে আমি 'কুক' দেব, তখন তুই লণ্ঠন নাড়বি—তাহলে আমরা ব‍ুঝতে পারব তুই কোথায় আছিস। এই গাছতলায় ফিরে এসে আমরা মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করব, ব‍ুঝলি?'

গঙ্গারাম ভয় পেয়ে বললে—'আমি একলা থাকব? কিন্তু যদি—যদি—' তার গলা কাঁপতে লাগল।

সর্দার তাকে ধমক দিয়ে বললে—'ভয় কিসের? বাঘ ভাল‍ুকে তোকে খেয়ে ফেলবে না, এ বনে শেয়াল ছাড়া আর কোনো জানোয়ার নেই।'

গঙ্গারাম বললে—'বাঘ-ভাল‍ুক নয়, কিন্তু যদি—যদি তেনারা, রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই—'

সর্দার হো হো করে হেসে উঠে বললে—'ও—ভূত। তা যদি ভূতের ভয় করে, রাম-নাম করিস।'

তারপর 'জয় মা কালী' বলে ডাকাতের দল অন্ধকারে অদ‍ৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গারাম লণ্ঠনটি দ‍ু' হাঁট‍ুর মধ্যে নিয়ে উপ‍ু হয়ে বসে রইল, আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ গ‍ুর‍ুতর বিপদে পড়লে অনেকের ব‍ুদ্ধি লোপ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ আছে, বিপদ যত ঘিরে ধরে তাদের ব‍ুদ্ধিও তত পরিষ্কার হয়। ডাকাতরা যখন গঙ্গারামকে রেখে চলে গেল, তখন বিন‍ুর মাথায় একটা চমৎকার মতলব খেলে গেল। কি করে ডাকাতদের জব্দ করা যেতে পারে, তার প্ল্যান সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলে।

ডাকাতরা চলে যাবার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তখন বিন‍ু গাছের ওপর একট‍ু নড়ে-চড়ে বসল। খড়্ খড়্ শব্দ শ‍ুনেই গঙ্গারাম সভয়ে একবার ওপর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল—'রাম রাম রাম রাম—'

এমনিভাবে দশ মিনিট রাম-নাম জপ করবার পর গঙ্গারাম যেই থেমেছে, অমনি পাতাস‍ুদ্ধ অশ্বত্থগাছের একটি ছোট ডাল তার স‍ুম‍ুখে

ডাকাতদের মধ্যে লড়াই বাধে আর কি, এমন সময় তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—'বুঝেছি—বুঝেছি—এ গঙ্গারামের কাজ।'

সকলে অস্ত্র নামাল। সর্দার একটু ভেবে বললে—'তা হতে পারে। গঙ্গারাম হয়তো কাছেই লুকিয়ে ছিল, আমাদের ডাকাডাকিতে ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি। তারপর যেই আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি অমনি—। উঃ! গঙ্গারামটা কী নেমকহারাম!'

ঠিক এই সময় ঠুং করে কালীমন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠেই থেমে গেল, যেন অসাবধানে বেজে ওঠার পর কে ঘণ্টাটা হাত দিয়ে চেপে ধরল।

ডাকাতরা উত্তেজিতভাবে পরস্পর মুখের পানে তাকাতে লাগল। তারপর সর্দার চাপা গলায় বললে—'গঙ্গারাম! কালীমন্দিরে লুকিয়েছে! তোমরা সকলে আস্তে আস্তে আমার পেছনে এস।'

ডাকাতরা হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ব্যাধের মত নিঃশব্দে মন্দিরের দিকে চলল।

বিনু মন্দিরের চাতালের আড়ালে হাঁটু গেড়ে লুকিয়ে বসে ছিল, যখন দেখলে পাঁচটা অন্ধকার মূর্তি পা টিপে টিপে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন সে বিদ্যুতের মত এসে প্রাণপণ জোরে মন্দিরের লোহার দরজাটা টেনে কড়াৎ করে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিলে।

তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উঠি-কি-পড়ি করে সে গ্রামের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলে। কাঁটায় হাত পা ছড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও করলে না। গ্রামের সীমানায় যখন এসে পৌঁছুল তখন পূব আকাশে একটুখানি দিনের আলো দেখা দিয়েছে।

বেলা দশটার সময় জমিদার ভূপতিবাবুর বৈঠকখানায় মস্ত সভা বসেছিল। গাঁসুদ্ধ লোক সেখানে হাজির ছিলেন। এমন কি বিনুর বাবা হারাণ হালদারও বাদ পড়েননি।

ডাকাতেরা গতরাত্রে যে সমস্ত জিনিস লুঠে নিয়ে গিয়েছিল সে সবই পাওয়া গেছে; পুঁটলির মধ্যেই ছিল। ডাকাতদের কালীমন্দির থেকে বার করে পুলিশ থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। উপস্থিত সবাই বসে বিনুর গল্প শুনছিল—কি করে সে ডাকাত ধরলে। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, কারুর মুখে একটি কথা নেই।

বিনুর গল্প শেষ হবার 'পর খানিকক্ষণ বৈঠকখানা নীরব হয়ে রইল। তারপর জমিদার ভূপতিবাবু বিনুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেনঃ—'বাবা, তুমি আজ যে সাহস আর বুদ্ধি দেখিয়েছ, গল্পের বইয়েও সেরকম পড়া যায় না। আর আমার যে উপকার করেছ তা তো জীবনে ভোলবার নয়। কাল আমি তোমার প্রতি বড় অবিচার করেছিলুম, তোমার বাবার ওপর রাগ করে তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলুম। ভগবান তাই আমাকে ভালরকম শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার বাবা আমার সঙ্গে যত ইচ্ছে মামলা করুন কিন্তু আজ থেকে তোমার সমস্ত লেখাপড়ার ভার আমি নিলুম। তুমি যতদিন পড়বে-- বি-এ এম-এ, পাস করে যদি তুমি বিলেত যেতে চাও, সে খরচও আমি যোগাব। তোমার মত রত্ন যদি পয়সার অভাবে পড়াশুনো করতে না পায় তাহলে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। আশীর্বাদ করি, তুমি বিদ্বান হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।'

জমিদারবাবুর কথা শুনে সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। বিনু কৃতজ্ঞতাভরা বুকে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

জেনারেল ন্যাপলা

খ্যাংরা কাঠির আগায় একটি আলু বিঁধে দিলে যে রকম দেখতে হয়, নেপালের চেহারাটি ছিল ঠিক সেই রকম। স্কুলসুদ্ধ ছেলে তাকে প্রথমে ন্যাপলা বলে ডাকত। কিন্তু পরে সে নাম বদলে গিয়েছিল।

নেপাল স্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ত। তার বয়স ছিল দশ কি এগারো বছর। কিন্তু ভারি রোগা বলে তার বয়স আরো কম মনে হত। একটা ফড়িংয়ের পায়ে যে জোর আছে, সেটুকু জোরও তার ছিল না। কিন্তু তবু সে ক্রমে ক্রমে স্কুলের ছেলেদের স্নেহ আর সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছিল। কি করে এই হেঁড়ে-মাথা ন্যাল্-ন্যালে ছেলেটা এমন অসাধ্য সাধন করলে?

হীরু নামে স্কুলে একটা ভারি দুষ্ট ছেলে ছিল। সে একদিন নেপালের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিল, 'এই তালপাতার সেপাই, তুই কি ভাত খাস্ না? অমন কাঠির মতন চেহারা কেন?'

হীরুর গায়ে জোর বেশি। নেপাল কোনো উত্তর দেয়নি। চাঁটিও বেবাক হজম করে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরদিনই এমন এক ব্যাপার ঘটল, যাতে হীরু একেবারে কাবু হয়ে পড়ল।

হীরু মাস্টারদের চেহারা বর্ণনা করে কবিতা লিখত, আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেদের পড়ে শোনাত। সেকেণ্ড-মাস্টার হরিবাবুর মাথায় একগাছিও চুল ছিল না, কিন্তু গোঁফ ছিল প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। তিনি ক্লাশে এসে রোলকল করেই ঘুমিয়ে পড়তেন। ছেলেদের বলতেন, 'এসে' লেখো কিম্বা তর্জমা কর। তারপর ক্লাশের শেষে ছেলেদের খাতা পরীক্ষা করে ঘণ্টা বাজলেই উঠে চলে যেতেন। হীরু তাঁর নামেও এক পদ্য লিখেছিল।

সেদিন হরিবাবু ক্লাশে এসেই দেখলেন, তাঁর টেবিলের ওপর একটা খাতা পড়ে রয়েছে। খাতায় কারুর নাম লেখা নেই। তিনি পাতা উল্টে দেখলেন তার ভিতর কবিতাটি লেখা রয়েছে:

মাস্টার বাবু হরি ঘোষ
　　মাথায় টাক কি ভীষণ!
গোঁফ দেখে হয় পরিতোষ
　　যেন রে সুন্দরবন।
গোঁফে যদি যেত টাক ঢাকা
　　কি শোভা হত মরি মরি!
ঘুমুলেই শুরু নাক ডাকা
　　ঘড়র ঘোঁৎ—হরি হরি!

কবিতা পড়েই হরিবাবু একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। গর্জন করে বললেন, 'কে লিখেছে এ পদ্য? শীগ্‌গির বল—নইলে ক্লাশসুদ্ধ রাস্‌টিকেট করব।'

হরিবাবুর মূর্তি দেখে ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে ভয়ে কবিতাটি দেখতে চাইল কিন্তু তিনি দেখালেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ক্লাশে কে পদ্য লেখে?'

সবাই হীরুকে দেখিয়ে দিল। হীরুর মুখ চুন হয়ে গেল! তবু সে সাহস করে বলল, 'কি হয়েছে স্যার?'

হরিবাবু তার চোখের সামনে খাতাটা ধরে বললেন, 'এ পদ্য তুই লিখেছিস?'

হীরু ঢোক গিলে বলল, 'আজ্ঞে স্যার—আমি স্যার—'

'শুয়োর পাজি,' বলে হরিবাবু ঠাস করে তার গালে এক চড়

বসালেন। তারপর কান ধরে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে তাকে হেডমাস্টারের ঘরে নিয়ে গেলেন।

হেডমাস্টার হীরুকে শাস্তি দিলেন, সাতদিন কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড়াবে, আর স্কুলের সমস্ত ছেলের সামনে তাকে বেত মারা হবে।

নেপাল ভাল মানুষের মতন চুপ করে সব দেখল, শুনল। কিন্তু সেই পদ্য লেখা খাতাটা হরিবাবুর টেবিলে কে রেখেছিল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নেপাল সে-ক্লাশের ছেলে নয়, তাই তার ওপর হীরুর সন্দেহ হলেও প্রমাণের অভাবে সে কিছু করতে পারল না। তাছাড়া নেপালের কূটবুদ্ধি দেখে স্কুলের ছেলেরা সবাই তাকে সমীহ করে চলতে লাগল। সে রোগা বলে তার গায়ে হাত তোলবার সাহস আর কারুর রইল না।

শুধু তাই নয়, মাস্টাররাও নেপালের গায়ে হাত দিতে ভয় পেতেন। নেপাল লেখাপড়ায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু বাংলার টিচার বলাইবাবুর হাত থেকে কারুর নিস্তার ছিল না। বলাইবাবু সর্বদাই ছেলেদের ঠেঙাবার ছুতো খুঁজে বেড়াতেন। ক্লাশের যারা ভাল ছেলে তারাও মাঝে মাঝে তাঁর খপ্পরে পড়ে যেত। বলাইবাবু যখন ক্লাশের পড়ায় কোনো ছেলেকে ঠকাতে না পারতেন, তখন তাকে অভিধান থেকে শক্ত শক্ত কথা বেছে মানে জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ না পারলে অমনি এক মুখ হেসে তাকে প্রহার আরম্ভ করতেন।

নেহাত রোগা-পটকা বলে নেপাল এতদিন বলাইবাবুর নজরে পড়েনি। কিন্তু একদিন তাঁর শ্যেনদৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল। তার মাথায় গাঁট্টা মারবার জন্যে বলাইবাবুর হাত নিশপিশ করতে লাগল। তিনি তার পড়া জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।

নেপাল ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগল। একটাও ভুল করল না। তখন শিকার ফস্কায় দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বল, অকুতোভয় মানে কি?'

নেপাল ভারি মুশকিলে পড়ল। কথাটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু ঠিক মানে জানত না। কিন্তু উত্তর না দিলেও রক্ষে নেই। তাই সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'অকুতোভয় মানে কুকুরকে যে ভয় করে না।'

বলাইবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছিস। এদিকে আয়।'

নেপাল তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি যেন ভারি আদর করে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মুঠি শক্ত করে বললেন, 'খাসা ছেলে! সোনার চাঁদ ছেলে! এবার তোকে একটা সোনার মেডেল দেব।' বলে চুল ধরে নাড়া দিলেন।

কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে বলাইবাবু আজ নেপালকে বাগে পেয়েছেন, সহজে ছাড়বেন না। বেড়াল যেমন আধমরা ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, তিনি তেমনি তাকে নিয়ে খেলা করছেন। নেপাল কিন্তু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। চুলে তার বিষম লাগছিল, কিন্তু সে একটু মুখবিকৃতি পর্যন্ত করল না!

বলাইবাবু মধু-ঢালা সুরে বললেন, 'আচ্ছা, এবার বলতো নেপাল 'ইরম্মদ' মানে কি?'

ইরম্মদ শব্দের মানেও নেপাল জানত না; কিন্তু সে ঠক্‌বার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'ইরম্মদ মানে ইরাণ দেশের মদ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক গাঁট্টা। নেপালের মাথাটি আর একটু হলেই ফেটে হাঁড়ির মতন ফুটো হয়ে যেত। বলাইবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তবে রে পাজি, এই বিদ্যে হয়েছে? ইরাণ দেশের মদ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা। দাঁড়াও আজ তোমার ইরাণ দেশের মদ বার করছি।' এই বলে আর একটি গাঁট্টা মারলেন। ঠকাস্‌ করে শব্দ হল।

নেপাল দ্বিতীয় গাঁট্টা খেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল, দু'বার গোঁ গোঁ শব্দ করল, তারপর চুপ।

বলাইবাবু খানিকক্ষণ চড় বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু যখন দেখলেন নেপাল অনড় হয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নাম নেই, তখন তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, 'এই ন্যাপলা—ওঠ।'

নেপাল নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে, নড়নচড়ন নেই। ক্লাশের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। একজন বলল, 'স্যার, বোধহয় মরে গেছে।'

বলাইবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'মরবে কি? গাঁট্টা খেলে কেউ কখনো মরে?'

একটা ছেলে, সে কিছুক্ষণ আগেই গাঁট্টা খেয়েছিল, বলল, 'ও নিশ্চয় মরে গেছে। আপনার গাঁট্টা কি সহজ স্যার, ওর মাথার খুলি ছেঁদা হয়ে গেছে।'

বলাইবাবু একেবারে সাদা হয়ে গেলেন। নেপাল উপুড় হয়ে পড়েছিল, তাকে চিৎ করে দেখলেন তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁতকপাটি। বলাইবাবু কাঁপতে কাঁপতে একটা ছেলেকে বললেন, 'ওরে, যা শীগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে আয়।'

ওদিকে আর একটা ছেলে হেডমাস্টারকে খবর দিতে ছুটেছিল। বলাইবাবু কি করেন, নেপালের দাঁতকপাটি ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দাঁতকপাটি কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। অনেক কষ্টে নেপালের মুখ একটু হাঁ হল। বলাইবাবু তার মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে দিলেন।

 অমনি আবার দাঁতকপাটি! আর, সে কি ভীষণ দাঁতকপাটি!

বলাইবাবু প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে ছাড় ছাড়—ন্যাপলা, গেলুম, ওরে তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি, ছাড়—'

কিন্তু নেপাল অচৈতন্য। বলাইবাবুর চিৎকার শুনতে পেল না। দাঁতকপাটির ঝোঁকে সে তাঁর আঙ্গুল চিবোতে আরম্ভ করল।

এমন সময় হেডমাস্টার মশায় এসে উপস্থিত হলেন। নেপালের মাথায় জল ঢালা হতে লাগল; কেউ তাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর বহুকষ্টে অনেকক্ষণ পরে নেপালের জ্ঞান হল।

বলাইবাবু যখন তার মুখ থেকে আঙ্গুল বার করলেন তখন আঙ্গুলটা ডাঁটা-চচ্চড়ির সজনে ডাঁটার মতন ছিবড়ে হয়ে গেছে।

সেই থেকে বলাইবাবু ছেলেদের গাঁট্টা মারা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য মাস্টারেরাও কেউ নেপালের গায়ে হাত তোলেন না। কে জানে আবার যদি তার দাঁতকপাটি লাগে? বলা তো যায় না।

কিন্তু আসল গল্পটা এখনো আরম্ভই করা হয়নি। নেপালের নাম কি করে জেনারেল ন্যাপলা হল, তারপর সে কি করে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি খেতাব পেল সেই কথাই আজ বলব।

শহরে দুটো স্কুল ছিল। একটা টাউন স্কুল, যাতে নেপাল পড়ত, আর একটা মিশন স্কুল। এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি-মারপিট লেগেই থাকত। ফুটবল হকি খেলা নিয়ে তাদের চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই, রাস্তায়, মাঠে, গঙ্গার ধারে কোথাও দু'দল ছেলের দেখা হলেই প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর মারামারি বেধে যেত।

মারামারির জন্যে সর্বদা তৈরি হয়ে দু'পক্ষ রাস্তায় বেরুত; দু' পকেটে ঢিল ভরা থাকত, আর হাতে থাকত বেতের ছড়ি কিম্বা খেজুরের ডাল। দূর থেকে প্রথমে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি চলত, তারপর পকেটের ঢিল ফুরিয়ে গেলে ক্রমশঃ দুই পক্ষ এগিয়ে এসে ছড়ি চালাতে আরম্ভ করত। তাতেও যদি এক পক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করত তখন হাতাহাতি, আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করে যুদ্ধের অবসান হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নেপালের স্কুলের ছেলেরা এইসব খণ্ডযুদ্ধে বড় একটা জিততে পারত না। প্রায়ই মার খেয়ে তাদের চম্পট দিতে হত। তার কারণ মিশন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খুব বেশি একতা ছিল, আর ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলো সাঁওতাল ক্রীশ্চান ছেলে। তাদের গা এত শক্ত যে তারা ঢিল-কিল গ্রাহ্য করত না, একেবারে বাঘের মতন বিপক্ষদের মধ্যে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। যাহোক, সুখের কথা এই যে, বারবার হেরে গিয়েও টাউন স্কুলের ছেলেরা দমে

যায়নি. সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে।

একদিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় ছেলেরা স্কুলের মাঠে এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। এমন সময় ফুটবল হাফব্যাক সমরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে থেকে এসে হাজির হল। সে বাজারে পেন্সিল কিনতে গিয়েছিল, তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে সবাই বুঝলে একটা কিছু হয়েছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল. সে তখন ব্যাপারটা বলল। বাজারে পাঁচজন মিশন স্কুলের ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়; তারা তাকে দেখে একসঙ্গে এতখানি জিভ বার করে ভেঙচাতে আরম্ভ করে। সে যেখানে যায় তারাও জিভ বার করে তার পিছন পিছন যায়। সমরেশ একা, তারা পাঁচজন. তাই সে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে সাহস করল না। শেষে দূর থেকে তাদের দু'হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'আজ বিকালে দেখে নেব'—বলে সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে।

গল্প শুনে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠল। বাজারের মধ্যে জিভ বার করে পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানোর দারুণ অবমাননা সকলর মর্মে গিয়ে বিঁধল। দু'চারজন ছেলে তখনই গিয়ে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে তৈরি ছিল, কিন্তু এই সময় ঘণ্টা পড়ে যাওয়াতে প্রতিহিংসা সাধন আপাতত মুলতুবি রাখতে হল। স্থির হল. ছুটির পর দেখে নেওয়া যাবে।

স্কুলের ছুটির পর যথাসময়ে দুইপক্ষের দেখা হল এবং যুদ্ধ শুরু হল। ফল কিন্তু আশানুরূপ হল না। মিশন স্কুলের ছেলেরা জিভ ভেংচানোর খবর জানত, তারা তৈরি হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দেখা গেল, যারা প্রতিহিংসা নিতে গিয়েছিল, তাদের হাতের চেয়ে পা বেশি চলছে এবং বিশ্বাসঘাতক পাগুলো সেইদিকেই চলছে যেদিকে শত্রু নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা টাউন স্কুলের ছেলেরা ভারি মনমরা হয়ে নিজেদের খেলার মাঠে বসেছিল—ফুটবলে লাথি মারবার উৎসাহও ছিল না। এই দারুণ দুর্দিনে ছোট-বড়র ভেদজ্ঞানও ঘুচে গিয়েছিল, নীচু ক্লাশের ছেলে, উঁচু ক্লাশের ছেলে সবাই বিমর্ষভাবে এক জায়গায় বসে নিজেদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভাবছিল।

লালুর কপাল ঢিবি হয়ে ফুলে উঠেছিল, সে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠল. 'আমরা কি একবারও ওদের হারাতে পারব না? চিরকালই কেবল হেরে মরব?'

সকলের মনে ওই কথাটাই ঘুরছে, তাই কেউ আর জবাব দিল না।

সুধা বলে একটি ছেলে, সে নেপালের বন্ধু বোধহয়, সকলকে

সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই বলল, 'সেদিন ন্যাপলা কিন্তু ওদের একটা ছেলেকে খুব জব্দ করেছে।'

গিরীন ফুটবলের ক্যাপটেন, বয়সেও সকলের চেয়ে বড়, সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করেছে ন্যাপলা?'

সুধা বলে উঠল, 'উঃ, সে ভারি মজা। ন্যাপলা করেছে কি, একটা টিনের কৌটোয়—; এই ন্যাপলা, তুই নিজে বল না।'

নেপাল কাছেই ছিল, গম্ভীরভাবে বলল, 'স্কুলে আসবার পথে রোজ ও-স্কুলের একটা হুমদো ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হত; সে আমাকে দেখলেই তাড়া করে মারতে আসত। আমি দৌড়ে পালিয়ে আসতুম। সেদিন একটা টিনের কৌটোয় কতকগুলো জ্যান্ত বোলতা পুরে নিয়ে আসছিলুম, ছেলেটা আমায় তাড়া করল। আমি কৌটোটা ফেলে পালিয়ে এলুম। সে কৌটো তুলে নিয়ে যেই তার ঢাকনি খুলেছে, অমনি বোলতাগুলো বেরিয়ে তার মুখে কামড়ে দিল। দু' মিনিটের মধ্যে তার মুখ ফুলে একেবারে ফুটবল হয়ে গেল।'

সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। গিরীন জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কৌটোয় বোলতা পুরলি কি করে?'

নেপাল যেন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন—কৌটোর তলায় চিনি ছড়িয়ে বোলতার চাকের কাছে রেখে দিয়েছিলুম। তারপর চার পাঁচটা বোলতা যখন চিনি খাবার জন্যে ভেতরে ঢুকল অমনি ঢাকনা বন্ধ করে দিলুম।'

সবাই হেসে উঠল। নেপালের বুদ্ধির পরিচয় তারা আগেও কিছু কিছু পেয়েছিল, এখন আবার নতুন করে পেয়ে বেশ খুশি হয়ে উঠল।

গিরীন অনেকক্ষণ নেপালের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর বলল, 'ন্যাপলা, তোর তো খুব বুদ্ধি, ওদের হারাবার কোন ফন্দি বার করতে পারিস?'

নেপাল তৎক্ষণাৎ বলল, 'পারি। এমন ফন্দি বার করতে পারি যে ওরা হেরে ভূত হয়ে যাবে। আর কক্ষনো আমাদের সঙ্গে লড়তে আসবে না।'

সকলে নেপালকে ঘিরে ধরল—'কি ফন্দি! কি ফন্দি! ন্যাপলা, শীগ্‌গির বল'—সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নেপাল বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল, 'এখন বলব না, বললে সব মাটি হয়ে যাবে। গিরীনদা, তোমাদের তিন-চারজনকে চুপি চুপি বলতে পারি। আমি মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি।'

'বেশ, সেই ভাল।'

 তখনই একটা কমিটি তৈরি হল—তার নাম হল 'সমর-সমিতি'।

গিরীন, নেপাল, লালু, সমরেশ—এই চারজন হল সেই সমিতির সভ্য। স্থির হল, এরা যা বলবে সেই মতে সকলকে চলতে হবে। কেউ যদি হুকুম অমান্য করে, তার শাস্তি হবে।

অতঃপর সমর-সমিতির সভ্যরা আড়ালে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। নেপাল তখন তার মতলব প্রকাশ করে বলল। শুনে সকলে একবাক্যে নেপালকে সেনাপতি করল। তার নাম হল জেনারেল ন্যাপলা।

মিশন স্কুলের ছেলেরা তাদের মাঠে বসে গল্পগুজব করছিল, এমন সময় সমরেশ একটা সাদা পতাকা হাতে করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের সেনাপতি কে?'

সমরেশ ফুটবল খেলোয়াড়, তাকে সকলেই চিনত। সাদা পতাকা নিয়ে তাকে এসে দাঁড়াতে দেখে সবাই ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল; এরকম ব্যাপার আগে কখনও ঘটেনি। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ? কি চাও?'

সমরেশ বলল, 'আমি টাউন স্কুল সমর-সমিতির দূত। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মিশন স্কুলের ছেলেরা চট্ করে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তাদেরও খুব উৎসাহ হল। কিন্তু সেনাপতি তো তাদের কেউ নেই! এতদিন এলোপাতাড়ি যুদ্ধ চলেছে। সেনাপতি নিযুক্ত করবার কথা তাদের মনেই আসেনি। তারা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিন্তু সেনাপতি যে তাদের নেই একথাও স্বীকার করতে পারে না। তাদের ফুটবলের ক্যাপটেন প্রতাপ সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি সেনাপতি।'

এই নূতন ধরনের খেলা পেয়ে মিশন স্কুলের ছেলেরা ভারি খুশি হয়ে উঠল। এ যেন জার্মানীর সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হচ্ছে। দূতকে তারা খুব খাতির করে বসাল। কারণ দূত শুধু অবধ্য নয়, তাকে অসম্মান করাও ঘোর অসভ্যতা।

সমরেশ আর প্রতাপ সামনা-সামনি বসল। প্রতাপ সেনাপতির উপযুক্ত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বলল, 'শত্রুর দূত, এবার তোমার কি বক্তব্য আছে বল।'

সমরেশ বলল, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এসেছি।'

সেনাপতি প্রতাপ বলল, 'উত্তম কথা। তোমাদের সেনাপতি কে?'

সমরেশ বলল, 'আমাদের সেনাপতির নাম জেনারেল ন্যাপলা।' নেপালকে এরা কেউ চিনত না, ভাবলে নিশ্চয় খুব জবরদস্ত সেনাপতি। গায়ে ভীষণ জোর।

সমরেশ বলতে লাগল, 'এখন আমাদের সমর-সমিতির বক্তব্য শোনো। আমাদের আর তোমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলে আসছে, কিন্তু সে যুদ্ধই নয়—ছেলেখেলা। আমরা চাই, একদিন রীতিমত যুদ্ধ হোক। তোমাদের দলে ত্রিশজন যোদ্ধা থাকবে, আমাদের দলেও ত্রিশজন থাকবে। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে লড়াই হবে। তারপর এই লড়ায়ে যে পক্ষ হারবে চিরদিনের জন্যে তাদের হার স্বীকার করে নিতে হবে। তোমরা রাজী আছ?'

সব ছেলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'রাজী আছি, রাজী আছি।'

সেনাপতি প্রতাপ হাত তুলে বলল, 'তোমরা চুপ কর—সেনাপতিকে বলতে দাও।' তারপব কিছুক্ষণ মুখ ভীষণ গম্ভীব করে ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বলল, 'আমবা তোমাদেব প্রস্তাবে সম্মত আছি। যুদ্ধ কবে হবে?'

'রবিবার বিকেল তিনটেব সময়।'

'আপত্তি নেই। কোথায় যুদ্ধ হবে?'

'আমবা স্থিব করেছি, গঙ্গার ধারে পশ্চিম দিকে যে বালির চড়া আছে সেইখানে যুদ্ধ হবে; কাবণ সেখানে ওসময় বাইবেব লোক কেউ থাকে না। কিন্তু তোমরা যদি অন্য কোথাও লড়তে চাও আমাদের আপত্তি নেই।'

প্রতাপ বলল, 'না না, চড়াতেই যুদ্ধ হবে—সেই উপযুক্ত স্থান। কিন্তু হার-জিত কি করে বিচাব হবে?'

সমবেশ বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রেব দু'দিকে দুটো কাশেব ঝোপ আছে, তাদের মাঝখানে যুদ্ধ হবে। যে দল কাশের সীমানা পার হয়ে পালিয়ে যাবে তাদেরই হাব। রাজী আছ?'

প্রতাপ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'বাজী আছি। রবিবার বেলা তিনটেব সময় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত থেকো। হব হর মহাদেও।'

সমবেশও যুদ্ধনিনাদ শিখে এসেছিল, সেও পতাকা তুলে ধবে বলল, 'জয় চামুণ্ডে!'

তাবপব সেনাপতিকে ফৌজী কায়দায় স্যালুট করে সমরেশ ঝাণ্ডা কাঁধে করে চলে গেল।

দু'দিকে সমরসজ্জা চলতে লাগল। মিশন স্কুলে বাছাই করে ত্রিশজন ষণ্ডা ছেলেকে সৈনিক দলভুক্ত করা হল। তারা চিরদিন জিতে এসেছে তাই তাদের মনে কোন ভয় ছিল না, তারা চারদিকে বড়াই করে বেড়াতে লাগল—'এবাব টাউন স্কুলের ছেলেদের মেরে পস্তা উড়িয়ে দেব।'

 নেপালের দলও যুদ্ধের জন্যে তৈরি হল। নেপাল ত্রিশজন খুব

চালাক আর মজবুত যোদ্ধা বেছে নিল। রোজ ঢিল ছোঁড়া, লাঠি চালনার কুচ-কাওয়াজ চলতে লাগল। নেপাল বাঁশী বাজিয়ে তাদের পরিচালনা করতে লাগল।

শনিবার রাত্রে সমর-সমিতির চারজন সভ্য চুপিচুপি যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। অন্ধকারে ঘণ্টা দুই ধরে তারা কি করল। তারপর চুপিচুপি ফিরে এল, কেউ জানতে পারল না।

রবিবারে তিনটে বাজতে-না-বাজতে, দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হল; সকলের হাতে খেজুর ডালের ছড়ি, পকেটে ঢিল ভরা। যুদ্ধক্ষেত্রটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা, চওড়া ত্রিশ গজ। নেপালের দল দক্ষিণ দিকে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। মিশন স্কুল উত্তর দিকটা অধিকার করল।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে নেপালী তার সৈন্যদের এক বক্তৃতা দিল, 'ভাই সব, ধীরভাবে যুদ্ধ করবে—ঘাবড়াবে না। সেনাপতির হুকুম শোনবামাত্র পালন করবে। বাঁশীর সংকেত মনে আছে তো। এক ফুঁ দিলে আক্রমণ করবে, দুই ফুঁ দিলে পিছু হটবে, আর তিন ফুঁ দিলে— মনে আছে তো! ব্যস্—বল জয় চামুণ্ডে।'

যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুই পক্ষ প্রথমে নিজেদের কোটে থেকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। নেপালের দল তিন সারিতে সাজানো ছিল—প্রত্যেক সারে দশজন করে। তারা বেশ ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই সব ঢিল তাদের গায়ে পড়ল না। মিশন স্কুলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়নি, এক জায়গায় জড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কাজেই সব ঢিল তাদের মাথায় গিয়ে পড়ছিল।

মিশন স্কুলের ছেলেরা যার-যখন-ইচ্ছে ঢিল ছুঁড়ছিল, কোনো নিয়ম শৃংখলা মেনে চলছিল না। কিন্তু নেপালের দল জেনারেলের হুকুম শুনে ঢিল ছুঁড়ছিল। নেপাল হুকুম দিচ্ছিল, 'ফার্স্ট র‍্যাঙ্ক, ফায়ার।' অমনি দশটা ঢিল একসংগে শত্রুর মাথায় গিয়ে পড়ছিল। 'সেকেন্ড র‍্যাংক, ফায়ার।' অমনি আর একঝাঁক ঢিল ছুটছিল।

ক্রমে দুই দল পরস্পরের বিশ গজের মধ্যে এসে পৌঁছুল। মিশন দলের ঢিল তখন ফুরিয়ে গেছে-- তারা চায় ছড়ি নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধ করতে। কিন্তু নেপালের দল তখনো সমানভাবে ঢিল চালিয়ে যাচ্ছে! মিশন দল আর এগুতে পারছে না; তাদের দলের কয়েকজন জখম হয়ে পেছিয়ে গেল।

নেপাল যখন দেখল তার দলের ঢিল ফুরিয়ে আসছে তখন সে বাঁশীতে ফুঁ দিল—পী।

অমনি তার দল 'জয় চামুণ্ডে' বলে ছড়ি নিয়ে বিপক্ষের ঘাড়ে

লাফিয়ে পড়ল। মিশন স্কুলের ছেলেরাও এই চায়। হাতাহাতি লড়াই করতেই তারা বেশি মজবুত। তারা 'হর হর মহাদেও' বলে মহা উৎসাহে লেগে গেল।

আজ কিন্তু নেপালের দলের বুকে ভীষণ সাহস, সেনাপতির বুদ্ধির ওপর তাদের অফুরন্ত বিশ্বাস। তারা জানে আজ তারাই জয়ী হবে, তাই মহা আনন্দে তারা আক্রমণ করল। যুদ্ধে দুই পক্ষই আহত হতে লাগল; কারুর পা কেটে গেল, কারুর কপাল ফুলে উঠল; কিন্তু কুচ-কাওয়াজের এমনি গুণ যে নেপালের দলের একটি ছেলেও আজ যুদ্ধ ফেলে পালাল না।

পাঁচ মিনিট এইভাবে যুদ্ধ চলবার পর নেপালের বাঁশী বাজল— 'পীঁ—পীঁ—'

নেপালের দল তখন পিছু হটতে আরম্ভ করল। যারা সামনে ছিল

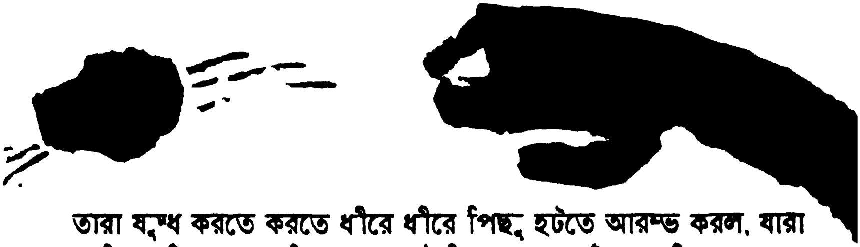

তারা যুদ্ধ করতে করতে ধীরে ধীরে পিছু হটতে আরম্ভ করল, যারা পেছিয়ে ছিল তারা নিজের কোটে ফিরে এসে দাঁড়াল। মিশন দলের ছেলেরা দেখল নেপালের দল রণে ভঙ্গ দিতে আরম্ভ করছে তখন তারা ভাবল, আর কি! মেরে দিয়েছি। যদিও তারা খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল, তবু তারা দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর কোটে ঢুকে পড়ল।

নেপালের দলের সবাই কোটে ফিরে এসেছে। শত্রু সামনে, বিশ হাত দূরে। এমন সময় আবার নেপালের বাঁশী বাজল—'পীঁ পীঁ পীঁ—'

সঙ্গে সঙ্গে নেপালের দল এক আশ্চর্য কাজ করল। হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে বালির ওপর হাত রেখে তারা হাঁটু গেড়ে বসল; আবার যখন তারা উঠে দাঁড়াল তখন তাদের প্রত্যেকের দু'হাতে দু'টি ঢিল। নেপাল হুকুম দিল, 'ফায়ার।' অমনি একঝাঁক ঢিল গিয়ে শত্রুর মাথায় পড়ল। তারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জয় চামুণ্ডে!'

মিশন স্কুলের ছেলেরা হতভম্ব হয়ে গেল; ঢিল তো সব যুদ্ধের শুরুতেই ফুরিয়ে গেছে, তবে আবার ঢিল আসে কোথা থেকে?

তারা কি করে জানবে যে কাল রাত্রে সমর-সমিতির সভ্যরা এসে বালির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হাজার হাজার ঢিল পুঁতে রেখে গেছে। আর, আজ ঠিক সেই জায়গাতেই তারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

 ব্যাপারটা যখন তারা ভাল করে বুঝতে পারল তখন তাদের বুক

দমে গেল। তবু তারা একবার প্রাণপণে চেষ্টা করল সেই জায়গাটা দখল করতে। কিন্তু কার সাধ্য সেদিকে এগোয়। ত্রিশজন ছেলে মুহূর্তে মুহূর্তে বন্দুকের ছর্‌রার মতন ঢিল বৃষ্টি করছে।

তাদের হাতের ছড়ি কোনো কাজেই লাগল না। বিশ হাত দূর থেকে ছড়ি আর কি কাজে লাগবে? এদিকে শিলাবৃষ্টির মতন ঢিল এসে পড়ছে। মিশনের ছেলেদের কারুর নাক থেঁতো হয়ে গেল, কারুর মাথা ফুলে উঠল, কেউ বা পায়ে জখম হয়ে ন্যাংচাতে আরম্ভ করল।

ক্রমে তারা যখন দেখল এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না—তখন তারা একে একে পালাতে আরম্ভ করল। নেপাল চিৎকার করে হুকুম দিল, 'জোরসে ভাই। আর একবার। ফায়ার!'

আর মিশন স্কুলের দল দাঁড়াতে পারল না; প্রথমে তাদের সেনাপতি প্রতাপ চোয়ালে এক ঢিল খেয়ে দৌড় মারল। তারপর আর সকলে যে যেদিকে পেল চম্পট দিল। নেপালের দল 'মার মার' করে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে খেদিয়ে দিয়ে এল।

স্কুলের খেলার মাঠে ফিরে এসে, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন আর সমরেশ নেপালকে কাঁধে তুলে নিল। স্কুলসুদ্ধ ছেলে একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—

'জেনারেল ন্যাপলা কী জয়! নেপোলিয়ন কী জয়!'

বীর্যশুল্কা

রাজকুমারী সুমিত্রার আর কিছুতেই বর পছন্দ হয় না। দেশ-দেশান্তর থেকে রাজারা লিপি পাঠান—রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা জানিয়ে; কিন্তু লিপি গ্রাহ্য হয় না। রাজদূত নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

সুন্দরকান্তি রাজপুত্রেরা আসেন; রাজকন্যার প্রাসাদের সম্মুখে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরাঘুরি করেন। তাঁদের কোমরে রত্নখচিত অসি ঝলমল করে, কিরীটের হীরা সূর্যকিরণে ঝকমক করে। কিন্তু কুমারী সুমিত্রার মন টলে না। তিনি সখীদের ডেকে বাতায়ন থেকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'সখি, দ্যাখ, দ্যাখ, কতগুলো মোমের পুতুল ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সূর্যের তাপে গলে যাচ্ছে না কেন এই আশ্চর্য!' এই বলে কোকিলকণ্ঠে হেসে ওঠেন। রাজপুত্রেরা তাঁর হাসি, কথা শুনতে পান। তাঁদের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

আর্যাবর্তময়—দক্ষিণে অবন্তীরাজ্য থেকে পূর্বে কাশী-কোশল পর্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে, তক্ষশীলার শক রাজকুমারী যেমন অপরূপ সুন্দরী তেমনি গর্বিতা। তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে যাঁরা তাঁকে বিয়ে করতে আসেন, তাঁর দর্পের কাছে পরাভূত হয়ে তাঁরা ফিরে যান, আর্যাবর্তের কোনও রাজা বা রাজপুত্রকে তাঁর মনে ধরে না।

সুমিত্রার বাবা রুদ্রপ্রতাপ তক্ষশীলার রাজা—রুদ্রের মতই তাঁর প্রতাপ। তিনি শক-বংশীয়। শক বংশের অনেক ক্ষত্রপ তখন ভারত-বর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। বহুকাল আর্যাবর্তে থাকার ফলে তাঁরা অনেকটা আর্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু শক-রক্তের প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। শক নারীরা তখনও তরোয়াল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে ভালবাসত, অশ্ব-চালনায় পুরুষের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করত। রাজকুমারী সুমিত্রা ছিলেন সেই জাতের মেয়ে; যেমন রূপসী তেমনি তেজস্বিনী।

রাজা রুদ্রপ্রতাপ যখন দেখলেন কোনও বরই মেয়ের পছন্দ হয় না তখন তিনি মেয়েকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর আঠারো বছর বয়স হল। তুই কি বিয়ে করবি না? স্বয়ংবর-সভা ডাকব?'

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বললেন, 'না, স্বয়ংবর-সভায় তো কেবল রাজা আর রাজপুত্রেরা আসবে। তাদের আমি দেখেছি—তারা সব ননীর পুতুল। তাদের কারুর গলায় আমি মালা দিতে পারব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বীর্যশুল্কায় যে আমাকে কিনে নিতে পারবে, তাকেই আমি বিয়ে করব—তা সে শূদ্রই হোক, আর চণ্ডালই হোক।'

শুনে রুদ্রপ্রতাপ খুশি হলেন। সেকালে শূদ্রকে কেউ এত ঘৃণা করত না,—অনেক শূদ্র রাজা বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। রুদ্রপ্রতাপ হেসে বললেন, 'আমিও তাই চাই। কিন্তু তা হবে কী করে?'

কুমারী বললেন, 'আমার প্রতিজ্ঞা এই,—যে পুরুষ তিনটি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন, আমি তাঁকেই বরমাল্য দেব। আপনি রাজ্যে এই কথা ঘোষণা করে দিন।'

'বেশ! কী কী বিষয়ে পরীক্ষা হবে?'

'বাহুবল, হৃদয়বল আর বুদ্ধিবলের পরীক্ষা হবে। আমি নিজে পরীক্ষা করব।'

রাজা মেয়ের পিঠে হাত রেখে আদর করে বললেন, 'সুমিত্রা, তুই শক-দুহিতার উপযুক্ত কথা বলেছিস। আজই আমি দেশ-বিদেশে ঢেঁড়া দিয়ে দিচ্ছি।'

রাজ্যে-রাজ্যে আবার ঘোষণা হয়ে গেল। আবার অনেক রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি, অমাত্য এলেন; কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হল। কেউ বাহুবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু বুদ্ধিবলে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না; আবার কেউ বা বুদ্ধিবলে উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু হৃদয়বলে অর্থাৎ সাহসিকতায় বিফল হলেন। সকলেই অধোবদনে ফিরে গেলেন, রাজকুমারীকে লাভ করতে পারলেন না।

এমনিভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন সকালবেলায় মন্ত্রগৃহের দ্বিতলে রাজা রুদ্রপ্রতাপের সভা বসেছে। চারিদিকে পাত্রমিত্র, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠী, সামন্ত রয়েছেন, রাজা স্বয়ং সিংহাসনে আসীন। রাজার ডানপাশে মর্মর-পদ্মাসনে কুমারী সুমিত্রা; সভা যেন তাঁর রূপের ছটায় আলোকিত হয়ে গেছে। তাঁর গর্বিত গ্রীবাভঙ্গী আর তীক্ষ্ম কটাক্ষে সভার বড়-বড় বীরের পৌরুষও যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

সভার তোরণের কাছে প্রতীহার-ভূমিতে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের গণ্ডগোল? মকরকেতু, দেখ তো!'

মকরকেতু রাজ্যের একজন সেনানী। তিনি যুবাপুরুষ—বিশাল তাঁর দেহ, তাঁর চেহারা দেখেই শত্রু ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। তিনি সভাদ্বারে গিয়ে দেখলেন, একজন দীনবেশ যুবক জোর করে সভায় প্রবেশ করতে চায়; কিন্তু চার-পাঁচজন প্রতীহারী তাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে। যুবক নিরস্ত্র, কিন্তু এমন ভয়ঙ্করভাবে সে হস্তপদ সঞ্চালন করছে যে, বর্মাবৃত শূলধারী প্রতীহারীরা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে একজনের যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? অবশেষে দ্বাররক্ষীরা তাকে মাটিতে ফেলে তার হাত বেঁধে ফেললে।

মকরকেতু রাজাকে এসে খবর দিলেন, শুনে রাজা হুকুম করলেন, 'কী চায় লোকটা? তাকে এখানে নিয়ে এস।'

 তখন দু'জন প্রতীহারী লোকটিকে নিয়ে রাজার সুমুখে হাজির

হল। রাজা তার চেহারা আর বেশভূষা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তার মাথায় উষ্ণীষ নেই, হাতে অস্ত্র নেই, পরিধানে নিখুঁত বস্ত্রও নেই—রক্ষীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে। সর্বাঙ্গে ধুলো। কিন্তু তবু, ছিন্ন বস্ত্র আর ধূলির আভরণের ভিতর দিয়েও অপরূপ সুঠাম দেহ-প্রভা প্রকাশ পাচ্ছে। দেহ রোগাও নয়, মোটাও নয়। পেশীগুলি প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে সাপের মত খেলে বেড়াচ্ছে। মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে; গায়ের রং নূতন কচি ঘাসের মত শ্যাম। মুখে একটা খামখেয়ালি বেপরোয়া ভাব।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? তোমার দেশ কোথায়?'

বন্দী একবার রাজার দিকে চাইলে, একবার রাজকন্যার দিকে চাইলে; তারপর বললে, 'আমি এ রাজ্যে আগন্তুক। আমার দেশ বঙ্গ।'

রাজা বললেন, 'বঙ্গদেশের নাম শুনেছি বটে। আর্যাবর্তের পূর্ব সীমান্তে সেই রাজ্য। শুনেছি সে দেশের লোকেরা পাখির ভাষায় কথা বলে।'

বন্দী গম্ভীরভাবে বললে, 'মহারাজ ঠিক ধরেছেন। বঙ্গদেশের লোক কোকিলের ভাষায় কথা বলে। এত মধুর ভাষা পৃথিবীতে আর নেই।'

রাজা উত্তর শুনে ভারি আশ্চর্যান্বিত হলেন, একটু খুশিও হলেন। প্রতীহারীদের বললেন, 'বাঁধন খুলে দাও।'

বন্ধন-মুক্ত হয়ে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন এই ছিন্নবেশ বিদেশী যুবার চেহারা দেখে কুমারী সুমিত্রার তীব্রোজ্জ্বল চোখদুটি ক্ষণকালের জন্য নত হয়ে পড়ল। তিনি উত্তরীয়টি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

রাজা বললেন, 'বিদেশী, তুমি বহুদূর থেকে এসেছ—তোমার বস্ত্র ছিন্ন দেখছি। তুমি কি অর্থ চাও?'

বিদেশী হাসল; বললে, 'না মহারাজ, আমি অর্থ চাই না—অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। আমি অন্য এক মহার্ঘ রত্নের সন্ধানে এ রাজ্যে এসেছি।'

বিস্মিত রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী? পরিচয় কী?'

বিদেশী বললে, 'আমার নাম চণ্ড। আমি তালীবনশ্যাম সমুদ্র মেখলা বঙ্গভূমির একজন অজ্ঞ সন্তান—এইটুকুই আমার পরিচয় বলে ধরে নিতে পারেন।'

রাজা বললেন, 'ভাল। এখন, জোর করে আমার সভায় ঢুকতে চেয়েছিলে কেন? তার কারণ বল।'

চণ্ড বললে, 'মহারাজ, আপনার রাজ্যে প্রবেশ করে শুনলাম যে কুমারী সুমিত্রা বীর্যশুল্কা হতে চান। তাই আমি নিজের বীর্যের পরীক্ষা দিয়ে তাঁকে লাভ করতে এসেছি।' বলে, পূর্ণদৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকাল।

শুনে কুমারীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মন তাঁর ক্ষণকালের জন্য বিদেশীর প্রতি কোমল হয়েছিল, আবার কঠিন হয়ে উঠল। একজন সামান্য লোক তাঁকে লাভ করবার দুরাশা রাখে! সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল যে, ভারতবর্ষের সকল রাজ্য থেকেই রাজা বা রাজপুত্র তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে—শুধু বঙ্গদেশ থেকে কেউ আসেনি। বঙ্গদেশের রাজপুত্রেরা কি এতই দর্পিত যে, নিজেরা না এসে একজন ভিক্ষুককে তাঁর পাণিপ্রার্থী করে পাঠিয়েছে? অপমানে তাঁর দু'চোখ জ্বলে উঠল।

সভাসদরাও চণ্ডের এই অদ্ভুত স্পর্ধা দেখে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সকলের সমবেত অট্টহাস্যে সভা ভরে গেল।

রাজা রুদ্রপ্রতাপ কিন্তু হাসলেন না। তিনি আরক্ত চোখে মকর-কেতুকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটাকে সভার বাইরে নিক্ষেপ কর।'

মকরকেতু সবচেয়ে বেশি জোরে হাসছিলেন, হাসির ধাক্কায় তাঁর বিরাট দেহ দুলে-দুলে উঠছিল। তিনি হাসতে-হাসতেই চণ্ডকে সভার বাইরে নিক্ষেপ করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তার গায়ে হাত দিতে-না-দিতেই এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। চণ্ড দুই হাতে মকরকেতুর কোমর ধরে তাকে মাথার ঊর্ধ্বে তুলে অবলীলাক্রমে গবাক্ষের পথে নিচে ফেলে দিয়ে রাজার সুমুখে ফিরে এসে বললে, 'মহারাজ, আপনার আজ্ঞা পালিত হয়েছে।'

সভা নির্বাক; রুদ্রপ্রতাপের মুখে কথা নেই। চণ্ড এমনভাবে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে বিশেষ কিছুই করেনি, এরকম সে রোজই করে থাকে।

সকলে ভাবছে—এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! মকরকেতুকে যে ব্যক্তি একটা তুলোর বস্তার মত তুলে ফেলে দিতে পারে,—তার গায়ে কী অসীম শক্তি! সভাসুদ্ধ লোক বিস্ফারিত চোখে চণ্ডের মুখের পানে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে সুমিত্রা কথা কইলেন; নিস্তব্ধ সভাগৃহে তাঁর কণ্ঠস্বর বীণার মত বেজে উঠল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'বিদেশী, তোমার দেশে কি রাজা নেই?'

 চণ্ড বললে, 'রাজা আছেন বৈকি রাজকুমারী; তাঁর প্রতাপে

প্রাগ্‌জ্যোতিষ থেকে কোশল পর্যন্ত কম্পমান।'

সুমিত্রা বললেন, 'বটে! তবে কি তিনি প্রবীণ?'

চণ্ড বললে, 'হ্যাঁ, তিনি প্রবীণ।'

সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর কি পুত্র নেই?'

চণ্ড মৃদু হাসল, 'আছে। শুনেছি যুবরাজ ভট্টারক পরম রসিক। তবে, তিনি পিতার মত বীর কি না বলতে পারি না!'

সুমিত্রার কণ্ঠের চাপা শ্লেষ এতক্ষণে স্ফুরিত হয়ে উঠল; তিনি তীক্ষ্ম হাসি হেসে বললেন, 'তাই বুঝি তোমাদের রসিক যুবরাজ একজন মল্লকে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন?'

চণ্ড মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। তাছাড়া আমি মল্ল নই। আমার দেশের সকলেই আমার চেয়ে বেশি বলবান, তাই আমি লজ্জায় দেশ ছেড়ে চলে এসেছি।' এই বলে কপট লজ্জায় মাথা নিচু করলে।

কুমারী সুমিত্রা অধর দংশন করলেন। এই লোকটার সঙ্গে কথাতেও পারবার জো নেই। যে ব্যক্তি এইমাত্র মহাকায় মকরকেতুকে জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিয়েছে, তার মুখে একথা পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। কুমারী অল্পকাল চিন্তা করে বললেন, 'ভাল! তুমি মল্ল হও বা না হও, ভার উত্তোলন করতে পার বটে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তিনটি পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে পারবে, তাকেই আমি বরমাল্য দেব, তা সে পামরই হোক আর চণ্ডালই হোক। কিন্তু ভার উত্তোলন করাই বাহুবলের প্রমাণ নয়, উষ্ট্রও ভার বহন করতে পারে। তুমি বাহুবলের আর কী প্রমাণ দিতে পার?'

চণ্ড বললে, 'মানুষের যা সাধ্য আমিও তাই পারি।'

'পার? বেশ, আমার এই মুঠির মধ্যে একটি মুক্তা আছে...মুঠি খুলে মুক্তাটি নিতে পার?' এই বলে সুমিত্রা মৃণালের মত ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন।

অনেক রাজপুত্রই রাজদুহিতার মুঠি খুলতে না পেরে লজ্জায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। চণ্ড তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ক্ষুব্ধস্বরে বললে,—'রাজকুমারী, এ পুরুষের উপযুক্ত পরীক্ষা নয়, আমাকে অকারণ লজ্জা দিচ্ছেন কেন?' এই বলে সে বাঁ-হাতের দুটি আঙুল দিয়ে রাজকুমারীর মুঠির দুদিক চেপে ধরলে। রাজকুমারী একবার শিউরে উঠলেন, তারপর তাঁর মুঠি আস্তে-আস্তে খুলে গেল।

মুক্তাটি হাত থেকে তুলে নিয়ে চণ্ড বললে, 'আজ থেকে এই মুক্তাটি আমার কর্ণের ভূষণ হল।'

রাজকুমারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; তিনি কিছুক্ষণ বিহ্বল চক্ষে

নিজের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'প্রথম পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছে। বাকি দুই পরীক্ষা আজ অপরাহ্নে হবে।' এই বলে তিনি দ্রুতপদে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

নিজের শয়নঘরে গিয়ে রাজকুমারী বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন লাঞ্ছনা তিনি জীবনে ভোগ করেননি। কোথাকার এক পরিচয়হীন অখ্যাত লোক এসে অবহেলাভরে বাঁ-হাতে তাঁর মুঠি খুলে দিলে! কী কঠিন তার আঙুল! যেন লোহা দিয়ে তৈরি! সেই আঙুল রাজকুমারীর মুঠি স্পর্শ করামাত্র যেন অবশ হাত আপনি খুলে গেল। কেন এমন হল? ও কি ইন্দ্রজাল জানে!

চোখ মুছে সুমিত্রা পালঙ্কে উঠে বসলেন। তাঁর লুণ্ঠিত অভিমান আহত সর্পের মত আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল। তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন—কী করে আজ বাকি দুই পরীক্ষায় চণ্ডকে পরাস্ত করবেন।

* * *

বেলা তৃতীয় প্রহরের তূর্য-দামামা বাজবামাত্র রাজা আর রাজ্যের বড় বড় প্রবীণ অমাত্যেরা রাজ-উদ্যানে সমবেত হলেন। রাজকুমারী বেণী দুলিয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে নিজের প্রাসাদ থেকে নেমে এলেন। চণ্ডও উপস্থিত হল। এখন আর তার ধূলি-ধূসর বেশ নেই, পরিধানে পট্টবস্ত্র, বুকে লোহার বর্ম, হাতে ধনুঃশর। ডান কানে সেই মুক্তাটি বেলফুলের কুঁড়ির মত দুলছে।

রাজ-উদ্যানটি প্রকাণ্ড, চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তাতে বড়-বড় ফল-ফুলের গাছ, আম্র জম্বু বকুল পিয়াল কদম্ব শোভা পাচ্ছে। মাঝে-মাঝে সরোবর। মাঝে-মাঝে বুক পর্যন্ত উঁচু স্বচ্ছ স্ফটিকের দেওয়াল বাগানের পুষ্পিত অংশকে ঘিরে রেখেছে। চারিদিকে পোষা হরিণ, শশক, ময়ূর চরে বেড়াচ্ছে।

একটি পাথরের বড় বেদীর উপর রাজা আর অমাত্যেরা আসন গ্রহণ করলেন। সুমিত্রা দু'জন সখীর সঙ্গে অদূরে আর একটি বেদীতে বসলেন। চণ্ড দাঁড়িয়ে রইল।

কুমারী একবার আয়ত উজ্জ্বল চোখ তুলে চণ্ডের দিকে চাইলেন; তারপর গ্রীবা হেলিয়ে একজন সখীকে ইঙ্গিত করলেন। সখীর হাতে একটা সোনার কলস ছিল, সে গিয়ে সেই কলসটি স্ফটিকের দেয়ালের পিছনে রেখে এল।

কুমারী তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিদেশী, তুমি তীর ছুঁড়তে জান?'

মুখ টিপে হেসে চণ্ড বললে, 'ছেলেবেলায় শিখেছিলাম—অল্প-

সল্প জানি।'

'ভাল। এবারে তোমার বুদ্ধিবলের পরীক্ষা হবে। স্ফটিক-কুণ্ডের ওপারে ঐ ঘট দেখতে পাচ্ছ? তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখান থেকে তীর দিয়ে ঐ ঘট বিদ্ধ করতে হবে। যদি পার, বুঝব তুমি কৌশলী বটে!'

রাজা এবং পারিষদেরা সকলেই অবাক হয়ে রইলেন। এ কী অদ্ভুত পরীক্ষা! এদিক থেকে ঘট বিদ্ধ করা কি সম্ভব কখনও? মাঝে পাঁচ আঙুল পুরু স্ফটিকের দেয়াল রয়েছে—সে দেয়াল ভেদ করে তীর ছোঁড়া মানুষের সাধ্য নয়।

চণ্ড বললে, 'এ কি মানুষের কাজ? এ-রকম লক্ষ্যভেদ যে দেবতাদেরও অসাধ্য!'

সুমিত্রা বিদ্রূপ-স্বরে বললেন, 'তবে কি তুমি চেষ্টার আগেই পরাভব স্বীকার করছ?'

চণ্ড বললে, 'না না তা আমি বলছি না। আমি বলছি যে, আপনি মানুষের অসাধ্য কাজ দিয়ে আমাকে দেব পদবী দান করছেন।'

রাজকুমারী তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কি তুমি পারবে বলে মনে হয়?'

চণ্ড হেসে বললে, 'পারা না পারা দৈবের অধীন। তবে, এ পরীক্ষা বঙ্গীয় ধনুর্ধরের উপযুক্ত বটে।'

চণ্ড সযত্নে ধনুকে গুণ পরালে। ঈষৎ টঙ্কার দিয়ে দেখলে গুণ ঠিক হয়েছে কি না। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে আস্তে-আস্তে ধনুকে শর সংযোগ করলে।

গাছের পাতা নড়ছে না, বাতাস স্থির। দর্শকেরাও চিত্রার্পিতের মত বসে দেখছেন। চণ্ড ধীরে-ধীরে ধনুক ঊর্ধ্বে তুললে। একবার সুবর্ণ ঘটের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর জ্যা-মুক্ত তীর আকাশের দিকে ছুটে চলল।

তীর আতসবাজির মত সোজা আকাশে উঠে, পাক খেয়ে নক্ষত্র-বেগে নিচের দিকে মুখ করে নেমে আসতে লাগল। ঠং করে একটা শব্দ হল। সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখলেন, তীরটি সোনার কলসের গায়ে বিঁধে আছে।

রাজকুমারী এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে বসে দেখছিলেন তাঁর বুক থেকে একটি কম্পিত দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে গেল। বুক দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগল—আশঙ্কায় কি আনন্দে বুঝতে পারলেন না। চণ্ডের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছিল। সে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলে, 'রাজকন্যা, আদেশ পালন করতে পেরেছি কি?'

রাজকন্যার গলা কেঁপে গেল। তিনি বললেন, 'পেরেছ।' একটু

থেমে বললেন, 'এবার শেষ পরীক্ষা।'

চণ্ড যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'এরই মধ্যে শেষ পরীক্ষা! আমার ইচ্ছা হচ্ছে সারা জীবন ধরে আপনার কাছে পরীক্ষা দিই।'

সুমিত্রার বুক আবার দুরুদুরু করে উঠল, কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন, 'শেষ পরীক্ষা এই;—আমি এই বনের মধ্যে দৌড়ে যাব। দশ গুণতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পরে তুমি আমার পশ্চাদ্ধাবন করবে। তোমার হাতে একটা তীর আর ধনুক থাকবে। তুমি যদি আমাকে স্পর্শ করতে পার, তাহলে তোমার জিত, আর আমি যদি ফিরে এসে এই বেদী স্পর্শ করতে পারি, তাহলে তোমার হার। আমার গতি রোধ করবার জন্য তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পার। কিন্তু যদি আমার অঙ্গ থেকে একবিন্দু রক্ত বার হয়, তাহলে তদ্দণ্ডেই তোমার প্রাণ যাবে।'

চণ্ড বললে, 'মানবী-মৃগয়া আমার জীবনে এই প্রথম। ভাল, তাই হোক।'

* * *

হরিণীর মত ক্ষিপ্র চঞ্চল পদে কুমারী সুমিত্রা বনের গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। দশ গণা শেষ হলে চণ্ড তীরধনুক হাতে শিকারীর মত তাঁকে অনুসরণ করলে।

চণ্ডও খুব দ্রুত দৌড়তে পারে; কিন্তু রাজকুমারীর সঙ্গে পাল্লায় সে পেছিয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে উদ্যানের গাছপালা যতই ঘন হতে আরম্ভ করল, ছায়াও তত গভীর হতে লাগল। তার ভিতর দিয়ে পলায়মান সুমিত্রার শুভ্র অঞ্চল আর উড্ডীন বেণী দেখা যেতে লাগল। কিন্তু ক্রমে আর তাও দেখা যায় না। চণ্ড বুঝলে, সুমিত্রার সঙ্গে দৌড়ে সে পারবে না। হাজার হোক, তিনি নারী—তাঁর শরীর লঘু। এদিকে চণ্ডের গায়ে লৌহ-বর্ম, এ অবস্থায় কেবল পশ্চাদ্ধাবন করে কুমারীকে ধরা অসম্ভব।

চণ্ড তখন যে-পথে রাজকুমারীর ফেরবার সম্ভাবনা সেই দিকে যেতে লাগল। ছায়ায় অস্পষ্ট বন, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে। অগণ্য গাছের শ্রেণীতে বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। সংশয়ভরা মন নিয়ে খানিকদূর যাবার পর হঠাৎ চণ্ড দেখলে, সুমিত্রা তার দিকেই ছুটে আসছেন। কিন্তু কাছাকাছি এসে সুমিত্রাও চণ্ডকে দেখতে পেলেন। উচ্চ হাস্য করে তিনি আবার বিপরীত দিকে ছুটলেন। কিন্তু চণ্ড তখন তাঁর খুব কাছে এসে পড়েছে, তার দৃষ্টি ছাড়িয়ে পালানো আর সম্ভব নয়।

তবু চণ্ড পেছিয়ে পড়তে লাগল। দশ হাতের ব্যবধান পনেরো হাতে দাঁড়াল। সুমিত্রার পা যেন মাটিতে পড়ছে না—তিনি যেন

পাখির মত শূন্যে উড়ে চলেছেন। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইছেন, আর কলকণ্ঠে হেসে আবার দৌড়চ্ছেন। ক্রমশ ব্যবধান যখন আরও বেড়ে গেল, তখন চণ্ড মনে-মনে স্থির করে নিলে—আর রাজকুমারীকে চোখের আড়াল করা চলবে না। সে দৌড়তে দৌড়তে ধনুকে শর-যোজনা করলে। তারপর শুভ মুহূর্তের জন্য সতর্ক হয়ে রইল।

এবার একটা মোটা গাছের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সুমিত্রা নিমেষের জন্যে থেমে পিছু ফিরে চাইলেন। এই সুযোগের জন্যই চণ্ড অপেক্ষা করছিল; পলকের মধ্যে তার তীর ছুটল। সুমিত্রা যখন আবার পা বাড়ালেন তখন দেখলেন, তাঁর চলার শক্তি নেই। চণ্ডের তীর তাঁর বেণী ভেদ করে গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেছে।

চণ্ড ছুটে এসে তীর উপড়ে রাজকুমারীর বেণী মুক্ত করে দিল। হাসতে-হাসতে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—তাঁর চোখে জল!

চণ্ডের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল, সে ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'দেবি, আমি এখনও আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিনি। যদি আপনি আমার মত লোকের গলায় মালা দিতে না চান,—আমি শেষ পরীক্ষায় হেরে যেতে রাজী আছি। আপনি যান—বেদী স্পর্শ করুন গিয়ে।'

সুমিত্রা নতজানু হয়ে সেইখানে বসে পড়লেন, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'প্রথম দর্শনেই আমার মন বুঝেছিল যে তুমি আমার স্বামী। শুধু অহঙ্কার আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। আর্যপুত্র, বীর্যশুল্কে তুমি আমাকে জয় করেছ, তবু স্বেচ্ছায় আমি তোমার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করছি।'

চণ্ডের মুখ হাসিতে ভরে গেল। সুমিত্রাকে ধরে তুলে সে বললে, 'সুমিত্রা!'

সুমিত্রা গলা থেকে মালা খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন; তারপর আবার নতজানু হয়ে বরকে প্রণাম করলেন।

চণ্ড হেসে বললে, 'সুমিত্রা, তুমি রাজকন্যা; দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তোমার কষ্ট হবে না?'

সুমিত্রা চোখ নিচু করে বললেন, 'তোমার মত স্বামী যার, পর্ণ-কুটীরে থেকেও সে রাজরাজেশ্বরী। আর্যপুত্র, আমাকে তোমার তালীবনশ্যাম বঙ্গদেশে নিয়ে চল।'

চণ্ড বললে, 'সুমিত্রা, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি। বলেছিলাম মনে আছে—বঙ্গদেশের রাজকুমার রসিক? আমি তোমাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করেছি। আমার সত্যিকার নাম—চন্দ্র; আমার একটি ছোট্ট বোন আছে, সে চন্দ্র উচ্চারণ করতে পারে না, চণ্ড বলে,

তাই—'

বিস্ময়-উৎফুল্ল চোখে চেয়ে সুমিত্রা বললেন, 'তুমিই তবে বঙ্গের রাজপুত্র?'

'হ্যাঁ; কিন্তু রাজপুত্র বলে তোমার মালা ফিরিয়ে নিয়ো না যেন।'

সুমিত্রা মুগ্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ চন্ডের মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, 'রাজপুত্র যে এমন হয়, তা জানতাম না!'

তারপর দু'জনে হাত-ধরাধরি করে, যেখানে রুদ্রপ্রতাপ স-পরিষদ বেদীতে ছিলেন, সেইদিকে চললেন।

গাধার কান

টাউন স্কুলের সঙ্গে মিশন স্কুলের ফুটবল ম্যাচ—কাপ ফাইনাল। শহরের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে—এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি; তাই আজকের খেলাটা যে খুব জমবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঁচটা থেকে খেলা আরম্ভ হবে, কিন্তু চারটে বাজতে-না-বাজতেই মাঠে লোক জমতে আরম্ভ করেছে। দুই স্কুলের ছেলেরা মাঠের দুইধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দু'পক্ষের খেলোয়াড়েরা এখনও মাঠে দেখা দেয়নি, তারা রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে।

খেলার মাঠ থেকে কিছু দূরে একটা বটগাছের তলায় টাউন স্কুলেব ছেলেরা তৈরি হচ্ছিল। গিরীন তাদের ক্যাপটেন; সে হাফ্-প্যাণ্টে কোমরবন্ধ বাঁধতে-বাঁধতে বললে, 'আর পনেরো মিনিট বাকি, এখনও সমরেশ ফিরল না। আজ সর্বনাশ হল দেখছি!'

টুনু টাউন স্কুলের একজন খেলোয়াড়; বয়সে সে সবচেয়ে ছোট, দেখতে অতি ক্ষীণ। সে জার্সির মধ্যে মাথা ঢোকাতে-ঢোকাতে জিজ্ঞেস করলে, 'সমরেশদা কোথায় গেছে?'

প্রণব সাজসজ্জা শেষ করে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি; সে বললে, 'সমরেশ তুক্ করতে গেছে।'

টুনু একে ছেলেমানুষ, তায় সবে এ-বছর থেকে স্কুল-টীমে স্থান পেয়েছে, সে ভেতরকার সব কথা জানত না। অবাক হয়ে বললে, 'তুক্ কিসের পানুদা?'

প্রণব বিরক্ত হয়ে বললে, 'জানিস না, খেলার আগে গাধার কান না মললে আমরা হেরে যাই।'

টুনু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ!'

'ঠাট্টা?' প্রণব চোখ পাকিয়ে বললে, 'তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করব?' বলে টুনুর কানের দিকে হাত বাড়ালে।

টুনু তাড়াতাড়ি কান সরিয়ে নিয়ে বললে, 'তবে কি সত্যি সমরেশদা গাধার কান মলতে গেছে?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি?'

'হিঃ-হিঃ-হিঃ, গাধার কান—!' টুনু হঠাৎ হেসে উঠল।

গিরীন ভুরু কুঁচকে বললে, 'হাসছিস যে! গাধার কান মলা হাসির কথা নাকি? গেল বছর গাধার কান মলে আমরা কাপ জিতেছি; তার আগের বছর গাধা পাওয়া গেল না—'

এই সময় হন্তদন্তভাবে সমরেশ এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী হল, কী হল?'

সমরেশের চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো; সে বিমর্ষভাবে বললে, 'পেলুম না। শহরে কোথাও একটি গাধা নেই। সেই বেলা একটা থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

'ঘাটে খুঁজেছিলি?'

'ঘাটে, মাঠে, ধোবার বাড়িতে—কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি। নো গাধা। আশ্চর্য, আজকের দিনেই গাধাগুলো লোপাট হয়ে গেল!'

সকলের মুখেই বিপদের ছায়া পড়ল। গিরীন বললে, 'আর কী হবে। নে সমরেশ, শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নে—আর সময় নেই।'

সমরেশ বিষণ্ণমুখে জার্সি পরতে লাগল; কারণ গাধা পাওয়া যাক আর না যাক, খেলতে তো হবেই! সমরেশ বেচারা সারা দুপুর গাধার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ গাধা খুঁজে পায়নি; তাই দুঃখটা তারই সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। বিশেষত আজ মিশন স্কুলের

সঙ্গে খেলা; মিশন স্কুলকে হারাবে বলে তারা প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু গাধার কান মলা হল না! তার মানে—মিশন স্কুলকে তারা হারাতে পারবে না। আহা! একট গাধার বাচ্চাও যদি পাওয়া যেত!

সমরেশ পায়ে অ্যাঙ্কলেট আঁটতে-আঁটতে এই কথা ভাবছিল এমন সময় তার কানে একটা 'খিক্-খিক্' শব্দ এল। সে মুখ তুলে দেখলে, টুনু দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। সমরেশ কড়া সুরে বললে, 'হাসছিস কেন রে টুনু? টুনুর সব কথাতেই হাসি—শুনলে এত রাগ হয়!'

হাসি চাপবার চেষ্টায় টুনুর চোখে জল এসে পড়েছিল, সে মুখ তুলে বললে, 'না সমরেশদা'—বলেই জোরে হেসে ফেললে,—'হিঃ-হিঃ, সমরেশদা, তুমি সারা দুপুর গাধার কান মলবার জন্য ঘুরে বেড়ালে, আর একটাও গাধা পেলে না! হিঃ-হিঃ—তুক্ করা হল না!'

সমরেশ লাফিয়ে গিয়ে টুনুর কান ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে বললে, 'হাসি! তুক্ করার নামে হাসি! ছুঁচো কোথাকার! আজ আমরা হেরে যাব, আর হাসি হচ্ছে?'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে টুনু বললে, 'কে বললে হেরে যাব?'

'বলবে আবার কে? আমরা সবাই জানি, যখন গাধা পাওয়া যায়নি'—

'কখ্খনো না—দেখে নিয়ো!—কান ছেড়ে দাও, লাগছে!'

গিরীন বললে, 'ছেড়ে দে সমর, খেলার আগে আর কিছু বলিসনি। কিন্তু যদি হেরে যাই—

এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল।

* * *

দুই পক্ষের খেলোয়াড়েরা মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। রেফারি দিব্যেন্দুবাবুকে দেখে টুনু গিরীনের কানে-কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'ও গিরীনদা, রেফারি যে দিব্যেন্দুবাবু!'

দিব্যেন্দুবাবুকে বাঁশি হাতে দেখে গিরীনও দমে গিয়েছিল, তবু সে বললে, 'তাতে কী হয়েছে?'

'দিব্যেন্দুবাবু যে জিলিপি খায়!'

'চুপ্!'

স্কুলের ছেলেরা সবাই জানত যে, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি খেতে বড় ভালবাসেন; আর ম্যাচের আগে যে-পক্ষ তাঁকে জিলিপি খাওয়ায়, তিনি সেই পক্ষকে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যাহোক, এখন তো আর উপায় নেই, মিশন স্কুলের ছেলেরা নিশ্চয় তাঁকে পেট ভরে জিলিপি খাইয়েছে। টাউন স্কুলের খেলোয়াড়গণ আরও মুষড়ে গেল।

দিব্যেন্দুবাবু টস্ করলেন। গিরীন ব্যাকে খেলে, সমরেশ খেলে হাফ-ব্যাক থেকে; আর টুনু রাইট-ইন। তাদের দলের বাকি ছেলেরাও বেশ ভাল খেলে, কিন্তু এই তিনজনের উপরেই ভরসা। টুনু ছেলেটি রোগা-পটকা, কিন্তু বল তার পায়ে পড়লে তাকে আটকানো শক্ত। দৌড়তে পারে সে ঠিক হরিণের মত!

মিশন স্কুলের দলও খুব মজবুত। তারা বেশির ভাগ বুট পরে খেলে, গায়ে জোরও বেশি; কাজেই, দুই দলের মধ্যে কারা জিতবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।

প্রথম মিনিট-দশেক মিশন স্কুল চেপে রইল—বল আর টাউন স্কুলের গোলের কাছ থেকে দূরে যায় না। গিরীন আর সমরেশ প্রাণপণে বল বের করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তবু গোল বাঁচাতে-বাঁচাতে গোল-কীপার প্রশান্ত হিমসিম খেয়ে গেল। দু'বার কর্নার হল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে গোল হল না। তারপর একবার একটু ফাঁক পেয়ে সমরেশ বল বের করে দিল। বল গিয়ে টুনুর পায়ে পড়ল।

বল পেয়ে টুনু একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলে, তারপর বল নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটল। মিশন স্কুলের হাফ-ব্যাকেরা সব এগিয়ে গিয়েছিল, কাজেই ব্যাক আর গোল-কীপার ছাড়া আর কোনও বাধা নেই।

ব্যাক-এরিয়ার মধ্যে পেঁছিতেই একজন ব্যাক তেড়ে এল; টুনু বলটি টুক্ করে সেণ্টার-ফরোয়ার্ড রণজিতের পায়ের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে এগিয়ে এল। তখন দ্বিতীয় ব্যাক রণজিতকে চার্জ করলে রণজিত আবার বলটি টুনুর পায়ে এগিয়ে দিলে। সামনে আর ব্যাক কেউ নেই, শুধু গোল-কীপার। টুনু বল নিয়ে তীরের মত গোলের পানে দৌড়ল।

কিন্তু বল গোলে শুট করবার আগেই ব্যাক দু'জন পিছন থেকে দুটো দৈত্যের মত হুড়মুড় করে টুনুর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। একজন মারলে টুনুর পায়ে বুটসুদ্ধ এক লাথি। টুনু তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল; অমনি দ্বিতীয় ব্যাক বল কিক করে বের করে দিলে।

দিব্যেন্দুবাবুর বাঁশি বাজল। টুনু গড়াতে-গড়াতে উঠে বসে ভাবলে, নিশ্চয় দিব্যেন্দুবাবু ফাউল দিয়েছেন। পেনাল্টি!

কিন্তু হায়, দিব্যেন্দুবাবু পেনাল্টি দিলেন না; উল্টে টাউন-স্কুলের বিরুদ্ধে অফসাইড দিলেন। রণজিত নাকি অফসাইডে ছিল।

আবার খেলা চলতে লাগল। টুনুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে বিষম লেগেছিল, সে ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে গিয়ে গিরীনকে বললে,

'দেখলে গিরীনদা, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি—'

গিরীন বললে, 'এখন ওসব কথা নয়, নিজের জায়গায় যা। দিব্যেন্দুবাবু যা খুশি করুন, আজ তোকে গোল দিতে হবে মনে থাকে যেন।'

ছলছল চোখে টুনু বললে, 'কিন্তু আমার বুড়ো-আঙুলটা ভেঙে গেছে যে—'

গিরীন বললে, 'তা যাক। কিন্তু গোল দেওয়া চাই-ই।'

টুনু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। খেলা তখন বেশ জোর চলেছে; একবার এ-দল গোলের কাছে বল নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও-দল নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে হাফ-টাইমের সময় এগিয়ে আসতে লাগল; আর পাঁচ মিনিট বাকি। টুনু আরো দু'একবার বল পেলে; কিন্তু বেচারার পা বেজায় ব্যথা করছিল। সে বেশি দৌড়তে পারলে না। বল আর-একজনকে পাস করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ মিশন স্কুল একটা গোল দিল। তাদের পাঁচজন ফরোয়ার্ড একসঙ্গে বল নিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে গেল, কেউ তাদের আটকাতে পারলে না।

আবার খেলা আরম্ভ হল। একটা গোল দিয়ে মিশন স্কুলের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, তারা দুর্দান্তভাবে খেলতে লাগল। আবার গোল হয়-হয়।

কিন্তু আর গোল হবার আগেই হাফ টাইমের বাঁশি বাজল।

* * *

হাফ-টাইম হলে গিরীন এসে বললে, 'টুনু, তোর পায়ে কী হয়েছে দেখি?'

খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানেই গোল হয়ে বসেছিল। কেউ বরফ খাচ্ছিল, কেউ লেবু চুষছিল; টুনু আঙুলে বরফ চেপে বসেছিল, আস্তে-আস্তে পা বার করে দিলে।

'কই, কী হয়েছে?' বলে গিরীন আঙুল ধরে টান দিলে।

'উঃ-উঃ—ছেড়ে দাও গিরীনদা, বড্ড লাগছে—আঙুলের মাথাটা একেবারে মটকে গেছে!'

'ও কিছু নয়—এই দ্যাখ্ আমার কী হয়েছে!'

টুনু দেখলে, গিরীনের হাঁটুর নিচেই ঠিক কথ্‌বেলের মত ফুলে উঠেছে। সে বললে, 'উঃ, খুব ব্যথা করছে!'

'দূর! খেলার সময় কি ওসব মনে থাকে!' তারপর টুনুর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গিরীন বললে, 'টুনু, আজ তুই-ই ভরসা। একটা গোলে হেরে আছি, সে কিছুই নয়; তুই যদি চেষ্টা

করিস তাহলে তিনটে গোল দিতে পারিস।'

টুনুর বুক ফুলে উঠল, সে বললে, 'পারব! কিন্তু পায়ের ব্যথায় যে দৌড়তে পারছি না—'

'পায়ের ব্যথা ভুলে যা—শুধু মনে রাখ, আজ আমাদের জিততেই হবে।'

উৎসাহে ও উত্তেজনায় টুনুর গলা কেঁপে গেল, সে শুধু বললে, 'আচ্ছা—'

*   *   *

হাফ-টাইমের পর আবার খেলা আরম্ভ হল।

এবার খেলা শুরু হতে-না-হতেই টুনুর কাছে বল গেল। পায়ের ব্যথা ভুলে টুনু বল নিয়ে দৌড়ল। এবার তার প্রতিজ্ঞা সে গোল দেবেই। দু'জন হাফ-ব্যাক টুনুকে আক্রমণ করলে; টুনু তাদের পাশ কাটিয়ে বল নিয়ে আবার দৌড়ল।

সামনে দু'জন হুমদো ব্যাক। টুনু কী করে, ব্যাক দু'জনের মাথার উপর দিয়ে বল তুলে দিয়ে আবার ছুটল। বলটা পড়েছিল ঠিক গোল-কীপার আর টুনুর মাঝামাঝি; দু'জনেই বল ধরবার জন্যে ছুটে গেল। দু'জনের মধ্যে লাগল ভীষণ ঠোকাঠুকি। টুনু বেচারি উল্টে পড়ে গেল!

বলটা কিন্তু গড়াতে-গড়াতে গিয়ে গোলে ঢুকল।

'গোল! গোল!' দর্শকদের এক অংশ বিরাট চিৎকার করে উঠল; অন্য অংশ চুপ করে রইল। কিন্তু এবার আর অফসাইড বলবার জো নেই, টুনু একলা গোল দিয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু গোল দিলেন।

টুনু এই ফাঁকে গিরীনকে বলে এল, 'গিরীনদা, আঙুল ঠিক হয়ে গেছে!'

গিরীন তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'সে কী রে, কী করে ঠিক হল?'

'ঐ যে গোল-কীপারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল; ব্যাস, ঠিক হয়ে গেছে।'

এবার ঝড়ের মত খেলা আরম্ভ হল। মিশন স্কুলের ছেলেরাও ভাল খেলোয়াড়, তারা প্রাণপণে খেলতে লাগল। তাদের একটা দোষ, হারবার উপক্রম হলেই তারা মারামারি করে খেলতে আরম্ভ করে। কিন্তু মারামারি করে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না; কারণ টাউন স্কুলের ছেলেরা এমনভাবে খেলে যে, গায়ে গা ঠেকে না-- তাদের মারতে গেলে তারা পিছলে বেরিয়ে যায়। ফলে যারা মারতে যায় তাদেরই অসুবিধা হয় বেশি;—মারতেও পারে না, অথচ খেলা খারাপ হয়ে যায়।

টুনু এবার অদ্ভুত খেলা খেলতে আরম্ভ করলে। তাকে পাঁচজন লোক ঘিরে থাকে, তবু আটকাতে পারে না। একে তার ছোট্ট শরীর, তার উপর তীরের মত ছুটতে পারে। তাই তাকে আটকাতে গেলেই সে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যায়। তার খেলা দেখে মিশন স্কুলের ছেলেরা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! এইটুকু ছেলে—তার এ কী আশ্চর্য খেলা!

দেখতে-দেখতে টুনু আর একবার বল নিয়ে দৌড়ল। এবার ব্যাক দু'জন এমনভাবে তার সামনে দাঁড়ালো যে, একজনকে কাটিয়ে বেরুতে গেলেই আর একজনের সামনে পড়তে হয়। টুনু বলটি চট্ করে রণজিতকে পাস করে দিলে। রণজিতের দিকে কারুর নজর ছিল না, সবাই টুনুকে নিয়ে ব্যস্ত। রণজিৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গোলের কোণ ঘেঁষে বল মারলে। গোল-কীপার শুয়ে পড়ে বল ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ধরতে পারলে না।

শব্দ উঠল,—'গোল! গোল!'

দ্বিতীয় গোলের পর মিশন স্কুল একেবারে দমে গেল। গোল খেয়ে যারা দমে যায় তারা আর জিততে পারে না। তাদেরও হল তাই। টুনু তখন আরও দুটো গোল ঠুকে দিলে।

খেলা যখন শেষ হল তখন টাউন স্কুল দিয়েছে চার গোল, আর মিশন স্কুল মোটে এক গোল।

* * *

খেলার পর ছেলেরা এক জায়গায় জটলা করছিল। হঠাৎ শানু বলে উঠল, 'আচ্ছা, আজ আমরা জিতলুম কী করে? গাধার কান মলা তো হয়নি!'

সকলে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। সত্যিই তো! এ-রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে?

সমরেশ হঠাৎ জোরে হেসে উঠল, বললে, 'বুঝেছি!'

সকলে বলে উঠল, 'কী! কী!'

সমরেশ বললে, 'মনে নেই! খেলার আগে টুনুর কান মলে দিয়েছিলুম! তাতেই গাধার কান মলার ফল হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল। শানু বললে, 'বেশ হয়েছে। এবার থেকে টুনুর কান মলে খেলতে নামলেই চলবে। আর গাধা খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

গিরীন হাসতে-হাসতে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'সে আসছে বছর দেখা যাবে। আজ টুনুই আমাদের হীরো!' এই বলে টুনুকে দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'বল, থ্রি চিয়ার্স ফর টুনু! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!'

স্বামী চপেটানন্দ

নেপালচন্দ্র—ওরফে জেনারেল ন্যাপলার সঙ্গে বোধহয় তোমাদের পরিচয় আছে। একবার সে বুদ্ধি খাটিয়ে মিশন স্কুলের গুন্ডা ছেলে-দের কেমন জব্দ করেছিল, সে গল্প হয়তো পড়ে থাকবে।

নেপাল ছেলেটি দেখতে রোগা-পটকা বটে, আর বয়সও খুব কম, —কিন্তু তার মাথায় এতরকম বুদ্ধি আসে যে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাংলার মাস্টার বলাইবাবু তাব মাথায় গাঁট্টা মেরে ভারি বিপদে পড়েছিলেন, সেই থেকে কোন মাস্টার তার গায়ে হাত তুলতেন না।

নেপাল পড়াশুনায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষার সময় কার না ভয় হয়? বিশেষত বলাইবাবু ওৎ পেতে আছেন, একটু সুবিধা পেলেই তাকে ফেল করিয়ে দেবেন।

বলাইবাবুর ভয়ে নেপাল ভীষণ মনোযোগ দিয়ে বাংলা পড়ছে; কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই—কি জানি কী হয়!

সেদিন বাংলার পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠেই নেপাল সজোরে পড়া মুখস্থ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু সুধা এসে হাজির।

সুধা বললে, 'কিরে, আজও পড়া মুখস্থ করছিস?'

নেপাল বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আজ যে বাংলা পরীক্ষা।'

সুধা বললে, 'বাংলা পরীক্ষায় এত ভয় কিসের? তার চেয়ে চল, কালীতলায় এক নতুন সাধু এসেছেন, তাঁকে দেখে আসি।'

সাধু দেখবার মত মনের অবস্থা নেপালের ছিল না, সে বললে, 'না ভাই, আজ বলাইবাবু এগজামিনার, আজ যদি একটা ভুল করি তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।'

সুধার নিজের সাধু দেখবার খুব ইচ্ছা; অথচ একলা যেতেও কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। তাই সে সাধুর বর্ণনা আরম্ভ করলে: বললে—'কিন্তু আশ্চর্য সাধু, ভাই! তাঁর নাম স্বামী চপেটানন্দ, ভক্তেরা তাঁকে 'চড়ুবাবাজী' বলে ডাকে। তিনি নাকি যাকে একটি চড় মারেন তার কার্যসিদ্ধি হবেই।'

নেপাল অবাক হয়ে বললে, 'যাঃ! তা কখনো হয়?'

সুধা বললে, 'হ্যাঁ রে, তাঁর চড়ের নাকি অদ্ভুত গুণ। সমরেশদার ছোটভাই ক্যাবলার ইয়া বড় পিলে হয়েছিল; চড়ুবাবাজী তাকে একটি চড় মারলেন—ব্যস, পিলে অমনি ভাল হয়ে গেছে!'

'অ্যাঁ! বলিস কী?'

'হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর ভাল সাধু—যে যা মানস করে যায়, তার তা সিদ্ধ হবেই। স্বামীজীর চড়ের এমনি মহিমা!'

নেপালের মাথায় অমনি বুদ্ধি গজালো। সে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'আচ্ছা—মনে কর, তিনি যদি আমাকে একটা চড় মারেন তাহলে আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারব?'

সুধা ভারি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই পারবি। বলাইবাবু তোকে কিছুতেই ফেল করাতে পারবেন না। তাই চল্ নেপাল, চড়ু-বাবাজীর কাছে একটা চড় খেয়ে আসবি—ব্যস্, কেল্লা ফতে! পড়তেও হবে না কিছুই, ড্যাং-ড্যাং করে পাস হয়ে যাবি। আমিও চড় খাব, যা থাকে বরাতে। হিস্ট্রিটা ভাল লিখতে পারিনি—তারিখগুলো আমার একদম মনে থাকে না। চল্, আর দেরি নয়।'

নেপাল আর লোভ সামলাতে পারলে না। দুই বন্ধু তখন বার হল।

গঙ্গার ধারে কালীতলা। সেখানে প্রকাণ্ড অশথ্ গাছের নিচে বাঘের চামড়ার উপর চপেটানন্দ স্বামী বসে আছেন। তখনও ভক্তেবা কেউ এসে জোটেনি।

সুধা আর নেপাল ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলে। বাবাজীব চেহারাটি চিম্‌ড়ে, মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ আছে: চোখদুটি করমচার মত লাল। তাঁকে দেখে ভারি তিরিক্ষি মেজাজের লোক বলে মনে হয়। তিনি আবার কথা কন না। সব সময় মৌনী হয়ে থাকেন। সুধা আর নেপালকে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

চড়ুবাবাজীর রুক্ষ চেহারা দেখে নেপালের খুব ভরসা হল; সে ভাবল—নিশ্চয় ইনি খুব তেজী সন্ন্যাসী—এ'র চড় কখনও বিফল হবে না। হাত জোড় করে সে বললে—'চড়ুবাবা, আজ আমার বাংলার পরীক্ষা। প্রিপারেশন ভালই করেছি, তবু ভয় হচ্ছে বলাইবাবু আমাকে গোল্লা খাওয়াবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে আমাকে একটি চড় মারেন তো বড় ভাল হয়।—বেশি জোরে মারবেন না প্রভু, আস্তে মারলেই কাজ হবে—'

কিন্তু চড়ু মহারাজ তা শুনবেন কেন! তিনি নেপালের গালে একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলেন। নেপাল একে দুর্বল, তার উপব হঠাৎ এত বড় চড় আশাই করেনি; সে একেবারে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। চপেটানন্দ স্বামী চড় মেরেই আবার গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

গালে হাত বুলোতে-বুলোতে নেপাল উঠে বসল। তার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কাউকে কিছু বলবার নেই, সে নিজেই তো চড় খেতে চেয়েছে। সুধা তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—'চলে আয়, চলে আয় নেপাল, তোর কাজ হয়ে গেছে। এবার নিশ্চয় পাস করবি।'

সুধা নিজে আর চড় খেলে না। বাবাজীর চড়ের বহর দেখেই তার পিলে চমকে গিয়েছিল। সে মনে-মনে ভাবলে—কী হবে চড় খেয়ে? হিস্ট্রি পরীক্ষা তো হয়েই গেছে—এখন চড় খেলে হয়তো কোনও ফলই হবে না, তার চেয়ে নেপাল চড় খেয়েছে এই ভাল হয়েছে।

* * *

ভাল কিন্তু মোটেই হয়নি। নেপাল সেদিন বাংলা পরীক্ষা দিলে বটে, কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল বলেই হোক, অথবা যে-কারণেই হোক, বেচারা পাস করতে পারলে না। বলাইবাবু তাকে অনেক গোল্লা দিলেন। ফলে, সে একশোর মধ্যে মোটে বারো নম্বর

পেলে।

এদিকে, কী করে জানি না, স্বামী চপেটানন্দের কাছে চড় খাওয়ার খবরটা ক্রমে স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই নেপালকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে, 'কি রে, চড় খেলি তবু পাস করতে পারলি না!'

কেউ বললে, 'আর একটা চড় খেয়ে আয়, তাহলে তোর মাথায় বুদ্ধি গজাবে।'

গিরীন বললে, 'ন্যাপলা, আমি একটা হনুমান পুষেছি, তুই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোর বুদ্ধি বাড়বে।'

এতদিন বুদ্ধির জন্য সবাই নেপালকে মনে-মনে ভয় করত; তাই এখন তাকে বোকা বলবার সুযোগ পেয়ে সকলেই মনের আনন্দে তাকে খেপাতে শুরু করলে।

নেপালের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়; সে ভারি মুষড়ে পড়ল। চড়ুবাবাজী যে একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি সত্যিকার সাধুই হবে, তবে সে ফেল করলে কেন?

কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধার সঙ্গে খেলার মাঠে নেপালের দেখা হয়। নেপাল মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুধা অনেক খোশামোদ করে তার সঙ্গে ভাব করলে। নেপাল বললে, 'তুইই যত নষ্টের গোড়া।'

অনুতপ্ত সুধা বললে, 'আমি তো ভাই জানতুম না। তা—এখন আর রাগ করে লাভ কী বল? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার চেয়ে আয় ঐ ভণ্ড বাবাজীটাকে জব্দ করি।'

চড়ুবাবাজীকে জব্দ করবার মতলব নেপালের মাথায় ক'দিন থেকেই ঘুরছিল, কিন্তু সে কোনও উপায় ঠিক করতে পারছিল না। দুই বন্ধুতে এখন মাঠে বসে অনেক পরামর্শ করলে। কিন্তু একটিও মনের মতন ফন্দি মাথায় এল না। নেপাল তখন বুকে ঘাড় গুঁজে ভাবতে শুরু কবলে।

আধ ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'হয়েছে, এবার বাবাজীকে চড় মারার মজা টের পাইয়ে দেব, হুঁ হুঁ—মহাবীর!'

সুধা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মহাবীর কী?'

নেপাল বললে, 'গিরীনদার মহাবীর। এখন চল, কাল সকালে সব ঠিক হবে। গিরীনদাকেও দলে নিতে হবে।'

* * *

পরদিন সকালবেলা স্বামী চপেটানন্দ তাঁর বাঘের চামড়ার উপব শুয়ে ছিলেন আর দু'জন ভক্ত তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় গিরীন, সুধা আর নেপাল গুটি-গুটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত।

গিরীনের কোলে একটি সাত-আট বছরের ছেলে কিংবা মেয়ে—আগাগোড়া র‍্যাপারে ঢাকা। দেখে মনে হয়, বুঝি তার ভারি অসুখ করেছে, তাই তাকে চড়ুবাবাজীর চড় খাওয়ার জন্য আনা হয়েছে। এরকম রোগী বাবাজীর কাছে রোজই দু'-চার জন আসে।

তিনজন স্বামীজীকে দণ্ডবৎ করলে। একজন ভক্ত গিরীনের কোলের র‍্যাপার-ঢাকা মূর্তিটি দেখিয়ে বললে, 'ওর কী হয়েছে?'

নেপাল বিনীতস্বরে বললে, 'ওর বড় অসুখ; তাই বাবাজীর কাছে নিয়ে এসেছি। উনি যদি দয়া করে ওকে ভাল করে দেন।'

ভক্ত বললে, 'তা ভাল করে দেবেন। ওর কী রোগ হয়েছে?'

নেপাল বললে, 'তা তো জানি না; কিন্তু ও কথা বলতে পারে না। এখন বাবাজী যদি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দেন তো বড় ভাল হয়। আমরা পাঁচ টাকা মানত করেছি। বাবাজীর পায়ে প্রণামী দেব যদি একে ভাল করে দিতে পারেন।'

প্রণামীর কথা শুনে চপেটানন্দ উঠে বসলেন। ভক্ত বললেন, 'এই! এ আর বেশি কথা কী? প্রভু চড় মেরে-মেরে অনেক বড় বড় রোগ ভাল করেছেন। ওকে কাছে নিয়ে এস।'

নেপাল বললে, 'কিন্তু ও বড় রাগী—আর, কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না।'

ভক্ত বললে, 'তাতে ক্ষতি নেই। বাবার চড় খেলেই সব রোগ সেরে যাবে।'

'কথা কইতে পারবে তো?

'খুব পারবে। দু'দিনের মধ্যেই মুখে খৈ ফুটবে।'

গিরীন তখন কোলের রোগীটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর চপেটানন্দ স্বামী মারলেন তার গাল লক্ষ্য করে এক প্রকাণ্ড চড়।

অমনি—হুলুস্থুল কাণ্ড!

চড় খেয়ে র‍্যাপারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—রোগী নয়, প্রকাণ্ড একটা গোদা হনুমান। সে হচ্ছে গিরীনের পোষা হনুমান, তার নাম মহাবীর। মহাবীর ভয়ানক রাগী, গিরীন ছাড়া আর কারুর শাসন মানে না। সে একেবারে চড়ুবাবাজীর ঘাড়ে উপর লাফিয়ে পড়ল। ভক্ত দু'জন 'বাবাগো' বলে টেনে দৌড় মারলে।

চড়ুবাবাজীর সঙ্গে মহাবীরের রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। মহাবীরের গায়ে ভীষণ জোর, সে বাবাজীর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বাবাজীর আর মৌনব্রত রইল না, তিনি—'খেলে রে! গেলুম রে! বাবা রে!' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

মহাবীর কিন্তু ছাড়ে না। সে একে হনুমান, তার উপর চড় খেয়ে বেজায় চটে গিয়েছিল। চিমড়ে চড়ুমহারাজ তাকে সামলাবেন

কী করে! সে আঁচড়ে-কামড়ে দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়ে—বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় করে তুললে।

নেপাল, গিরীন আর সুধা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আরও অনেক লোক জুটে গেল। নেপাল মাঝে-মাঝে বলতে লাগল, 'প্রভু, মহাবীরের মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না!'

প্রভুর তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। তিনি আর কী করেন, শেষে দৌড় দিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। মহাবীর তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

চপেটানন্দ স্বামী সেই যে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে পালালেন, আর ফিরে এলেন না। তিনি যে সত্যিকার সাধু নন, একজন ভণ্ড তপস্বী, তা শহরের লোকেও ক্রমে বুঝতে পারলে। কারণ দেখা গেল, তিনি যাদের চড় মেরেছিলেন তারা কেউ সিদ্ধিলাভ করেনি।

ফেল হওয়ার দুঃখ নেপালের একেবারে যায়নি বটে, কিন্তু সে যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে আছে। স্কুলের ছেলেরা আর তাকে কেউ ঠাট্টা করে না।

আঙুর-পরী ডালিম-পরী

এক রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য। হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে সোনা-দানা হীরা-মুক্তার ছড়াছড়ি। রাজার প্রতাপে রাজ্য গমগম। রাজ্যটি কিন্তু রাজার নিজের নয়; অপর এক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন—পুরনো রাজা-রানীকে

কেটে, তাঁদের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করছেন।

চাঁপার কলির মত পুরনো রাজার দুটি কচি মেয়ে ছিল; নতুন রাজা এক ডাইনী-বুড়ীর হাতে তাদের দিয়ে বলেছিলেন, 'বনের মধ্যে এদের পুঁতে রেখে আয়।'

রাজ্যের সীমানায় মায়া-বন। ডাইনী-বুড়ী চাঁপার কলির মত মেয়ে দুটিকে নিয়ে সেই যে মায়া-বনে ঢুকেছিল, আর ফিরে আসেনি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। পুরনো রাজা-রানী আর রাজকন্যাদের কথা কারো মনে নেই। নতুন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর দুই ছেলে বড় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নাম—বড় কুমার আর ছোট কুমার। সোনার কার্তিকের মত তাঁদের চেহারা; ফুলের মত তাঁদের মন। রাজা-রানী তাঁদের দেখেন—আর চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজা ভাবেন, আহা, পুরনো রাজার মেয়ে দুটি যদি থাকতো, এদের সঙ্গে বিয়ে দিতুম। রাজার মনে দুঃখ হয়।

রানী ভাবেন, আহা, অন্য কোনো রাজা এসে যদি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে আমার সোনার চাঁদ ছেলে দুটিকে বনে পুঁতে রেখে আসে! আতঙ্কে তাঁর গা কাঁপে।

রাজা-রানী কারো মনে সুখ নেই।

একদিন রাজা একলা মায়া-বনে মৃগয়া করতে গেলেন। প্রকাণ্ড বন: গাছে লতায় আলো-ছায়ায় জড়াজড়ি। হাতী শুঁড় দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়: হরিণ শিংয়ের বাহার নিয়ে ছুটোছুটি করে; আরো কত জন্তু জানোয়ার বনে থাকে। কিন্তু সেদিন রাজা ঘোড়ায় চড়ে শিকার খুঁজে বেড়ালেন, মায়া বনের হরিণ চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল, মারতে পারলেন না; মায়া বনের ময়ূর পেখমের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, রাজা ধরতে পারলেন না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাজা শেষে এক লতার ঝোপের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। পিপাসায় তাঁর বুক শুকিয়ে গেছে—কিন্তু জল কোথায়? ক্ষুধায় নাড়ী চুঁইয়ে গেছে কিন্তু কি খাবেন? রাজার ক্লান্ত হাত থেকে বল্লম খসে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা এদিক ওদিক চাইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, একটি আঙুরের লতা একটি ডালিম গাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। আঙুর-লতায় এক থোলো পাকা আঙুর ঝুলছে, আর ডালিম ফলে আছে একটা।

রাজা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; লতা থেকে আঙুর পেড়ে খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণা নিবারণ হল ক্ষুধাও মিটল। তারপর ডালিম ফলটি পেড়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে রাজা রাজপুরীতে ফিরে চললেন।

সন্ধ্যেবেলা রাজা প[illegible] রাজার হাতে মায়া

বনের রাঙা টুক্‌টুকে ডালিম দেখে রানী বললেন, 'ওমা! অত সুন্দর ডালিম কোথায় পেলে?'

রাজা বললেন, 'তোমার জন্যে বন থেকে এনেছি।'

রানী ভারি খুশি হয়ে ডালিমটি ভেঙে খেলেন।

দিন কাটতে লাগল। ক্রমে রাজার শরীর খারাপ; রানীর শরীরে বল নেই। কবিরাজ এলেন। কিন্তু রাজা-রানীর কি রোগ হয়েছে কেউ বলতে পারে না। রাজা ও রানী রাত্রিবেলা অকাতরে ঘুমোন, কিন্তু দিনের বেলা তাঁদের শরীরে স্বস্তি নেই। কি যেন তাঁদের শরীরের মধ্যে বসে গুম্‌রে-গুম্‌রে কেঁদে বলে, 'মুক্তি দাও। কেন আমাদের বন থেকে ধরে নিয়ে এলে!'

রাজা-রানীর আহার নেই; দিন-দিন তাঁরা শুকিয়ে যেতে লাগলেন। রাজ্যময় সবার দুশ্চিন্তা, রাজা-রানী বুঝি আর বাঁচবেন না।

রাজা বললেন, 'রানি, কোন্‌ পাপে আমাদের এমন হলো?'

রানী বললেন, 'মনে নেই? পরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে—পরের মেয়ে দুটিকে বনে পুঁততে পাঠিয়েছিলে? সেই পাপে আমাদের এই দশা! কিন্তু আমরা মরি সে ভালো, আমাদের ছেলেরা যেন সুখে থাকে!'

ক্রমে রাজা-রানীর অবস্থা যায়-যায়; বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। তাই দেখে রাজকুমারদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ছোট কুমার বললেন, 'দাদা, মা-বাবা তো চললেন। এসো, দুজনে বাপ-মায়ের সেবা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, এসো, তাই করি। প্রাণ দিয়েও যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি, তাও করবো।'

দুই কুমার প্রাণপণে রাজা-রানীর সেবা করেন! রাত্রে রাজা-রানী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোন, দুই ভাই জেগে পাহারা দেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, রাজপুরী নিশুতি হয়ে আসে। রাজকুমারদের চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে; তাঁরা পালঙ্কের শিথানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনিভাবে রাত কাটে। দুপুর রাত্রে রাজার ঘরে কী ঘটে কেউ জানতে পারে না। হঠাৎ একদিন নিঝুম রাত্রে রাজকুমারদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা চোখ মেলে দেখেন—ঘুমন্ত রাজার নাক থেকে বেরিয়ে এল সবুজ রঙের একটি ছোট্ট পরী; আর রানীর নাক থেকে বেরিয়ে এল ডালিম-ফুলের মত রাঙা একরত্তি একটি পরী। রাজপুত্রেরা মিটমিট চেয়ে দেখলেন, ছোট্ট পরী দুটি মেঝেয় নেমে খেলা করতে লাগল...হাত ধরাধরি করে মনের আনন্দে নাচতে লাগল। দুই রাজকুমার তখন চুপি-চুপি উঠে পরীদের ধরে ফেললেন; তারা আর পালাতে পারল না।

বড় রাজকুমার বললেন, 'তোমরা কে?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি আঙুর-পরী।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি ডালিম-পরী।'

ছোট কুমার বললেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি রাজার পেটের মধ্যে থাকি।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি রানীর পেটের মধ্যে থাকি। আমরা দুই বোন। দিনের বেলা রাজা-রানী জেগে থাকেন তাই বেরুতে পারি না: রাত্রে তাঁরা ঘুমোলে, দু'জনে বেরিয়ে খেলা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'বুঝেছি। তোমাদের জন্যেই মা-বাবার অসুখ। তোমাদের মেরে ফেলবো।'

আঙুর-পরী আর ডালিম-পরী তখন কাঁদতে লাগল: বললে, 'আমাদের মেরো না; আমরা কোনো দোষ করিনি। মায়া-বনে আমরা আঙুর আর ডালিম হয়ে ফলেছিলুম। বাতাস এসে আমাদের দোলা দিতো—আমরা মনের সুখে খেলা করতুম। রাত্রে লতায়-পাতায় জড়া-জড়ি করে ঘুমিয়ে থাক্‌তুম। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে আঙুর পেড়ে খেলেন আর ডালিমটি রানীর জন্যে নিয়ে এলেন। সেই থেকে আমরা তাঁদের পেটের মধ্যে আছি।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়?'

দুই কুমার গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তারপর ছোট কুমার বললেন, 'চলো দাদা, ওদের চুপি-চুপি মায়া-বনে রেখে আসি।'

বড় কুমার বললেন, 'সেই ভালো।'

দুই রাজপুত্র তখনি ঘোড়ায় চড়ে বেরুলেন। বড় কুমার আঙুর-পরীকে নিজের পাগড়ীর মধ্যে বেঁধে নিলেন, ছোট কুমার ডালিম-পরীকে কোমরবন্ধে লুকিয়ে নিলেন। মায়া-বন অনেক দূর; যেতে যেতে সকাল হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে রাজা-রানী দেখেন, রাজকুমারেরা নেই, ঘোড়ায় চড়ে মায়া-বনে চলে গেছেন। তাঁরা ভাবলেন, কুমারেরা তাঁদের পাপের কথা জানতে পেরেছেন, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। রাজা বুক চাপড়াতে লাগলেন; রানী কপালে কঙ্কণ মারলেন। রাজ্যে কারো প্রাণে সুখ রইল না; রাজকুমারদের সকলেই ভালবাসতেন, দুঃখে শোকে সকলে হায়-হায় করতে লাগলেন।

এদিকে দুই রাজপুত্র মায়া-বনে গিয়ে পৌঁছুলেন। কিন্তু কোথায় ডালিম-গাছ? কোথায় আঙুর-লতা? খুঁজতে-খুঁজতে তাঁরা সেই

জায়গায় গেলেন। দেখলেন, ডালিম-গাছ, আঙুর-লতা কিছুই নেই; বনের হাতী আঙুর-লতা উপড়ে ফেলে দিয়েছে, বনের শজারু ডালিম-গাছের শিকড় খেয়ে গেছে। চারিদিক শূন্য: কেউ কোথাও নেই! একটা ফড়িং কি ভোমরা পর্যন্ত নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করেন?

এদিকে-ওদিকে চাইতে-চাইতে ছোট কুমার দেখলেন, তুঁত-গাছের ডালে রেশমের একটি গুটি ঝুলছে। তিনি গুটির কাছে গিয়ে বললেন, 'গুটিপোকা, গুটিপোকা, বলতে পারো, আঙুর-লতা কোথায়? ডালিম-গাছ কোথায়?'

গুটির ভেতর থেকে পোকা বললে, 'আঙুর-লতা নেই, ডালিম-গাছ নেই, হাতীতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, শজারু গোড়া খেয়ে গেছে।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়? আঙুর-পরী ডালিম-পরীকে তাহলে রাখি কোথায়?'

রাজকুমারদের ভারি ভাবনা হল। কোথায় রাখেন পরীদের? বনে ছেড়ে দিলে হয়তো ইঁদুরে-বাঁদরে তাড়া করবে নয়তো চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তখন কি হবে? রাজকুমারদের বড় দয়া হল। আহা, ছোট্ট পরী দুটিকে কী করে এই বনে ফেলে যাবেন!

তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

তখন গুটিপোকা বললে, 'রাজকুমার, আমি তোমাদের চিনি; পরী-দেরও চিনি। আমারই পাপে ওরা একরত্তি পরী হয়ে বনে লুকিয়ে-ছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

রাজকুমারেরা অবাক্ হয়ে বললেন, 'তুমি কে?'

গুটিপোকা বললে, 'আমি ডাইনী-বুড়ী। তোমাদের বাবার হুকুমে আমি পুরনো রাজার দুই মেয়েকে এনে মাটিতে পুঁতেছিলুম; তাই আমি গুটিপোকা হয়ে নিজের জালে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে আছি। আর যাদের মাটিতে পুঁতেছিলুম তারা আঙুর আর ডালিমগাছের ফল হয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

দুই কুমার বললেন, 'কি করে উদ্ধার করবো?'

গুটিপোকা বললে, 'রক্ত দিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো, তবেই রাজকন্যারা উদ্ধার পাবে।'

বড় কুমার কোমর থেকে তলোয়ার বার করে নিজের বুকে মারলেন .এক ঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি দেখতে দেখতে আঙুর-পরী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে সামনে দাঁড়াল!

ছোট কুমার কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে নিজের বুকে মারলেন, এক ঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি ডালিম-পরী রাঙা টুকটুকে রাজকুমারী হয়ে তাঁর পানে চেয়ে হাসতে লাগল।

 বড় কুমার বললেন, 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!'

ছোট কুমার বললেন, ‘এত সুন্দর রাজকুমারী তো কখনো দেখিনি!’

আঙুর-কুমারী হাসতে হাসতে নিজের গলা থেকে মুক্তার মালা নিয়ে বড় কুমারের গলায় পরিয়ে দিল। ডালিম-কুমারী লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের গলার মালা ছোট কুমারের গলায় দিল।

তখন দুই রাজপুত্র দুই রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

নিরানন্দ রাজ্য আবার হেসে উঠল।

রাজপুরীতে শানাই বাজল।

রাজার আর অসুখ রইল না। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেদেব বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজকন্যাদের দেখে বললেন, ‘আহা, কি সুন্দর মেয়ে! এরা কারা?’

কুমারেরা বললেন, ‘ওরা পুরনো রাজার কন্যা। মায়া-বন থেকে উদ্ধার করে এনেছি।’

শুনে আনন্দে রাজার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

রানী-মা অন্দরমহল থেকে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে ছেলেদের বুকে নিলেন; দুটি ফুলের মত রাজকন্যাকে দেখে বললেন, ‘এ কাদের এনেছিস বাবা?’

কুমারেরা হেসে বললেন, ‘তোমার জন্যে দাসী এনেছি।’

রানী দুই বৌকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন! রাজ্যে জয়ডঙ্কা বেজে উঠল। রাজা-রানীর বুকে আহ্লাদ ধরে না। দুই রাজকুমাব দুই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজ্যে কারো মনে দুঃখ রইল না।

তারপর একদিন রাজ্য দুই ভাগ করে দুই কুমারকে দিয়ে রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন; রানীকে নিয়ে মায়া-বনে কুটীর বেঁধে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

*　　*　　*

ডাইনী-বুড়ী গুটিপোকা হয়ে আরো অনেক দিন গাছে ঝুলে রইল। যেদিন তার পাপ ক্ষয় হল সেদিন সে গুটি কেটে একটি কালো প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

ময়ূরকূট

পাঁচ-ছশো বছর আগে বাংলাদেশের পূর্বসীমায় একটি ছোট্ট রাজ্য ছিল। পার্বত্য রাজ্য, চারদিকে খালি পাহাড় আর পাহাড়। কোথাও পাহাড়ের দুটি শ্রেণী পাশাপাশি বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে—তাদের মাঝখানে শ্যামল উপত্যকা। উপত্যকায় ছোট-ছোট নগর, ছোট-ছোট গ্রাম, শস্যের ক্ষেত। কোথাও বা গো-চারণের সবুজ মাঠ, তার উপর রাখাল বালকেরা বেণু বাজিয়ে গরু চরায়।

আবার কোথাও বা শুধুই পাথর—উঁচু-নিচু, কর্কশ। পাহাড়ের গায়ে ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। সেই পাহাড়ী অঞ্চলে কোথাও লোকালয়

নেই ফসলের ক্ষেত নেই—কেবল এখানে ওখানে দুয়েকটা পার্বত্য দুর্গ সেই ছোট্ট রাজ্যটির ঘাঁটি আগলাবার জন্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সব ছোট-ছোট দুর্গের মধ্যে সৈন্য থাকে, তারা রাজ্যের চার সীমানা পাহারা দেয়।

রাজ্যের ঠিক মাঝখানে গিরি-বেষ্টনের মধ্যে রাজধানী। রাজধানীর মাঝখানে সাদা পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে রাজা বীরবিক্রম বর্মা তাঁর একমাত্র মেয়ে ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে থাকেন। ক্ষণপ্রভার বয়স ষোল বছর—সত্যি ক্ষণপ্রভার মতই তাঁর রূপ; আষাঢ়ের মেঘে-ঢাকা আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন সুন্দর দেখায়, রাজকুমারীর রূপও ঠিক তেমনি। কিন্তু এহেন রূপসী রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা এখনও আইবুড়ো।

ক্ষণপ্রভা রাজার একমাত্র মেয়ে বটে, কিন্তু রাজা অপুত্রক ছিলেন না। তাঁর চারটি ছেলে ছিলেন—কার্তিকের মত সুন্দর আর কার্তিকের মত বীর। কিন্তু তাঁরা কেউ বেঁচে নেই, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য চারজনই একে-একে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন।

যে-সময়ের গল্প, সে-সময়ে মগজাতি সুবিধা পেলেই বাংলাদেশ আক্রমণ করত। বাংলাদেশের প্রচুর শস্যসম্পদ আর ধনসম্পত্তির উপর তাদের ছিল ভয়ানক লোভ! প্রায় প্রতি বছরই তারা বাংলাদেশ জয় করবার জন্য বেরিয়ে পড়ত—হাজার হাজার যোদ্ধা পঙ্গপালের মত গৌড়বঙ্গের সীমান্তে এসে উপস্থিত হত। কিন্তু সেই সীমান্তে যে-কয়টি ছোট-ছোট পার্বত্য রাজ্য ছিল, তাদের ডিঙিয়ে যাওয়া মগদের পক্ষে সহজ হত না। বাংলার সীমান্তে দু-পক্ষের ঘোর যুদ্ধ বাধত। কখনও মগেরা হেরে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যেত, কখনও বা একটা পার্বত্য রাজ্য অধিকার করে তারা বাংলাদেশে ঢোকবার রাস্তা করে নিত।

রাজা বীরবিক্রম বর্মার রাজ্য আজ পর্যন্ত মগের পদানত হয়নি। কিন্তু আর বুঝি রাজ্য থাকে না, মগের হাতে ছারখার হয়ে যায়। বীরবিক্রম নিজে মহা রণপণ্ডিত—চারদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে, যাতে ধূর্ত মগ চুপি-চুপি রাজ্যে ঢুকে না পড়ে। কিন্তু রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন; তার উপর সিংহের মত পরাক্রমশালী চার পুত্র একে-একে এই মগের গতিরোধ করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছেন। রাজ্যসুদ্ধ লোকের ভাবনা,—এবার মগ আক্রমণ করলে কে দেশ রক্ষা করবে?

* * *

একদিন শরৎকালের সকালবেলা রাজকন্যা ক্ষণপ্রভা প্রাসাদ-সংলগ্ন উপবনে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি নবীন যুবা—তাঁর

নাম মেঘবাহন। জীমূতবাহন নামে রাজার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন, মেঘবাহন তাঁরই ছেলে। জীমূতবাহন শুধু রাজার বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজার সেনাপতি—যাকে সেকালে মহাবলাধিকৃত বলত। একবার মগদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে জীমূতবাহন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে এলেন না; তখন রাজা বীরবিক্রম তাঁর একমাত্র ছেলেকে কোলে ক'রে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। কিশোর মেঘবাহন সেই থেকে রাজভবনেই রইল; বালিকা ক্ষণপ্রভার সে হল খেলার সাথী। তাদের কোমল হৃদয়দুটি ছেলেবেলা থেকেই মিশে এক হয়ে গেল। এইভাবে দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠলেন।

উপবনে বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে হ্রদের তীরে মর্মরে বাঁধানো একটি উঁচু বুরুজের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজ-উদ্যানের পাশেই প্রকাণ্ড হ্রদ—বর্ষার জ'লে কানায় কানায় টলমল করছে। উপছে-পড়া জল ঝর্ণার মত ঝিরঝির করে একধার দিয়ে ঝরে পড়ছে; তারপর এঁকেবেঁকে অনেক দূর চলে গেছে। এই ছোট্ট সরু নদীটির নাম নাগ-নালা। নাগ-নালার জল একটি সংকীর্ণ গিরি-সংকটের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাজ্যের বাইরে পড়ছে।

সকালবেলার সোনালী রৌদ্রে হ্রদের জল ঝকমক করছে, নাগ-নালার ঝর্ণা যেন রাশি-রাশি মুক্তার প্রপাত। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মেঘবাহন একটি নিশ্বাস ফেললেন; আস্তে আস্তে বললেন, 'এই হ্রদে এত জল, কিন্তু বেরুবার পথ কত সংকীর্ণ! তবু কিন্তু আমাদের রাজ্য—যার জন্য প্রাণ দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই—যাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি, সেই রাজ্য রক্ষার একমাত্র উপায় এইটিই।'

অতর্কিতে রাজা উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু তোমাদের চেয়েও শতগুণ বেশি ভালবাসি—আমার এই পাহাড়-ভরা কঠিন মাতৃভূমিকে। ক্ষণপ্রভা, তোমার চার দাদা এই মাতৃভূমির জন্য হাসি-মুখে প্রাণ দিয়েছে। মেঘবাহন, তোমার বাবাও তাঁর রক্ত দিয়ে এই দেশের মাটিকে রাঙা করে তুলেছেন। বল দেখি, আমাদের এই জন্ম-ভূমি কি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী নয়?'

রাজার কথা শুনতে শুনতে দু'জনের শরীরই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল; তাঁরা মাথা নিচু ক'রে শুনতে লাগলেন।

রাজা বললেন, 'আমি বুড়ো হয়েছি। জানি, যুদ্ধ করতে করতে আমিও মরব; আর সেদিন বেশি দূরেও নয়।—কিন্তু তারপর? আমি মরে গেলে এ রাজ্য কে রক্ষা করবে?'

ক্ষণপ্রভার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল; তিনি বাপের মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

রাজা বলে চললেন, 'আমার মৃত্যুর পর ক্ষণপ্রভা রাজ্যের অধিকারিণী হবে। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি রাজপুত্র চাই না; যে লোক মগের হাত থেকে আমার দেশ রক্ষা করতে পারবে তাকেই আমি কন্যাদান করব। তা সে ভিখারীই হোক—আর চণ্ডালই হোক।'

ক্ষণপ্রভা আর মেঘবাহন চকিতের জন্য পরস্পরের পানে চাইলেন। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

এই সময় হঠাৎ ময়ূরের উচ্চ কেকাধ্বনি শোনা গেল। ক্ষণপ্রভা আর মেঘবাহন চমকে উঠে চারদিকে তাকালেন; কিন্তু হ্রদের ধারে কিংবা উদ্যানের কোথাও ময়ূর দেখতে পেলেন না। রাজভবনে পোষা ময়ূরও নেই—তবে কেকাধ্বনি এল কোথা থেকে?

ময়ূরের ডাক শুনে রাজা বীরবিক্রমের মুখ কিন্তু অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ময়ূরকূটের ময়ূর ডেকেছে। তার মানে আবার মগ আসছে—আর দেরি নেই!'

ক্ষণপ্রভা বললেন, 'বাবা, কী বলছ! ময়ূরের ডাক কোথা থেকে এল?'

রাজা স্তম্ভচূড়া থেকে নেমে যাবার উপক্রম করছিলেন, মেয়ের কথায় ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মা, এ ময়ূরের ডাক ময়ূরকূট থেকে এসেছে।'

ক্ষণপ্রভা বললেন, 'ময়ূরকূট! সে কোথায়? কখনও নাম শুনিনি তো?'

রাজা বললেন, 'খুব কম লোকেই ময়ূরকূটের নাম জানে। তবে বলি শোনো। এখান থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে—এই নাগ-নালার উপত্যকা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে, একটি স্তম্ভের মত গিরিচূড়া আছে। সেই গিরিচূড়ায় যখন ময়ূর ডাকে তখন তার ডাক এই স্তম্ভে এসে পৌঁছয়।'

মেঘবাহন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'দশ ক্রোশ দূরে?'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ। কী করে আওয়াজ এত দূর আসে কেউ জানে না, প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত রহস্য! হয়তো পাহাড়ের গায়ে শব্দ ধাক্কা খেয়ে তার প্রতিধ্বনি এতদূর চলে আসে। কিন্তু সে যাই হোক, যখনই এই স্তম্ভের উপর থেকে ময়ূরের ডাক শোনা যায়, তখনই বুঝতে হবে, হিংস্র মগ আসছে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে। এমনি পুরুষানুক্রমে হয়ে এসেছে—কখনও ব্যতিক্রম হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেঘবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ময়ূরকূটের শব্দ যেমন এখানে শোনা যায়, এখানকার শব্দও কি তেমনি

ময়ূরকূটে শোনা যায়?'

মাথা নেড়ে রাজা বললেন, 'তা কেউ বলতে পারে না। ময়ূরকূটের চূড়া এতই দুরারোহ যে, তার ডগায় আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ উঠতে পারেনি।—আমি যাই, ময়ূর যখন ডেকেছে, তখন মগ নিশ্চয়ই আসছে। রাজ্যের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দূত পাঠাতে হবে, সকলে যাতে সতর্ক থাকে। কারণ, মগ যে কোন্ পথ দিয়ে রাজ্যে ঢোকবার চেষ্টা করবে তা কেউ জানে না।' তারপর মেঘবাহনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'মেঘবাহন দেশের আসন্ন বিপদ; এই বিপদ থেকে রাজ্যকে যে রক্ষা করতে পারবে—রাজ্য তারই।' এই বলে তিনি ধীরে ধীরে স্তম্ভ থেকে নেমে গেলেন।

রাজা চলে যাবার পর ক্ষণপ্রভা আর মেঘবাহন অনেকক্ষণ নীরবে হ্রদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মেঘবাহন দৃঢ়, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষণপ্রভা, আমি চললাম।'

চকিতে তাঁর মুখের পানে মুখ তুলে ক্ষণপ্রভা বললেন, 'কোথায়?'

'তা জানি না। একাই যাচ্ছি—আমার তো সৈন্যসামন্ত নেই! যদি মগের হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে পারি তবেই ফিরব, নইলে এই শেষ দেখা।'

জলভরা চোখে রাজকন্যা বললেন, 'শেষ দেখা নয়, আবার তুমি ফিরে আসবে। কিন্তু এখনই যাবে? যাবার আগে আর-একবার তোমাকে দেখতে পাব না? তোমার গলা শুনতে পাব না?'

একটু হেসে মেঘবাহন বললেন, 'দেখতে আর পাবে না; কিন্তু গলা শুনতে পাবে। আমি ঠিক করেছি নাগ-নালার পথ দিয়ে যাব। দুপুর রাত্রে চাঁদ যখন মাথার উপর উঠবে, তখন তুমি এই স্তম্ভে এসে দাঁড়িয়ো—আমি ময়ূরকূট থেকে তোমার সঙ্গে কথা কইব।'

ক্ষণপ্রভা বললেন, 'কিন্তু ময়ূরকূটের চূড়ায় ওঠা যে মানুষের অসাধ্য!'

'মানুষের যা অসাধ্য, তাই আমি করব। আর তুমিও কথা কয়ো; দেখব ময়ূরকূট থেকে তোমার মিষ্টি গলার আওয়াজ পাই কি না।'

ক্ষণপ্রভা হাসি-কান্না-ভরা সুরে বললেন, 'আচ্ছা।'

দুই

দুপুরবেলা নাগ-নালার সরু উপত্যকার ভিতর দিয়ে মেঘবাহন ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মাথার উপর খর রৌদ্র; দু'দিকের পাথরে তার তেজ প্রতিফলিত হয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই; তিনি নিজের মনে ভাবতে-ভাবতে চলেছেন।

নাগ-নালার উপত্যকাটি লম্বায় রাজ্যের শেষ পর্যন্ত গিয়েছে বটে, কিন্তু চওড়ায় খুব বেশি নয়; বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ হাত হবে। তারই মাঝখান দিয়ে তিন-চার হাত সরু জলের ধারা বয়ে গেছে। আশেপাশে পাথর-ভরা সংকীর্ণ জমি, তার উপর দিয়ে ঘোড়া চলতে পারে। তারপরই পাহাড় উঠেছে পাঁচিলের মত উঁচু হয়ে। নাগ-নালার উপত্যকা সত্যিই নালার মত দেখতে।

ক্রমে সূর্য পিছন দিকে ঢলে পড়ল। মেঘবাহন যতদূর দৃষ্টি যায় সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, কোথাও জনমানবের বসতি নেই; আকাশে বহুদূরে কয়েকটা শকুন উড়ছে। মেঘবাহনের পিপাসা পেয়েছিল, তিনি ঘোড়া থেকে নেমে অঞ্জলি ভরে নাগ-নালার ঠাণ্ডা জল পান করলেন। তারপর আবার সম্মুখপানে চলতে লাগলেন। পিছনে রাজধানী কোথায় হারিয়ে গেছে, সামনে রাজ্যের সীমানায় ময়ূরকূটের এখনও দেখা নেই।

ঘোড়া অসমতল পাথুরে রাস্তা দিয়ে মৃদুমন্দ চলেছে—তার পিঠে বসে মেঘবাহন ভাবছেন—কত কী ভাবছেন। কখনও ভাবছেন—আমি একা, যদি মগ-সৈন্যের দেখা পাই কী করব। মগ এখনও এ-রাজ্যে প্রবেশ করেনি, নিজের দেশেই আছে। সেখানে গিয়ে তাদের দলে মিশে যাব? তারা হয়তো নূতন কোন মতলব আঁটছে; যদি সন্ধান নিয়ে ফিরে আসতে পারি অনেক উপকার হবে। আর যদি তারা আমাকে ধরে ফেলে, বেঁচে ফিরে আসতে দেবে না। তা, ক্ষতি কী? একা আমি, আর কিছু না পারি প্রাণ দিতে তো পারব!

কখনও মেঘবাহনের চোখের সামনে কুমারী ক্ষণপ্রভার মুখখানি ভেসে উঠছে; চোখদুটিতে অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা। মেঘবাহনের বুক ভরে উঠছে; তিনি মনে মনে বলছেন—পারব! কেমন করে দেশ রক্ষা করব জানি না; কিন্তু আমার মন বলছে আমি পারব।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল। মেঘবাহনের কোনও দিকে নজর ছিল না, নাগ-নালার একটা বাঁকের মুখ পার হয়ে হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রায় আধ ক্রোশ দূরে নাগ-নালার উপত্যকা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে; আর ঠিক তার মুখের কাছে সরু, লম্বা একটি গিরিকূট আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘবাহন বুঝলেন—এই ময়ূরকূট। তিনি সেইদিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

ময়ূরকূটের পাদমূলে পৌঁছে তিনি ঘোড়া ছেড়ে দিলেন। দেখলেন নাগ-নালার জল ময়ূরকূটকে বেষ্টন করে ঢালু জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচের সমতল ভূমির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এই হল

রাজ্যের সীমানা—এর পরেই মগের মুল্লুক।

এখানেও কিন্তু গ্রাম বা জনপদের চিহ্ন নেই। একে পাহাড়ে তরাই, তার উপর দুটো বিরুদ্ধ রাজ্যের সীমানা। এখানে মানুষ থাকতে ভয় পায়।

সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে; আকাশের আলো আবছায়া হয়ে আসছে। মেঘবাহন ঊর্ধ্বে চোখ তুলে দেখলেন, ময়ূরকূটের শিখরে তখনও রাঙা আলো জ্বলজ্বল করছে।

কাচের গেলাস উল্টে রাখলে যেরকম দেখতে হয়, ময়ূরকূটের চেহারা অনেকটা সেইরকম। অবশ্য কাচের গেলাসের মত তার গা মসৃণ নয়; কর্কশ আর কঠিন পাথরের চাপ প্রকৃতির খেয়ালে স্তম্ভের মত স্তরে-স্তরে খাড়া হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে কাঁটা গাছের ঝোপ—উপরে উঠবার পথ অত্যন্ত দুর্গম।

তবু, চেষ্টা করলে একেবারে ওঠা যায় না, এমন নয়; এইসব ঝোপ-ঝাড়ই সাহায্য করে। তার উপর স্তম্ভের গায়ে মাঝে মাঝে খাঁজ আছে, তাতে পা রেখে ওঠা যায়। মেঘবাহন আর দ্বিধা না করে ময়ূরকূটে উঠতে আরম্ভ করলেন। কথা আছে—দুপুর রাত্রে কুমারী ক্ষণপ্রভাকে উদ্দেশ করে চূড়া থেকে কথা কইতেই হবে, ক্ষণপ্রভা হ্রদের ধারে সেই স্তম্ভের মাথায় অপেক্ষা করে থাকবেন।

মেঘবাহন যতই উপরে উঠতে লাগলেন, ততই ওঠা কঠিন হতে লাগল। কখনও কাঁটাগাছের শিকড় ধরে দু'ধাপ ওঠেন, কখনও পাথরের সঙ্কীর্ণ খাঁজে পা রেখে একটু বিশ্রাম করেন। একবার পা ফস্কালে আর রক্ষে নেই—নিশ্চয় মৃত্যু। তবু তিনি নিরস্ত হলেন না—অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের অসাধ্য সেই চূড়ায় উঠতে লাগলেন।

দিনের শেষ আলো যখন কেবল আকাশের গায়ে লেগে আছে, তখন মেঘবাহন চূড়ার উপর গিয়ে পৌঁছলেন। দেখলেন, ময়ূরকূটে সত্যিই ময়ূরের গতিবিধি আছে—চাতালের মত সমতল চূড়ার উপর অনেক ময়ূরপুচ্ছ আর পালক ছড়ানো রয়েছে।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিছু দেখা যায় না; কেবল সরু সুতার মত নাগ নালার জল অন্ধকারে অস্পষ্ট পড়ে আছে। সমস্ত দিন ঘোড়ায় চড়ে—তারপর এই পাহাড়ের ডগায় উঠে ক্লান্ত মেঘবাহন পাথরের মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে রইলেন। ক্রমে তাঁর ক্লান্ত চক্ষুদুটি ঘুমে মুদে এল।

একটা মৃদু মর্মর শব্দ তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। তিনি চোখ মেলে দেখলেন, পূর্ণ চন্দ্র আকাশের মাঝখানে ভাসছে।

কিছুক্ষণ তিনি বুঝতে পারলেন না কোথায় আছেন; তারপর

সব মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণ ঘুমিয়ে আছেন! তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। তারপর নিচে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

জ্যোৎস্নায় উপত্যকার অন্ধকার কেটে গেছে। মেঘবাহন দেখলেন, পিঁপড়ের মত সারি-সারি মানুষ এই আবছায়া চাঁদনি আলোর ভিতর দিয়ে নাগ-নালায় ঢুকছে। তারা কেউ কথা কইছে না, তবু তাদের চলার শব্দ একটানা মর্মরধ্বনির মত কানে আসছে। থেকে-থেকে তাদের শিরস্ত্রাণে কিংবা বর্শার ফলকে চাঁদের আলো চমকে উঠছে। উজান স্রোতের মত তারা নাগ-নালার গিরি-সঙ্কট দিয়ে রাজধানীর দিকে চলেছে। অস্ফুটকণ্ঠে মেঘবাহন বলে উঠলেন, 'মগ! মগ রাজধানী আক্রমণ করতে চলেছে!'

ময়ূরকূটের চূড়ায় পাথরের মূর্তির মত বসে মেঘবাহন দেখতে লাগলেন। মগ-সৈন্য প্রায় বিশ হাজার হবে; তারা বোধহয় নাগ-নালার মুখের সন্ধান পেয়ে তারই আনাচে কানাচে লুকিয়ে ছিল, এখন রাত্রির আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রাজধানীর দিকে চলেছে। নাগ-নালার পথে দুর্গ কি ঘাঁটি কিছুই নেই। সকাল হতে-না-হতে মগেরা রাজধানী পৌঁছবে। রাজা খবর জানেন না, অতর্কিত শত্রুর আক্রমণ থেকে কী করে রাজ্য রক্ষা করবেন!

দু'দণ্ড কেটে গেল। মগ-দস্যুর দল নাগ নালার ভিতর প্রকাণ্ড অজগরের মত এঁকেবেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন তাদের হাঁটার মর্মর শব্দও আর শোনা গেল না, তখন মেঘবাহন চমকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল—আছে আছে, এখনও উপায় আছে! চাঁদ তখনও আকাশের মাঝখানে। মেঘবাহন রাজধানীর দিকে মুখ করে নৈশ বাতাসে নিজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ছেড়ে দিলেন—'ক্ষণপ্রভা! ক্ষণপ্রভা!'

শব্দ আকাশের গায়ে তরঙ্গ তুলে দূরে মিলিয়ে গেল। আবার চারদিক নিস্তব্ধ। মেঘবাহন উৎকর্ণ হয়ে আছেন—আসবে কি? ক্ষণ-প্রভার গলা এতদূর আসবে কি?

একটা ছোট্ট হাসির শব্দ তাঁর কানের কাছে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তিনি শুনতে পেলেন ক্ষণপ্রভা বলছেন, 'এত দেরি করলে কেন? আমি কতক্ষণ তোমার কথা শোনবার আশায় স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছি!'

মেঘবাহনের গায়ে রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল। কী অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দশ ক্রোশ দূর থেকে তাঁরা কথা বলছেন! কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করবার অবসর নেই, মেঘবাহন ব্যগ্রস্বরে বলে উঠলেন, 'ক্ষণপ্রভা, শোনো—

ভয়ংকর বিপদ! নাগ-নালাব পথে রাজ্যে ঢ়ুকছে অসংখ্য মগ-সৈন্য। তারা কাল সকাল হবার আগেই রাজধানীতে পেঁছবে। শীগ্গিব মহারাজকে খবর দাও, সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করুন।'

কিছুক্ষণ পরে ক্ষণপ্রভাব আর্ত স্বর ফিরে এল—'সর্বনাশ! মহারাজ যে কালই রাজধানীব সমস্ত সৈন্য সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছেন! রাজধানী এখন অরক্ষিত—বাজধানীতে একটি যোদ্ধাও নেই।'

মেঘবাহন আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। এখন উপায়! মগ নির্বিবোধে রাজ্য দখল করে নেবে! তাদের বাধা দেবার কেউ নেই! —মেঘবাহন মানসচক্ষে দেখতে লাগলেন—মগেব অত্যাচারে রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয়েছে—রাজধানীতে রাজার রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। কুমারী ক্ষণপ্রভা হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, হ্রদের তরঙ্গে স্বর্ণকমলের মত তাঁর মুখখানা ভাসছে—

হঠাৎ মেঘ-ছাওয়া আকাশে বিদ্যুৎ-চমকানোর মত একটা চিন্তা মেঘবাহনের মাথায় খেলে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—'ক্ষণপ্রভা, এখনও ওখানে আছ কি?'

জবাব এল, 'আছি। কী করব জানি না—তুমি বলে দাও।'

মেঘবাহন বললেন, 'শোনো, একমাত্র পথ আছে। হ্রদের বাঁধের মুখ ভেঙে দাও। রাজপুরীতে যত লোক আছে সবাই মিলে নাগ নালার মুখ খুলে দিক। হ্রদের সমস্ত জল ঐ পথে বেরিয়ে মগ-সৈন্যকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে নিঃশেষ করে দেবে, বুঝেছ?'

ক্ষণপ্রভার উত্তর ভেসে এল, 'বুঝেছি।'

তারপর প্রায় এক প্রহর কেটে গেল। মেঘবাহন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন—কিন্তু প্রকৃতি স্থির হয়ে আছে। আকাশের চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। মেঘবাহন ভাবছেন, তবে কি কিছু হল না? সব ব্যর্থ হল?

দূর মেঘগর্জনের মত একটা আওয়াজ তাঁর কানে এল। মেঘবাহন চকিত হয়ে চাইলেন। গর্জন ক্রমশ গভীর হতে লাগল। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, দূরে নাগ-নালার বাঁকের মুখে বিশ হাত উঁচু জলের প্রবাহ ছুটে আসছে।

দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপা রাক্ষসের মত জলের তোড় এসে পড়ল—তার প্রচণ্ড আঘাতে ময়ূরকূট কেঁপে উঠল। মেঘবাহন দেখলেন, সেই উন্মত্ত স্রোতের বুকে মগ-সৈন্যের দল খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে!

যখন সকালে সূর্য উঠল, তখন দেখা গেল বিপুল সৈন্যের একজনও বেঁচে নেই. নাগ-নালার নিচে সীমান্তের প্রান্তরের উপর তাদের

হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরের প্রাণ নিতে যারা এসেছিল, নিজের প্রাণ দিয়ে তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

* * *

মেঘবাহন যখন রাজধানীতে ফিরে এলেন তখন রাজা সিংহাসন থেকে নেমে তাঁকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সভার অসংখ্য লোক মেঘবাহনকে দেখবে বলে জমা হয়েছিল, রাজা তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'শোন সবাই, আমার মৃত্যুর পর যিনি সিংহাসন অধিকার করবেন তিনি এই আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বিনা যুদ্ধে মেঘবাহন বিশ হাজার মগ নিপাত করেছেন; মগ আর কখনও এ-রাজ্যে পা বাড়াবে না।...মেঘবাহন, এবার রাজকন্যার বন্দনা গ্রহণ কর।'

সভার মাঝখানে হাজার লোকের সামনে কুমারী ক্ষণপ্রভা এসে মেঘবাহনের কপালে বিজয়ীর তিলক পরিয়ে দিলেন, তারপর সলজ্জ হেসে তাঁর গলায় বরমাল্য দিলেন।

রাজ্যসুদ্ধ লোক আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল।

ঝিলম নদীর তীরে

এক

আলেকজান্ডার সৈন্যদল নিয়ে হাইডাস্‌পিস নদী পার হলেন। হাইডাস্‌পিসের সংস্কৃত নাম—বিতস্তা, চলতি কথায়—ঝিলম। রবীন্দ্রনাথ এই ঝিলম সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।' এই বাঁকা তলোয়ারের ক্ষুর-ধার একদিন আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ী সেনাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে আলেকজান্ডার নদী পার হয়েছিলেন।

এপারে পুরু রাজা তাঁর চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তৈরি ছিলেন। ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল। সেকালে গ্রীক-সৈনিকেরা বড়-বড় দাড়ি রাখত। গল্প আছে, সুযোগ পেয়ে হিন্দু যোদ্ধারা সেই দাড়ি ধরে গ্রীকদের প্রচন্ড মার দিতে লাগল। গ্রীকদের অবস্থা যায়-যায় হয়ে উঠল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ প্রথম দিন শেষ হল না, পরদিনের জন্য মুলতুবি রইল। সেকালে রাত্রিকালে যুদ্ধ করবার নিয়ম ছিল না।

আলেকজান্ডার ভারি কূটবুদ্ধি সেনাপতি ছিলেন; তা নাহলে অর্ধেক পৃথিবী জয় করতে পারতেন না। পরদিন সকালে যখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন দেখা গেল, সেনাপতির হুকুমে গ্রীক-সৈন্যেরা বিলকুল দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। তাই দেখে হিন্দু-যোদ্ধারা ভারি বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এরকম তো কথা ছিল না! তারা আর মন দিয়ে যুদ্ধ করতে পারলে না। গ্রীকরা উল্টে তাদের মার দিতে লাগল।

যুদ্ধে যে আলেকজান্ডারেরই শেষ পর্যন্ত জিত হয়েছিল, যারা ইতিহাস পড়েছে তারাই একথা জানে। পুরু রাজা আলেকজান্ডারের কাছে ধরা ছিলেন, আলেকজান্ডার তাঁর রাজোচিত ব্যবহারে খুশি হয়ে তাঁকে নিজের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করে সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কাহিনীর কোনও সম্বন্ধ নেই।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ যখন চলছিল, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের একধারে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে দুটি লোক যুদ্ধ দেখছিলেন। একজন যুবা-বয়স্ক; কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, বৃষের মত বলিষ্ঠ দেহ, মুখে-চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, পরিধানে লৌহজালিক, কোমরে তরবারি। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বৃদ্ধ; শীর্ণ দেহ মুণ্ডিত মাথা, গায়ে কেবল উত্তরীয়, অস্ত্র-শস্ত্র কিছু নেই।

দু'জনে টিলার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছেন। ভীষণ যুদ্ধ চলছে। গ্রীকদের ঘন-সন্নিবদ্ধ ফ্যালাংক্স্ কখনও হিন্দুদের ঠেলে পেছিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুদের রণ-হস্তীর দল কখনও গ্রীকদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। প্রকান্ড এক হাতির পিঠে বসে পুরু রাজা সৈন্য-চালনা করছেন, আলেকজান্ডার সাদা ঘোড়ার পিঠে। মুহুর্মুহু তূর্যনাদ হচ্ছে, আহত হাতি চিৎকার করছে, হিন্দুদের রথের তলায় পড়ে গ্রীকরা আর্তনাদ করছে, গ্রীকদের তলোয়ারের আঘাতে হিন্দু-সৈন্যদের মাথা কেটে মাটিতে পড়ছে। রক্তের হোলিখেলা! এমন যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের পর ভারতবর্ষে আর হয়নি। যুদ্ধের পর আলেকজান্ডার নাকি বলেছিলেন, 'আমি ম্যাসিডোনিয়া থেকে সপ্তসিন্ধু পর্যন্ত বারো হাজার মাইল যুদ্ধ করতে-করতে এসেছি, কিন্তু এমন বীর, রণকুশল শত্রু কোথাও পাইনি।'

টিলার উপর থেকে যুদ্ধ দেখতে-দেখতে যুবকটি মাঝে-মাঝে ভারি ১

উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি এখনি তলোয়ার খুলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন! বৃদ্ধ কোনও রকমে তাঁকে শান্ত করে রেখেছিলেন।

একবার যুদ্ধ যখন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে, তখন যুবক হঠাৎ তরবারি নিষ্কোষিত করে টিলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। বৃদ্ধ তখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বৃষল, শান্ত হও। এখন যুদ্ধে যোগ দিয়ে কোনও লাভ নেই। এই যবনরাজা অতিশয় রণ-নিপুণ, পৌরব তাঁর কাছে হেরে যাবেন।'

যুবক বললেন, 'দেব, হার-জিতে কী আসে যায়? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম। আমার রক্তে যুদ্ধের উন্মাদনা নৃত্য করছে! আপনি অনুমতি দিন।'

বৃদ্ধ বললেন, 'না, অসি কোষবদ্ধ কর। বৃহত্তর প্রয়োজনে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে, আত্মঘাতী হলে চলবে না।'

যুবক বললেন, 'যুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের বৃহত্তর প্রয়োজন আর কী আছে?'

বৃদ্ধ রণক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'আজ পৌরব পরাজিত হবেন, আমি দেখতে পাচ্ছি। তারপর যবনকে আর্যা-বর্ত থেকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? তোমার রক্ত উষ্ণ হয়েছে—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে যুদ্ধের নেশায় বুদ্ধি হারানো উচিত নয়।'

যুবক তখন নিশ্বাস ফেলে অসি কোষবদ্ধ করলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হল। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় রইল না। হিন্দু-সৈন্যদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, যারা বাকি আছে তারা পালাচ্ছে। গ্রীক-সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে বন্দী করছে।

যুবক বললেন, 'আর আমি এ-দৃশ্য দেখতে পারছি না। চলুন তক্ষশিলায় ফিরে যাই।'

কিন্তু তাঁদের ফেরা হল না। টিলা থেকে নামবার উপক্রম করতেই একদল গ্রীক-সৈন্য এসে তাঁদের ধরে ফেলল।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমাদের ধরছ কেন? আমরা তো যুদ্ধ করিনি।'

একজন গ্রীক-সেনানী বলল, 'তুমি তো নিরস্ত্র, বৃদ্ধ; তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু এ যুদ্ধ করেছে, একে ছাড়ব না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ও যুদ্ধ করেনি। ওর তলোয়ার খুলে দেখ, তলোয়ারে রক্তের দাগ নেই।'

গ্রীকরা যুবকের তলোয়ার খুলে দেখল সত্যিই রক্তের দাগ নেই; কিন্তু তবু তারা যুবককে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সেনানী বলল,

'যোদ্ধার বেশধারী কাউকে আমরা ছাড়ব না। বৃদ্ধ, তুমি যেতে পার।'

গ্রীকরা যুবককে আগেই নিরস্ত্র করেছিল, এখন তাঁর হাত বাঁধবার উপক্রম করল। যুবক প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন দেখে বৃদ্ধ বললেন, 'বৃষল, অনর্থক প্রাণ দিও না। যবন-সেনাপতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুমি যুদ্ধ করনি শুনলে নিশ্চয় তোমায় মুক্তি দেবেন। এখন যাও। সতর্ক থেকো, সংযত থেকো। বিপদে সংযমই সহায়।'

বৃদ্ধ চলে গেলেন। গ্রীকরা যুবকের হাত বেঁধে তাঁকে আলেক-জাণ্ডারের ছাউনিতে নিয়ে গেল।

দুই

ঝিলম নদীর তীরে আলেকজাণ্ডারের সেনা-শিবির পড়েছে; শিবিরে মেঘলোক সৃষ্টি হয়েছে। মাঝখানে আলেকজাণ্ডারের প্রকাণ্ড উঁচু বস্ত্রাবাস। যুদ্ধের শেষে বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সদর্পে নিজের বস্ত্রাবাসে ফিরে এলেন।

ক্রমে রাত্রি হল। শত-শত মশাল জ্বলে উঠল। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ঝিলমের তীরে দেওদার বনের মধ্যে অসংখ্য আলেয়া জ্বলছে, নিভছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আলেকজাণ্ডারের বস্ত্রাবাসের দ্বারে ভল্লধারী প্রতীহার। ভিতরে প্রশস্ত কক্ষটি বহু তৈলদীপের আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিকে নানা অস্ত্রশস্ত্র ছড়ানো রয়েছে। কক্ষের মাঝখানে একটি পারসিক গালিচার উপর বসে আছেন স্বয়ং আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডার স্নান সমাপন করে আহারে বসেছেন। আঙুর, ডালিম প্রভৃতি ফল এবং প্রকাণ্ড একটি ভেড়ার রাঙ্ সোনার থালে সাজানো রয়েছে, আলেকজাণ্ডার তাই কেটে-কেটে খাচ্ছেন। তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, দুইজন কৃষ্ণকায় ভৃত্য তাঁর সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করে দিচ্ছে। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর পাশে বসে গল্প করছেন। যুদ্ধের কথাই হচ্ছে।

আলেকজাণ্ডারের বয়স এই সময় ত্রিশ বৎসর। শরীরের দৈর্ঘ্য খুব বেশি নয়, কিন্তু বাহু ও বক্ষের পেশী—লোহার মত মজবুত; বলদৃপ্ত দেহ থেকে পৌরুষ যেন ফেটে পড়ছে। এই বয়সে তিনি অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছেন, ত্রিভুবনে তাঁর তুল্য যোদ্ধা নেই, একথা তিনি জানেন। তাই তাঁর প্রিয়দর্শন মুখে বিজয়গর্ব এবং আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট।

আজ কিন্তু তাঁর মন ভারি খুশি আছে। তিনি যুদ্ধের নানা ঘটনা সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন; কখন কিভাবে যুদ্ধের

মোড় ঘুরে গেল এই নিয়ে তর্ক চলছে। সকলেই রণপণ্ডিত সেনাপতি; খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

আহার শেষ হল। ভৃত্য দু'জন তৈলমর্দন সমাপ্ত করে আলেকজাণ্ডারের গায়ে একটি সূক্ষ্ম মলমলের উত্তরীয় জড়িয়ে দিল। আলেকজাণ্ডার ইসারা করলেন; তারা ভোজনপাত্রগুলি তুলে নিয়ে গেল, তারপর বড়-বড় পাথরের কারুকার্য-খচিত ভৃঙ্গারে পানীয় এনে প্রভুর সামনে রাখল।

সুরার প্রতি আলেকজাণ্ডারের অতিরিক্ত আসক্তি ছিল। এই সুরাই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল: কিন্তু সে আরও দু'-তিন বছর পরের কথা। তিনি অসম্ভব মাত্রায় মদ খেতে পারতেন, কিন্তু সহজে মাতাল হতেন না। তাঁর সঙ্গে সমান তালে মদ খেয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা যখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন, আলেকজাণ্ডার তখন খাড়া থাকতেন। এই বিষয়ে তাঁর মনে বেশ গর্ব ছিল।

সোমার পানপাত্রে ইরানী সুরা ঢেলে তিনি পাত্র মুখে তুলতে যাবেন, এমন সময় বাইরে থেকে প্রতীহার এসে সসম্ভ্রমে জানালো, একজন বন্দী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আলেকজাণ্ডার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বন্দী? কী চায়?'

প্রতীহার বলল, 'তা কিছু বলছে না। তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, সে খাচ্ছে না, বলছে, সম্রাটের দেখা না পেলে সে অন্ন স্পর্শ করবে না।'

আজকাল যেমন, সে-কালেও তেমনি সভ্যজাতির মধ্যে শত্রুপক্ষের বন্দী-সৈন্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবার রীতি ছিল। এই যুদ্ধে হিন্দুদের প্রায় নয় হাজার সৈন্য বন্দী হয়েছিল, তারা সকলে গ্রীকদের হাতে সমুচিত সদ্ব্যবহার পেয়েছিল। কিন্তু সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ কেউ প্রকাশ করেনি। আলেকজাণ্ডার একটু চিন্তা করে বললেন, 'নিয়ে এস বন্দীকে আমার কাছে।'

বন্দী আর কেউ নয়, আমাদের পূর্বপরিচিত যুবক। দু'জন সান্ত্রী হাত-বাঁধা অবস্থায় তাঁকে আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত করল। আলেকজাণ্ডার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন, এ সাধারণ বন্দী নয়, আভিজাত্যের চিহ্ন এর সর্বাঙ্গে ছাপ মারা রয়েছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

যুবকও দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাকে ভালো করে দেখে নিলেন, তারপর শান্তস্বরে বললেন, 'আমার নাম চন্দ্র।'

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?'

 যুবক উত্তর দিলেন, 'আমার বাড়ি নেই, আমি গৃহহীন। আমার

দেশ মগধ।'

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'মগধ! সে তো শুনেছি এখান থেকে অনেক দূর। তুমি এখানে কী করছ?'

যুবক বললেন, 'আমি এখানে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছিলাম, যুদ্ধের শেষে আপনার সৈন্যরা আমায় বন্দী করেছে।'

আলেকজাণ্ডার আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বন্দীর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলেন, তার লোহজালিক এবং শূন্য তরবারির কোষ দেখলেন, তারপর বললেন, 'তাই নাকি? তুমি যুদ্ধ করনি?'

'না।'

'শুধু যুদ্ধ দেখছিলে?'

'হ্যাঁ'

'যুদ্ধ দেখছিলে কেন?'

যুবক স্থিরনেত্রে আলেকজাণ্ডারের পানে চেয়ে বললেন, 'আপনার রণ-কৌশল লক্ষ্য করছিলাম।'

আলেকজাণ্ডার একটু হাসলেন, 'বটে, কী দেখলে?'

যুবক বললেন, 'দেখলাম, আপনার সৈন্যচালনার কৌশল অপূর্ব। হিন্দুরা সাহসে এবং দৈহিক পরাক্রমে গ্রীকদের চেয়ে হীন নয়, আপনি কেবল রণদক্ষতার জোরে যুদ্ধে জিতেছেন।'

আলেকজাণ্ডার সজোরে হেসে উঠলেন, সান্ত্রী দু'জনকে বললেন, 'তোমরা বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দাও।'

হাতের বাঁধন খোলা হলে আলেকজাণ্ডার সান্ত্রীদের ইসারা করলেন, তারা চলে গেল। তখন তিনি যুবককে বললেন, 'তোমার নাম চন্দ্র? উপবেশন কর।'

চন্দ্র গালিচার একপ্রান্তে বসলেন। তখন আলেকজাণ্ডার বললেন, 'তোমার চেহারা দেখে তোমাকে ক্ষত্রিয় বলে মনে হয়। অথচ তুমি যুদ্ধ কর না। আবার যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে তোমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে দেখছি। এ-সবের মানে কী?'

চন্দ্র বললেন, 'সম্রাট, তবে শুনুন। আমি মগধের রাজপুত্র। আমার ভাগ্যদোষে এক ক্ষৌরকার-পুত্র ন্যায্য-সিংহাসন ভোগ করছে, আমি তক্ষশিলায় পালিয়ে এসেছি। তক্ষশিলায় আমার গুরু থাকেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিতে মহা পণ্ডিত। তিনি আমাকে বললেন,—যদি যুদ্ধবিদ্যা শিখতে চাও, যবন সম্রাটের রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ কর। তাই আজ আমি যুদ্ধ দেখতে এসেছিলাম।'

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'বুঝলাম, তুমি রণ-কৌশল শিক্ষা করে তোমার রাজ্য জয় করতে চাও। কিন্তু আজকের যুদ্ধ দেখে যুদ্ধবিদ্যা

কতখানি শিখেছ বল দেখি?'

চন্দ্র উদ্দীপ্ত চক্ষে চেয়ে বললেন, 'সম্রাট, আজ আপনার যুদ্ধ দেখে এই শিখেছি যে, যুদ্ধের কোনও বাঁধাবাঁধি নীতি নেই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই যুদ্ধের নীতি। পুরু মহাবীর, কিন্তু তিনি বিধিবদ্ধ রণনীতি পদে-পদে অনুসরণ করেছিলেন, তাই তিনি হেরে গেলেন।'

আলেকজাণ্ডারও উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ। যুদ্ধ সতরঞ্জ খেলা নয়, জীবন-মরণের খেলা; এখানে নিয়মের কোনও মূল্য নেই, নিয়ম ততটুকুই দরকার যতটুকু যুদ্ধজয়ে সাহায্য করবে। আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে,—মারি অরি পারি যে কৌশলে।'

চন্দ্র বললেন, 'আজ আমি সে-শিক্ষা পেয়েছি। ভারতবর্ষে এ-শিক্ষা নেই, এখানে যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধ-নীতি বড়। জয়-পরাজয়ের উপর যে দেশের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে, একথা ভারতবাসী ভাবে না। আজ আপনার কাছে যে-শিক্ষা পেলাম, তার বলে আমি মগধ জয় করতে পারব। আপনি আমাকে অন্ধ সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'

আলেকজাণ্ডার একটু হেসে বললেন, 'ভাল, ভাল। কিন্তু একটা কথা আছে। আমিও যে মগধ জয় করতে চাই।'

চন্দ্রের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া পড়ল, তিনি বললেন, 'আপনি কি এখন ভারতবর্ষের দিকেই যুদ্ধযাত্রা করবেন? কিন্তু শুনেছিলাম—'

'কী শুনেছিলে?'

'তক্ষশিলায় জনরব শুনেছিলাম, আপনার সৈন্যদল এখন দেশে ফিরে যেতে চায়, তারা আর পূর্বদিকে এগোতে চায় না।'

আলেকজাণ্ডার কিছুক্ষণ চন্দ্রের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি। আমার সৈন্যদল বহু যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছে একথা সত্য। হয়তো উপস্থিত আমি ফিরেই যাব। কিন্তু আবার আসব। ভারতবর্ষ আমি জয় করতে চাই।'

চন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'আপনি যদি আবার ফিরে আসেন, আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'কোথায়?'

'এই ঝিলম নদীর তীরে।'

কথার ইঙ্গিত আলেকজাণ্ডার বুঝলেন, সকৌতুকে হেসে বললেন, 'বেশ। তুমি কেমন যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ হাতে-কলমে তার পরীক্ষা হবে।'

আলেকজাণ্ডার এতক্ষণ সুরার পাত্রটি হাতে ধরে ছিলেন, পান করেননি। এখন সেটি চন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বন্দী হলেও তুমি রাজপুত্র, তোমাকে সমুচিত সম্ভাষণ করা হয়নি। এই

নাও।'

চন্দ্র হাত জোড় করে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আমি মদ খাই না।'

আলেকজান্ডার অবাক হয়ে বললেন, 'সেকি! রাজপুত্র তুমি, মদ খাও না?'

'না সম্রাট। শৈশব থেকে আমার জীবন বড় দৈন্যের মধ্যে কেটেছে। আমার পিতার যুদ্ধে মৃত্যু হয়, আমি তখন মাতৃগর্ভে। আমার মা বনে পালিয়ে গিয়ে আমায় জন্মদান করেন। সেই বনে অনেক ময়ূর ছিল, তাদের মধ্যে আমি লালিত হই। তাই আমার নাম—চন্দ্রগুপ্ত ময়ূরীয়। রাখাল বালকদের সঙ্গে আমি গো-চারণ করতাম। তারপর একদিন আমার গুরুদেব দেখা দিলেন। তিনি মূল্য দিয়ে রাখালদের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিলেন। সেই থেকে আমি গুরুর দাস। সুরাপানের অভ্যাস আমার হয়নি।'

আলেকজান্ডার গম্ভীরমুখে শুনলেন; শেষে সুরাপাত্রটি নিজেই নিঃশেষ করে বললেন, 'তোমার জীবন বিচিত্র। এমনি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত মানুষ তৈরি হয়। হয়তো আমি যা পারিনি, তুমি তা পারবে।'

চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পারেননি, এমন কিছু আছে কি?'

আলেকজান্ডার আর একপাত্র সুরা ঢেলে বললেন, 'আছে। আমি নিজেকে জয় করতে পারিনি। এই সুরা—এর কাছে আমি পরাস্ত হয়েছি।' বলে এক চুমুকে পাত্র শেষ করে ফেললেন।

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা নেই; আলেকজান্ডার ভ্রূ কুঞ্চিত করে শূন্য পাত্রের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গীরা, যাঁরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত বসে কথা শুনছিলেন, তাঁরাও কথা কইলেন না।

চন্দ্র তখন ওঠবার উপক্রম করে বললেন, 'এবার তবে অনুমতি দিন, আমি যাই।'

আলেকজান্ডারের চমক ভাঙল; তিনি চন্দ্রের মুখের পানে এমন-ভাবে চাইলেন, যেন আগে কখনও তাঁকে দেখেননি। তারপর সহসা উচ্চহাস্য করে উঠলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁর মনে যে আত্মগ্লানি এসেছিল তা কেটে গেল। তিনি বললেন, 'যাবে কি রকম? তুমি আমার বন্দী।'

'কিন্তু—'

'তুমি যা বলবে আমি জানি। কিন্তু, যুদ্ধ না করলেও তোমাকে আমি বন্দী করতে পারি, করেছিও। এখন ছেড়ে দেব কেন? কারণ দেখাতে পার?'

চন্দ্র বললেন, 'কারণ এই যে, আমাকে বন্দী রেখে আপনার কোন লাভ নেই। বন্দীকে খেতে-পরতে দিতে হয়, সেটা লোকসান।'

আলেকজাণ্ডাব হাসতে-হাসতে বললেন, 'লোকসান খুব বেশি নয়, তুমি তো মদ খাও না—'

এই পর্যন্ত বলে আলেকজাণ্ডাব থেমে গেলেন, তাঁর মাথায় একটা খেয়ালের উদয় হল। এইরকম দুষ্ট কৌতুক মাঝে-মাঝে তাঁব মাথায় উদয় হত। তিনি বললেন, 'তোমাকে এমনি মুক্তি দেব না, কিন্তু এক শর্তে মুক্তি দিতে পারি—'

'কী শর্ত?'

'তোমাকে মদ খেতে হবে। আমি যত পেয়ালা মদ খাব, তুমিও তত পেয়ালা খাবে। আমি মাটি নেবার আগে তুমি যদি মাটি নাও তাহলে মুক্তি পাবে না, কিন্তু আমি মাটি নেবাব পর তুমি যদি পায়ে হেঁটে আমাব শিবির থেকে বেরিয়ে যেতে পার, তাহলে তুমি মুক্ত। কেউ তোমাকে আটকাবে না।'

চন্দ্রের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

'কিন্তু সম্রাট, আমি যে কখনও মদ খাইনি—'

'তা আমি জানি না। এই শর্ত। তুমি যদি হেবে যাও, তোমাকে আমি বন্দী কবে নিয়ে যাব—এখান থেকে পারস্য, পাবস্য থেকে মিশর, মিশর থেকে ম্যাসিডোনিয়া।—বাজী আছ?'

চন্দ্র দেখলেন, এ-ছাড়া মুক্তির আব উপায় নেই। তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন, মদ তিনি খাবেন, কিন্তু কিছুতেই নেশা হতে দেবেন না—কিছুতেই না। গুরুব কথা তাঁব মনে পড়ল,— বিপদে সংযমই সহায়।

'রাজী আছি।'

তখন এই অদ্ভুত বাজিখেলা আরম্ভ হল—আলেকজাণ্ডার তাঁর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা এই বাজির বিচারক রইলে। যুবকের যদি জিত হয়, তাকে মুক্তি দিও—নিয়ার্কস, তুমি মেপে-মেপে দু'জনেব হাতে পাত্র দাও।'

আলেকজাণ্ডারের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন নিয়ার্কস—বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি এগিয়ে এসে দুটি পাত্রে সমান করে সুরা ঢাললেন, দু'জনের হাতে পাত্র দিলেন।

আলেকজাণ্ডার এবং চন্দ্র চোখে-চোখে চেয়ে পাত্রে চুমুক দিলেন।

* * *

মনের বলে বলীয়ান চন্দ্র গালিচা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমি এখন যেতে পারি?'

নিয়ার্কস আলেকজাণ্ডাবের পানে চাইলেন; দেখলেন, আলেকজাণ্ডার গালিচার উপর গভীর নিদ্রায় অভিভূত। সুরার শূন্য ভৃঙ্গারগুলিও কাত হয়ে পড়ে আছে। নিয়ার্কস চন্দ্রের দিকে চেয়ে

একটু ঘাড় নাড়লেন।

মনের বলে অবশ দেহকে জয় করে চন্দ্র দৃঢ়পদে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন। রাত্রি তখন গভীর। ঝিলম নদীর ঠান্ডা বাতাস তাঁর কপালে লাগল।

মনের বল যার আছে তার কাছে বিষও নির্বিষ হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে তক্ষশিলায় পৌঁছে চন্দ্র গুরুর পদে প্রণাম করলেন।

চাণক্য তখন নিজের কুটিরে বসে অর্থশাস্ত্রের পুঁথি লিখছিলেন, সস্নেহে চন্দ্রের গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

চন্দ্র বললেন, 'দেব, যবন-সম্রাটকে আত্মজয়ের যুদ্ধে পরাজিত করে মুক্তি পেয়েছি।'

সমস্ত কাহিনী শুনে চাণক্য বুঝলেন, শিষ্য জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা লাভ করেছে। বললেন, 'এবার কী করবে?'

চন্দ্র বললেন, 'পাটলিপুত্র যাব। যবন-সম্রাটকে বলে এসেছি, তিনি যদি আবার ভারত আক্রমণ করতে আসেন, ঝিলমের তীরে আমার দেখা পাবেন। তিনি ফিরে আসার আগেই সমস্ত ভারতবর্ষ আমি জয় করব। গুরুদেব, আপনি আমার সহায় হোন।'

চাণক্য বললেন, 'তথাস্তু।'

উভয় সংকট

যে-জায়গায় বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলাম সেটা বাংলা আর বেহারের মাঝামাঝি একটা জায়গা। পাহাড় জঙ্গল আছে, কিন্তু যাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে, অর্থাৎ খাঁটি বাঙালী বাঘ, এখানকার বাসিন্দা নয়। তবে মাঝে-মাঝে দু'একটা ছিট্‌কে এসে পড়ে, অনেকটা বেহার-প্রবাসী বাঙালীর মত।

গ্রামটি বেহারের এলাকার মধ্যে। বেশ বড় গ্রাম, বেশীর ভাগ বাসিন্দা বেহারী। দু'চার ঘর বাঙালীও আছে। বাঙালীরা কয়েক-পুরুষ ধরে এখানে বাস করার ফলে প্রায় বেহারী হয়ে গেছে। মামাকে

মামু বলে, কোঁচা দিয়ে কাপড় পরতে প্রায় ভুলে গেছে। তবে মাথায় পাগড়ীটা এখনও চড়ায়নি।

মোটের ওপর গ্রামের বাঙালী বেহারী অধিবাসীরা তাদের ক্ষেত-খামার গরু-বাছুর নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সোঁদরবন থেকে এক খাঁটি রয়েল বেঙ্গল এসে বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে। গাঁ থেকে মাইল দুই দূরে একটা পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ আছে, বাঘটা দিনের বেলা সেইখানে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রে এসে গ্রামের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। সুবিধে পেলেই গরু ছাগল নিয়ে যায়। এমন কি, কিছুদিন আগে এক সন্ন্যাসী এসে গাঁয়ের এক গাছতলায় ছিলেন, রাত্রে বাঘ এসে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তুলে নিয়ে গেছে।

গাঁয়ে ভারি আতঙ্ক। সূর্যাস্তের পর কেউ ঘর থেকে বেরোয় না। আমি যেদিন বিকেলবেলা গিয়ে পেঁছুলাম, গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই এসে অভ্যর্থনা জানাল, 'হুজুর, বাঘের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।'

সে-রাত্রে আর বাঘের সন্ধানে বেরুলাম না। আমার সঙ্গে আমার চাকর বাবুলাল ছিল, সে শিকারের সময় সর্বদা আমার কাছে থাকে। গ্রামবাসীরা আমাদের জন্যে একটা মেটে-ঘর খালি করে দিল, আমরা সেই ঘরে আস্তানা গাড়লাম।

সন্ধ্যের কিছু আগে আমি আর গ্রামের পাঁচজন ঘরে বসে বাঘের গল্প করছি, কে আমাদের পথ দেখিয়ে বাঘের সন্ধানে নিয়ে যাবে এইসব কথা হচ্ছে, এমন সময় একটি লোক এল, এক গাল হেসে বলল, 'আমার নাম মহিন্দর ঘোষ। আমি বাঙালী আছে।'

মহিন্দরকে দেখে মনে হয় বেশ তুখড় লোক। তার ভাষা একটু তেউড়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রাণটা বাঙালীই আছে। সে মহা উৎসাহে বাঘের নানা কেচ্ছা শোনাতে লাগল। বাঘের নাড়ী-নক্ষত্র তার জানা আছে। বাঘ ক'হাত লম্বা, তার বয়স কত, স্ত্রী-পুত্র আছে কিনা, সব মহিন্দরের নখদর্পণে। তার কথায় জানতে পারলাম, বাঘটি ছ'হাত লম্বা, বয়সে তরুণ এবং ঘোর ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি বাঘকে দেখেছো?'

মহিন্দর বলল, 'তবে আর বলছি কি হুজুর! একদিন ভোরবেলা মাঠে যাচ্ছিলাম, তখনও 'কিরিণ' ওঠেনি, হঠাৎ বাঘটা আমার বগল দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বগল দিয়ে?'

'বিলকুল বগল দিয়ে হুজুর—বিশ হাতও হবে না। আমি তো দেখেই জোরসে ভেগেছি। ভাগ্যে এ-বগলে একটা তালাও ছিল, তাইতে কুদে পড়লাম।'

বুঝলাম, মহিন্দরের বগল মানে বগল নয়—পাশ।

এদিকে সন্ধ্যে হয়-হয় দেখে গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরে গেলেন। মহিন্দর কিন্তু রয়ে গেল। ঠিক হল, কাল সকালে যখন বাঘের সন্ধানে বেরুব তখন মহিন্দর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্রামবাসীরা আমাদের প্রচুর খাবার দিয়েছিল। তাই খেয়ে আমরা সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। ঘরের এক কোণে অনেক খড়ের আঁটি ডাঁই করা ছিল, তাই পেতে মাটিতে মহিন্দর লম্বা হয়ে শুলো।

অনেক রাত্রে একবার বাঘের গম্ভীর গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাঘ যেন দূর থেকে বলছে—তুমি এসেছো আমি খবর পেয়েছি। আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন সকালবেলা আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমার হাতে রাইফেল, কোমরে জলের বোতল ঝুলছে, মহিন্দরের এক হাতে লম্বা বল্লম, অন্য হাতে খাবার ভরা টিফিন-বক্স; বাবুলালের কাঁধে আমার হোল্ডল্ আর হাতে একটা টোটাবন্দুক। শিকারে বেরুবার সময় সব রকম সম্ভাবনার কথা ভেবে তৈরি হয়ে বেরুতে হয়। কারণ, কোথায় কি বিপদ ঘটবে, কোন জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে কিছুই ঠিক নেই। তাই আমার হোল্ডলে বিছানা, টিঞ্চার-আয়োডিন, ব্যান্ডেজ, মোমবাতি প্রভৃতি নানারকম জিনিস থাকে।

তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছি। মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই দূরে প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ল। দেখে মনে হয় যেন একটা উঁচু ঢিবি, তার ওপর আগাছার জঙ্গল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম তখন দেখলাম, শুধু ঢিবি আর জঙ্গল নয়, বেশ একটি সাজানো শহর। ইট-পাথরের বাড়িগুলো ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু পথঘাট এখনও ঠিক আছে। কতদিন আগে এখানে মানুষ বাস করতো কে জানে! মনে হয়, ছয়-সাত শতাব্দী আগে এটা একটা সমৃদ্ধ নগর ছিল, তারপর হয়তো একদিন মহামারী দেখা দিয়েছিল, নগরের ওপর মৃত্যুর করাল ছায়া পড়েছিল। নগরবাসীরা দলে-দলে নগর ছেড়ে পালিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে নগর শূন্য পড়ে আছে আর আস্তে-আস্তে কালের কবলিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের চারিদিকে এমনি কত যে নগরের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে তার শেষ নেই। মহেন্‌জো-দাড়ো, হরপ্পার কথা সবাই জানে, কিন্তু এইসব ছোটখাটো প্রত্নক্ষেত্রের খবর কেউ রাখে না।

সে যাহোক, উপস্থিত আমাদের লক্ষ্য—বাঘ। কিন্তু সঙ্গে অনেক-গুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে, এগুলো ঘাড়ে করে বাঘ

খুঁজে বেড়াবার কোনও মানে হয় না। ভাগ্যক্রমে শহরে ঢুকেই একটা বেশ আস্তানা পাওয়া গেল। একটু উঁচু জমির ওপর পাথরের একটি ঘর, নিরেট গাঁথুনির জোরে এখনও অটুট আছে। এমন কি, তার মরচে-ধরা লোহার দরজা এখনও বন্ধ করা যায়। এই ঘরের মধ্যে আমাদের বাড়তি জিনিসপত্র রেখে কেবল অস্ত্র নিয়ে আমরা বেরুলাম।

সতর্কভাবে ভাঙা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলির ছাদ বেশীর ভাগই ধ্বসে পড়েছে, তবু দু'চারটি ঘর এখনও আস্ত আছে। বাঘটা বোধ হয় এমনি একটা ঘরে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু অনেক ঘুরে বেড়িয়েও বাঘের কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। ভাঙা বাড়ি ভেদ করে যে-সব গাছ গজিয়েছে তার ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে; আর সব নিস্তব্ধ।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে আমরা শহরটাকে চষে ফেললাম, কিন্তু তবু বাঘের দেখা নেই। মাঝে-মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করলাম কিন্তু বাঘের ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। সন্দেহ হল, বাঘ সত্যি আছে তো?

মহিন্দরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে, তোমার বাঘ কোথায়?'

মহিন্দর বলল, 'আছে হুজুর। আমাদের দেখে বোধহয় সরম পেয়েছে, তাই সামনে আসছে না।'

ভাবলাম, ভারি লাজুক বাঘ তো! কিন্তু আমাদের দেখে এত লজ্জা কেন? আমরা তো আর তার ভাশুর নই!

আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর এক জায়গায় এসে হঠাৎ একটা পচা গন্ধ নাকে এল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঘের গা থেকে যে বোট্‌কা গন্ধ বেরোয়, এ-গন্ধ সে-গন্ধ নয়; পচা হাড়-গোড়ের দুর্গন্ধ।

আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে জলের একটা কুণ্ডের মত ছিল। মাটি ফুঁড়ে জল বেরুচ্ছে; পুরাকালে এটা হয়তো একটা উৎস ছিল, নগরের মেয়েরা জলাধার থেকে জল ভরে নিয়ে যেত। এখন জলাধার নেই, কিন্তু উৎস থেকে এখনও ক্ষীণধারায় জল বেরিয়ে চারিদিকের মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু দুর্গন্ধ আসছে কোথা থেকে? হাড়গোড় কোথাও দেখতে পেলাম না। তখন বাতাসের গতি অনুসরণ করে যেদিক থেকে গন্ধটা আসছে সেইদিকে চললাম। রাইফেলে সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌ টিপে রাখলাম; যদি বাঘ দেখতে পাই সঙ্গে-সঙ্গে ফায়ার করবো।

আন্দাজ পঞ্চাশ গজ যাবার পর বুঝতে পারলাম, গন্ধটা আসছে অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর থেকে। ঘরের দরজার জায়গায় একটা

বড়গোছের ফুটো। আমরা বন্দুক বাগিয়ে পা টিপে-টিপে গিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, সামনেই একটা মানুষের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে।

কঙ্কালটায় এখনও অল্প-অল্প মাংস লেগে আছে। এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, মুণ্ডুটা একপাশে গড়িয়ে পড়েছে। তাতে মাংসের লেশমাত্র নেই, কিন্তু জটার মত খানিকটা চুল মাথায় লেগে আছে।

মহিন্দর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'আরে, এ তো আমাদের সাধু মহারাজ!'

আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। বিশ্বাস হল, বাঘ তাহলে আছে।

কিন্তু কোথায় বাঘ? এই ভাঙা শহরের গোলক-ধাঁধার মধ্যে তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল। ভয় হতে লাগল, বাঘ মারতে এসে শেষে বাঘের হাতেই না মারা পড়ি। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু সে হয়তো আমাদের ওপর নজর রেখেছে।

আমার আন্দাজ যে মিথ্যে নয় তা কিছুক্ষণ পরেই টের পেলাম। ঠাকুরের কঙ্কাল দেখে যে-পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে যাচ্ছি, প্রস্রবণের ভিজে জায়গায় এসে লক্ষ্য করলাম—পাশাপাশি দুটো প্রকাণ্ড থাবার দাগ! তাজা দাগ, আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন এ দাগ ছিল না।

এর মানে, বাঘ জানতে পেরেছে যে আমরা এসেছি এবং নিজে আড়ালে থেকে আমাদের অনুসরণ করছে। আমরা যখন উঁকি মেরে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেহাবশেষ নিরীক্ষণ করছিলাম, বাঘ তখন এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছিল।

মহিন্দরকে বললাম, 'হুঁশিয়ার মহিন্দর, বাঘ পিছু নিয়েছে।'

মহিন্দর খৈনি খায়; এক চিম্‌টি খৈনি মুখে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'আমি হুঁশিয়ার আছি হুজুর। হাতে যতক্ষণ বল্লম আছে, ততক্ষণ মহিন্দর ঘোষ বাঘের নানাকেও ভয় করে না।'

মহিন্দর সাহসী লোক বটে। নিজের কথা বলতে পারি, রাইফেলের বদলে শুধু একটা বল্লম নিয়ে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবার সাহস আমার হত না।

এদিকে বেলা দুপুর হয়েছে; পেট জ্বল্‌তে আরম্ভ করেছে। আমরা আস্তানায় ফিরে চললাম। মাঝে-মাঝে হঠাৎ পিছু ফিরে দেখতে লাগলাম, বাঘ পিছনে আসছে কিনা। কিন্তু বাঘকে দেখতে পেলাম না।

আস্তানায় পৌঁছে আমরা টিফিন-বক্স নিয়ে বাইরে এলাম। ঘরের সামনে বেশ একটি পাথর-বাঁধানো দাওয়া; বাবুলাল কম্বল পেতে দিল। তার ওপর সকলে খেতে বসলাম।

এখানে বসে সামনের দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক দাওয়ার নীচে একপাশে একটা কুয়া; গোল করে পাড় বাঁধানো। আগে বোধহয় গভীর ছিল, এখন মজে গিয়ে আট-নয় হাত নীচু একটা গর্ত আছে মাত্র, জল নেই। পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে; রাস্তার ওপর সামান্য কাঁটা গাছ গজিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে দৃষ্টি আটকায় না। বাঘ যে গা-ঢাকা দিয়ে কাছে এসে পড়বে সে ভয় নেই। পিছন দিকে ঘর; সেদিক দিয়েও বাঘের আচমকা আক্রমণ আশঙ্কা করা যায় না। জায়গাটি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পক্ষে বেশ নিরাপদ। কিন্তু তবু চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে আমরা খেতে লাগলাম। বন্দুক হাতের কাছে রইল।

প্রচুর খাবার ছিল; তিনজনে মিলেও শেষ করতে পারলাম না। জল খেয়ে একটা সিগারেট ধরাবো মনে করছি এমন সময় বাঘকে প্রথম দেখতে পেলাম।

সামনে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা চৌমাথার মত ছিল, তারই পাশের দিকের গলি দিয়ে বাঘটা বেরিয়ে এল। কী তার চলার ভঙ্গী —যেন রাজপুত্তুর। চৌমাথার মাঝখান পর্যন্ত এসে আমাদের দিকে চোখ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড শরীর; কালো ডোরা-কাটা সোনালী গায়ে আলো পিছলে পড়ছে। আমাদের পানে এমন-ভাবে তাকিয়ে রইল যেন আমাদের ধৃষ্টতা দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে।

বন্দুক নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাগ্ করে বন্দুক ফায়ার করবার আগেই সে যেদিক দিয়ে এসেছিল তার উল্টো দিকে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু একটা চাপা কাশির মত আওয়াজ শুনতে পেলাম—গ্যাঁক!

কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মহিন্দর বলল, 'সাধুবাবাকে খেয়ে কি রকম তাগ্ড়া হয়েছে দেখলেন? গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।'

আমরা আবার কম্বলের ওপর বসলাম। পরামর্শ করে একটা প্ল্যান ঠিক করতে হবে; সবাই মিলে একসঙ্গে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালে কোনও লাভ হবে না। পরামর্শে ঠিক হল, বাবুলাল তার বন্দুক নিয়ে এই ঘরে লুকিয়ে থাকবে, যদি বাঘ দেখতে পায় গুলি করবে। আর আমরা দু'জনে বেরুব। আমি সামনে নজর রাখব, আর মহিন্দর রাখবে পিছন দিকে। সন্ধ্যের আগে যদি বাঘের দেখা পাই ভালোই, নইলে আজ ফিরে যেতে হবে।

দু'জনে বেরুলাম। আমি আগে-আগে আর মহিন্দর আমার কয়েক পা পিছনে।

এবার বাঘের দেখা অনেকবার পেলাম। কিন্তু সে দেখা এতই ক্ষণিকের দেখা যে, বন্দুক তোলবার অবসর পাওয়া যায় না। কখনও একটা ভাঙা বাড়ির পাশ থেকে তার প্রকাণ্ড মুণ্ডুটা দেখতে পাই; কখনও ঝোপঝাড়ের মধ্যেই সোনালী বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে সে মিলিয়ে যায়। যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

একবার একটা মোড় ঘুরে দেখলাম, বাঘ একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; আমাদের দেখেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবলাম, এইবার পেয়েছি। ঘরের মধ্যে যখন ঢুকেছে তখন যাবে কোথায়? বেরুতে হবে তো!

দরজা থেকে হাত-পঁচিশ দূরে একটা ইটের স্তূপের পিছনে লুকিয়ে বসলাম; বন্দুক বাগিয়ে এমনভাবে বসলাম যাতে বাঘ বেরুলেই গুলি করতে পারি। মহিন্দর আমার পিছনে বসল।

দশ মিনিট বসে আছি; বাঘ ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। ভাবছি, কী হল? হঠাৎ মহিন্দর 'ঐ ঐ' বলে চীৎকার করে উঠল।

চমকে ফিরে দেখি, বাঘটা প্রায় ত্রিশ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফিরতেই একটু মুচ্‌কি হেসে লুকিয়ে পড়ল।

ভাগ্যিস মহিন্দর পিছন দিকে নজর রেখেছিল, নইলে বাঘটা মষ্টে-মষ্টে এসে ঘাড় মট্‌কাতো। কী ভয়ানক ধূর্ত বাঘ!

হঠাৎ সন্দেহ হল, দু'টো বাঘ নেই তো! কিন্তু দু'টো মদ্দা বাঘ তো কখনো একসঙ্গে থাকে না। তবে কি একটা বাঘিনী?

মহিন্দব বলল, 'হুজুর একটাই বাঘ। আমি ওর চেহারা চিনি। নিশ্চয় ঘর থেকে বেরুবার অন্য বাস্তা আছে। একেবারে ছিপে রুস্তম বাঘ। আমাদের সঙ্গে দিল্‌লগি করছিল।'

মারাত্মক দিল্‌লগি! ইয়ার্কিরও তো মাত্রা আছে!

এদিকে দিন ফুরিয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আব বেশীক্ষণ বাঘের পিছনে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। সন্ধ্যের পর এখানে থাকা মানেই, বাঘকে নৈশ-ভোজনের নেমন্তন্ন করা।

আমরা আস্তানার দিকে ফিরে চললাম। কাল আবার আসতে হবে। ছাগল না বাঁধলে এ-বাঘ মারা যাবে না।

মনে-মনে কালকেব প্ল্যান ভাবতে-ভাবতে চলেছি, হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপার ঘটে সব প্ল্যানই উল্টে গেল। অন্যমনস্কভাবে উঁচু-নীচু জায়গায় পা ফেলে পা গেল মচ্‌কে। প্রথমটা তেমন কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু দু'চার পা হাঁটতে-না-হাঁটতেই পা ভীষণ ফুলে উঠল। এমন অবস্থা হল যে, পা মাটিতে ফেলতে পারি না। তার ওপর বাঘের ভয়। অতি কষ্টে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে যখন আস্তানায় পৌঁছলাম তখন সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু।

ভেবে দেখলাম, খোঁড়া পা নিয়ে আজ আমার পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মাঠের মাঝখানেই রাত হয়ে যাবে, তখন বাঘের খপ্পরে পড়বো। যত অন্ধকার হবে, বাঘের চোখের জ্যোতি তত বাড়বে, আমাদের চোখের জ্যোতি কমবে। তখন আর বাঘকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারচেয়ে এই ঘরটা আছে, লোহার দরজা বেশ মজবুত, এখানেই রাত কাটাবো।

মহিন্দর আর বাবুলালকে ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে শেষে বললাম, 'তোমরা দু'জনে গাঁয়ে ফিরে যাও, আমি আজ রাত্রে এই ঘরেই থাকবো।'

মহিন্দর শিউরে উঠে বলল, 'একি কথা বলছেন হুজুর! এই সুন্সান্ জায়গায় একলা থাকবেন? বাঘ তো আছেই, তার ওপর যদি ভূত ঘাড়ে চেপে বসে?'

আমি বললাম, 'ভূতের চেয়ে বাঘকেই আমার ভয় বেশী। কিন্তু এ-ঘরে থাকলে বাঘ কিছু করতে পারবে না।'

বাবুলাল বেশী কথা কয় না, সে শুধু বলল, 'আমিও থাকি।'

আমি বললাম, 'না, তুমিও ফিরে যাও। প্রথমত, যা খাবার আছে তাতে দু'জনের কুলোবে না। তারপর মহিন্দরের পক্ষে শুধু বল্লম নিয়ে এতটা পথ একলা যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি একটা বন্দুক নিয়ে সঙ্গে থাকলে দু'জনেই নিরাপদ হবে। কাল সকালেই আবার ফিরে এসো।'

বাবুলাল আর আপত্তি করল না। হোল্ড্ল খুলে ঘরের এক কোণে আমার বিছানা পেতে দিল।

যাবার সময় মহিন্দর আমার কানে-কানে বলে গেল, 'হুজুর, যদি গড়্বড়্ দেখেন, রাম-নাম করবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা। আর দেখ, নিজেদের জন্যে খাবার তো আনবেই, বাঘের জন্যেও একটা বড় দেখে পাঁঠা নিয়ে এসো।'

মহিন্দর আর বাবুলাল বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমে অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছে দেখে আমি ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। এই মৃত-নগরীর একটি কুঠুরীর মধ্যে আমাকে একলা রাত্রি কাটাতে হবে, তা কে জানতো? কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানতাম না। সে-রাত্রিটা যে কী ভয়ঙ্কর রাত্রি ছিল তা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসলাম। সঙ্গে এক শিশি মালিশ ছিল, তাই পায়ে ঘষতে লাগলাম। মচ্কানোর বেদনা এম্নিতে বেশী কষ্টদায়ক নয়, কিন্তু উঠে হেঁটে বেড়ালেই ব্যথা লাগে। আজ রাত্রিটা বিশ্রাম পেলে কাল নিশ্চয় অনেক কমে যাবে।

রাত্রি হল। ক্লান্ত শরীর নিয়ে মিছিমিছি জেগে থাকার মানে হয় না। খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ঘরটা একবার ঘুরে দেখে নিলাম। ঘরে সাপখোপ কিছু নেই। দেওয়ালে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি আছে, কিন্তু তা দিয়ে বাঘ তো দূরের কথা, বেড়ালও ঢুকতে পারে না। ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে তাকালাম, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝি'র ঐক্যতান ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না।

সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লাম। মোমবাতিটা জ্বালা রইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল জানি না, বোধ হয় তখন দুপুর রাত্রি। চোখ খুলে দেখি, মোমবাতিটা শেষ হয়ে গিয়ে খাবি খাচ্ছে, নিভতে আর দেরি নেই। তারপরই যা চোখে পড়ল তা দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

না না, বাঘ নয়। দেখলাম, আমার বিছানা থেকে তিন চার হাত দূরে মেঝের ওপর একটা মানুষ ডন্ ফেলছে। তার কোমরে কেবল একটা নেংটি, গায়ে ছাই মাখা, মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় জটা—সে ক্রমাগত ডন্ ফেলছে আর ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে আমার পানে তাকাচ্ছে। তার চোখ দেখেই বুঝলাম, ইহলোকের মানুষ নয়। জ্যান্ত মানুষের দৃষ্টি অমন হয় না।

তারপর মোমবাতিটা একবার শেষ খাবি খেয়ে নিভে গেল।

ভয়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। বিছানার ওপর শক্ত হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন ভূত? চেহারা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত। তবে কি এ সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রেতাত্মা? কিন্তু তিনি রাত দুপুরে আমার ঘরে ঢুকে ডন্ ফেলছেন কেন?

ঘুলঘুলি দিয়ে একটু চাঁদের আলো আসছিল, বাইরে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছু দেখা যায় না। যে এসেছিল, সে আছে না চলে গেছে? কিছুক্ষণ পরে সাহসে ভর করে ডাকলাম, 'কে? কে তুমি?'

কোনও সাড়াশব্দ নেই—সব নিস্তব্ধ।

তখন একটু সাহস বাড়ল। ভাবলুম, ঘুম-চোখে ভুল দেখিনি তো?

আর একটা মোমবাতি জ্বাললাম। যিনি ডন্ ফেলছিলেন তিনি নেই। মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘরের চারিদিক ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। লোহার দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ আছে।

ভূতই হোক আর চোখের ভুলই হোক, সাবধান থাকা দরকার। বাতিটা মাথার কাছে রেখে আবার বিছানায় শুলাম। রাইফেলে টোটা ভরে হাতের কাছে রাখলাম।

 কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পর চোখ বুজে আসতে লাগল। এমন

সময় ছাদের কাছ থেকে একটা টিক্‌টিকি ডাকল—ঠিক-ঠিক-ঠিক!

চমকে ঘাড় তুললাম। নজর পড়ল ঘুলঘুলিটার ওপর। দেখি, ফুটো দিয়ে একটা কোনও জন্তু ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। রাইফেল তুলে সেইদিকে লক্ষ্য করলাম। তারপর যা দেখলাম তাতে বন্দুকটা প্রায় আমার হাত থেকে খসে পড়ল। জন্তু নয়, সন্ন্যাসীর জটাসুদ্ধ মাথাটা ঘুলঘুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে—

আমি কাঠ হয়ে বসে দেখছি, ক্রমে সেই ছোট্ট ফুটো দিয়ে সন্ন্যাসীর কোমর পর্যন্ত বেরিয়ে এল। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! দেওয়াল থেকে একটা মানুষের ধড় বেরিয়ে আছে, নীচের দিকটা যেন দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে।

সন্ন্যাসী আমার পানে চেয়ে আছে, আর হাত-মুখ নেড়ে আমাকে যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে! মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে যেন কিছু বলছে; তার ঠোঁট নড়ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কথা শুনতে পাচ্ছি না দেখে সন্ন্যাসী ঘুলঘুলি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। আমি বন্দুক তুলে ফায়ার করলাম।

বন্ধ ঘরে বন্দুকের আওয়াজ বোমা ফাটার শব্দের মত শোনালো। কিন্তু সন্ন্যাসীর কিছুই হল না। সে দু'হাত নাড়াতে নাড়াতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি এবার বন্দুক ফেলে লাফিয়ে উঠলাম। চীৎকার ছেড়ে দরজা খুলে বাইরের দিকে ছুটলাম।

কিন্তু বাইরেই কি উদ্ধার আছে? আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে; দাওয়া থেকে নেমেছি, দেখি হাত পঁচিশ দূরে বাঘটা থাবা গেড়ে বসে আছে!

সেই যে কথায় বলে, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, আমার সেই অবস্থা। ঘরে ভূত, বাইরে বাঘ। এখন আমি যাই কোথায়?

বাঘটা আমায় দেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক-পা এক-পা করে এগুতে লাগল।

আমার তখন বাহ্যজ্ঞান বেশী নেই; অন্ধের মত পাশের দিকে পালাতে গিয়ে হোঁচট্ খেলাম। তারপর মনে হল যেন গভীর গর্তে পড়ে যাচ্ছি।

গর্তটা কিন্তু বেশী গভীর নয়। দাওয়ার পাশে যে কুয়া আছে তা ভুলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, নিতান্তই ভাগ্যবলে কুয়ায় পড়েছি।

পড়ার ঝাঁকানিতে বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরে পেলাম। কুয়ার তলায় নরম মাটি ছিল, হাত-পা ভাঙেনি। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, সবুজ কাচের মত জোৎস্না-ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে।

মনে হল, ভগবান যা করেন ভালোর জন্য। কুয়ায় পড়া এমন কিছু সৌভাগ্য নয়, আমার ভাগ্যে শাপে বর হয়েছে। ঘরের ভূত আর বাইরের বাঘ কেউই এখানে নাগাল পাবে না।

পায়ের মচ্‌কানো ব্যথাটা এতক্ষণ টের পাইনি; এখন আবার টন্‌টন্‌ করতে আরম্ভ করেছে। তা করুক। কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সকালে বাবুলাল আর মহিন্দর আসবে—

কুয়ার দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে এইসব কথা ভাবছি, হঠাৎ ওপর দিকে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখি—ও বাবা! বাঘের হাঁড়ির মত মাথাটা কুয়ার কিনারা থেকে উঁকি মারছে!

আমি হলফ্‌ নিয়ে বলতে পারি, কোনও শিকারীর এরকম অবস্থা কখনও হয়নি। শিকারী কুয়ার মধ্যে বসে আছে আর বাঘ ওপর থেকে তার মস্তক আঘ্রাণ করছে, এ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন। বাঘটা কয়েকবার নুলো বাড়িয়ে আমাকে বোধহয় অশীর্বাদ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুখের বিষয়, আমার মাথার নাগাল পেল না।

বাঘ যে কুয়াতে লাফিয়ে পড়বে সে ভয় নেই। বাঘ ভারি চালাক, সে জানে একবার এ গর্তে পড়লে আর উঠতে পারবে না। আমি নিশ্চিন্ত মনে ওপর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম—আহা, বন্দুকটা যদি ঘরে ফেলে না আসতাম! এখান থেকে বাঘকে গুলি করা তো ছেলেখেলা। বাঘ যেন গুলি খাবার জন্যই মুণ্ডু বাড়িয়ে আছে!

যাহোক, রাতটা এইভাবেই কাটল। বাঘ সারারাত্রি আমার মস্তক আঘ্রাণ করে শেষে ভোর হচ্ছে দেখে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেল।

সকালে বাবুলাল আর মহিন্দর এল। আমাকে কুয়া থেকে তুলল।

রাত্রির সমস্ত ব্যাপার শুনে মহিন্দর বলল, 'হুঁ, সাধুবাবাই বটে। আপনি যদি রাম-নাম করতেন তাহলে আর কোনও বখেড়া হত না।'

বললাম, 'রাম-নামের কথা মনে ছিল না।' নিজের নামটাই যে ভুলে গিয়েছিলাম সে-কথা আর বললাম না।

মহিন্দর বলল, 'যাহোক, সাধুবাবা কি বল্‌তে চান তা আমি বুঝেছি।'

'কী বুঝলে?'

'সাধুবাবার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে; তাতে আত্মার সদ্‌গতি হয়নি। তাই তিনি আপনাকে সম্‌ঝাবার চেষ্টা করছিলেন, যেন তাঁর অস্থিগুলো সমাধি দেওয়া হয়। সাধুদের দেহ পোড়াতে নেই, সমাধি

দিতে হয়।'

এই সময় টিক্‌টিকি ডেকে উঠল—ঠিক-ঠিক-ঠিক।

মহিন্দর আঙুল তুলে বলল, 'শুনলেন তো! আপনি কিছু ফিকির করবেন না, সাধুবাবার ক্রিয়াকর্ম আমি করবো। কিন্তু বাঘের ব্যবস্থা কী হবে? বক্‌রা তো এনেছি।'

আমি রাত্রে বসে বসে বাঘ মারার যে প্ল্যান করেছিলাম, তাই বললাম।

তারপর আর কী? বাঘ মারতে একটুও কষ্ট হল না। দিনটা ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটালাম। তারপর যেই সন্ধ্যে হল, অমনি বাবুলাল আর মহিন্দর আমাকে কুয়ায় নামিয়ে দিলে। আজ আমার সঙ্গে রইল রাইফেল এবং ছাগল।

ক্রমে রাত্রি হল, আকাশে চাঁদ উঠল।

আমি মাঝে-মাঝে ছাগলকে কাতুকুতু দিচ্ছি আর সে ম্যা-ম্যা করে ডাকছে।

তারপর ব্যাঘ্রমশাই এসে কুয়ার কিনারা থেকে উঁকি মারলেন। রাইফেল হাতেই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি।

বাঘ যতই ধূর্ত হোক, বুদ্ধিতে সে মানুষের সমকক্ষ নয়। সে রাত্রে বাঘকে খুব সহজেই মেরেছিলাম। কিন্তু এই বাঘ-মারা সম্পর্কে আমার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা জীবনে ভুলবো না। একসঙ্গে বাঘ এবং ভূতের পাল্লায় পড়া বড় সহজ কথা নয়।

স্যমন্তক

[আজ থেকে আন্দাজ সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার ঐতিহাসিক কাহিনী লিখছি। শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে ছিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা অবতার বলে জানি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। তখন কিন্তু তিনি অবতার বলে পরিচিত হননি। মানুষ কৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের গল্প।]

এক

দ্বারকা-পুরীতে ভারি হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। সকলের মুখে এক কথা—বৃষ্ণিবংশীয় সত্রাজিৎ নাকি এক অদ্ভুত মণি পেয়েছেন। মণির

নাম—স্যমন্তক। সত্রাজিৎ জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন, সেখানে এই মণি পেয়েছেন। মণির আশ্চর্য গুণ। সত্রাজিৎ সামান্য গৃহস্থ ছিলেন, মণি পাবার পর রাতারাতি তাঁর কপাল ফিরে গেছে। এখন তিনি মস্ত বড়মানুষ, ধনধান্যে তাঁর গৃহ পূর্ণ। নগরীতে সত্রাজিতের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

দ্বারকায় তখন যাদবেরা রাজ্য পেতেছেন। আগে মথুরায় তাঁদের রাজত্ব ছিল, কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধের আক্রমণে মথুরা ছেড়ে তাঁদের চলে আসতে হয়েছে। এখানে আর্যাবর্তের অপরান্তে পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল এবং মরুভূমি-বেষ্টিত হয়ে তাঁরা একরকম নিরুপদ্রবে আছেন।

যাদবেরা সকলেই যদুর বংশধর; কিন্তু বর্তমানে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, একই পুরীতে থাকলেও সকলে সকলকে চিনতেন না। তাঁদের রাজা ছিল না; প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষদের নিয়ে একটা পৌর-পরিষৎ ছিল; তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কাজ চালাতেন। কিন্তু আসলে যাদবদের নায়ক ছিলেন —কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ বয়সে তরুণ, কিন্তু যাদবদের মধ্যে অতুল তাঁর প্রতিপত্তি। যদুবংশে শূর-বীর অনেক ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। কৃষ্ণ মহা দুষ্ট কংসকে বধ করেছিলেন; কৃষ্ণই অপূর্ব কৌশলে জরাসন্ধের চোখে ধুলো দিয়ে যাদবদের মথুরা থেকে দ্বারকায় এনে-ছিলেন। তাই কৃষ্ণের কথায় দ্বারকার লোক উঠত-বসত। কৃষ্ণ যা বলতেন, পৌর-পরিষৎ তাই মেনে নিত।

সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি পাওয়ার কথা কৃষ্ণের কানে এল। তাঁর কৌতূহল হল; ভাবলেন, দেখে আসি কেমন মণি! তিনি দাদা বলরামকে গিয়ে বললেন, 'দাদা, স্যমন্তক মণি দেখতে যাবে?'

বলরাম তখন রসের একটি ভাণ্ড নিয়ে বসেছিলেন; এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, দ্বারকার উপকণ্ঠে মরু-বালুকার উপর ফুটি আর কাঁকুড় ফলানো যায় কি না। বলরাম কৃষ্ণের দাদা হলেও, কৃষ্ণের মত ধীরবুদ্ধি লোক ছিলেন না, গোঁয়ার-গোছের ছিলেন। তার উপর তাঁর একটি দোষ ছিল,-তিনি সর্বদাই নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। মনের আনন্দে বারুণী পান করা আর অবসর-কালে কৃষি নিয়ে মাথা ঘামানো, এই ছিল তাঁর কাজ। কৃষির দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল, তাই তাঁর এক নাম—সংকর্ষণ; লাঙল ছিল তাঁর লাঞ্ছন।

কৃষ্ণের কথা শুনে বলভদ্র বললেন, 'স্যমন্তক মণি দেখে কী হবে? তার চেয়ে যদি মরুভূমিতে ফুটি আর কাঁকুড় ফলাতে পারা যায়—'

কৃষ্ণ হেসে একাই চললেন। দুই ভাই একই প্রাসাদে থাকেন, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

কৃষ্ণ রথে চড়লেন; সারথি দারুক রথ চালিয়ে নিয়ে চলল। সত্রাজিৎ বয়স্থ ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের অল্প পরিচয় ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ আগে কখনও তাঁর বাড়িতে যাননি।

কৃষ্ণের রথ যখন সত্রাজিতের গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াল, তখন গৃহের দ্বার খুলে একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। ইনি সত্রাজিতের মেয়ে সত্যভামা। কৃষ্ণকে তিনি আগে দেখেননি, কিন্তু রথের গরুড় ধ্বজা দেখে চিনতে পারলেন। নম্র স্মিত-মুখে বললেন, 'আসুন আর্য। স্যমন্তক মণির প্রসাদে আজ আমার পিতৃগৃহে আপনার পদধূলি পড়ল।'

কৃষ্ণ বললেন, 'দেবি, স্যমন্তক মণি দেখতেই এসেছিলুম, কিন্তু আর্য সত্রাজিতের গৃহে যে আরও একটি রত্ন আছে তা জানতুম না। আমি ধন্য!'

দু'জনেরই দু'জনকে খুব ভাল লাগল; সত্যভামা কৃষ্ণকে পিতার কাছে নিয়ে গেলেন।

সত্রাজিৎ ছিলেন সন্দিগ্ধচিত্ত লোক, তার উপর কৃপণ। কৃষ্ণকে তিনি আদর আপ্যায়ন খুবই করলেন; পালঙ্কে বসিয়ে তাম্বুল কেশর কুঙ্কুম চন্দন উপহার দিলেন। কিন্তু তাঁব মনে খটকা লাগল। ইতিমধ্যে স্যমন্তক মণি দেখবার জন্য অনেক যদু-প্রধান তাঁর বাড়িতে এসেছেন, অক্রুর, কৃতবর্মা, শতধন্বা প্রভৃতি শূর-বীর এসে মণি দেখে গেছেন, সত্রাজিতের মনে শঙ্কা হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণকে দেখে তিনি ভাবলেন, এ আবার কী! কৃষ্ণ মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি; মণি দেখে তাঁর যদি পছন্দ হয় এবং তিনি যদি মণি চেয়ে বসেন, তবেই তো সর্বনাশ! সত্রাজিৎ মনে-মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

যাহোক, কৃষ্ণ যখন মণি দেখতে চাইলেন তখন সত্রাজিৎ তাঁকে পূজা-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মণি দেখালেন। মন্দিরে সোনার সিংহাসনে পট্টাসনের উপর মণি শোভা পাচ্ছে। পরিপক্ক জম্বুফলের ন্যায় গাঢ় বর্ণ; দ্যুতিময় বিদ্যুৎ-গর্ভ মণি, তার ভিতর থেকে যেন আগুনের প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে!

মণি দেখে কৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন; কিন্তু সেটা আত্মসাৎ করবার কথা তাঁর মনেও এল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ অপূর্ব মণি আপনি কোথায় পেলেন?'

সত্রাজিৎ থতমত খেয়ে বললেন, 'আমি মৃগয়া করতে গিয়েছিলাম, বনে আমার ইষ্টদেবতা সূর্যদেব কিরাত রূপ ধরে আমাকে এই মণি উপহার দিয়েছেন।'

কৃষ্ণ একটু হাসলেন। বুঝলেন, সত্রাজিৎ মৃগয়া করতে গিয়ে কোনও বন্য শিকারীর কাছে ঐ মণি দেখেছিলেন, তারপর ছলে-বলে সেটি সংগ্রহ করেছেন।

অতঃপর কৃষ্ণ রথে চড়ে ফিরে চললেন, সত্যভামা গৃহ-দেহলি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। রথে যেতে-যেতে কৃষ্ণের মনে কিন্তু স্যমন্তক মণির চেয়ে সত্যভামার স্নিগ্ধ মধুর মূর্তিটি বেশি জেগে রইল। তাই সারথি দারুক যখন প্রশ্ন করল, 'আর্য, কেমন মণি দেখলেন?' তখন কৃষ্ণ সত্যভামার কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'পরমা সুন্দরী!'

ওদিকে সত্যভামাও কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মনে-মনে কৃষ্ণকে বরণ করলেন।

সত্রাজিতের মনে কিন্তু সুখ নেই। যদিও কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি নিতে চাননি, তবু সত্রাজিৎ মনে শান্তি পেলেন না। তাঁর সন্দেহ হল, মণি দেখে কৃষ্ণের লোভ হয়েছে; কিন্তু কৃষ্ণ মানী লোক, তাই ভিক্ষা চাইতে পারেননি, নিশ্চয় কৌশলে মণি অপহরণ করবার চেষ্টা করবেন।

ভেবে-চিন্তে সত্রাজিৎ এক মতলব বার করলেন। তাঁর এক ভাই ছিল, তার নাম—প্রসেন। সত্রাজিৎ প্রসেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তারপর গভীর রাত্রে প্রসেন স্যমন্তক মণি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, ঘোড়ার পিঠে চড়ে নগরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সত্রাজিতের বাড়িতে তুমুল কাণ্ড! সত্রাজিৎ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন যে, কাল রাত্রে চোর এসে তাঁর স্যমন্তক মণি চুরি করে নিয়ে গেছে। সত্যিই সকলে দেখল, মণি নেই, মন্দিরের সিংহাসন শূন্য।

কিন্তু কে চুরি করল? সেকালে চুরির দণ্ড এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, কেউ চুরি করতে সাহস করত না। বিশেষত দ্বারকায় সকলেই যাদব, চুরি করলে যাদব ছাড়া আর কে চুরি করতে পারে! যাদবের পক্ষে এটা ভারি কলঙ্কের কথা। তাই নগরে ভারি সোরগোল পড়ে গেল। সকলে সত্রাজিতকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'কে চোর? কার উপর তোমার সন্দেহ হয়?'

সত্রাজিৎ অবশ্য স্পষ্টভাবে কারুর নাম করলেন না, প্রকারান্তরে এমন ইসারা-ইঙ্গিত দিতে লাগলেন যাতে মনে হয়, চুরির ব্যাপারে কৃষ্ণের হাত আছে। কৃষ্ণ মণি দেখতে এসেছিলেন, মণি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছিল, তারপর—চোরকে কেউ তো চোখে দেখেনি—কিন্তু,

—ইত্যাদি।

দু'-তিন দিন কেটে গেল, চুরির কোনও কিনারা হল না। কিন্তু কৃষ্ণের নামে নগরে কানাকানি আরম্ভ হল। শেষে কথাটা বেশ পল্লবিত হয়ে কৃষ্ণ-বলরামের কানে পৌঁছল।

শুনে বলরাম তো রেগেই আগুন! ঘোর গর্জন করে বললেন, 'এতবড় স্পর্ধা! আজ সত্রাজিতের ভিটে-মাটি লাঙল দিয়ে চষে ফেলব!'

কৃষ্ণ বললেন, 'দাদা, তুমি ঠান্ডা হও। আমি এর ব্যবস্থা করছি।'

কৃষ্ণ আবার সত্রাজিতের বাড়িতে গেলেন। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সন্দেহ করেন, আমি আপনার মণি চুরি করেছি?'

সত্রাজিৎ চতুর লোক, তিনি কৃষ্ণের হাত ধরে বললেন, 'না না, সেকি কথা! আমি তো কিছু বলিনি, তবে পাঁচজনে পাঁচ কথা কইছে—।'

তারপর কৃষ্ণ সত্রাজিতকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু চুরি সম্বন্ধে এমন কিছুই জানতে পারলেন না, যা থেকে চোরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময় কৃষ্ণ দেখলেন, পাশের উদ্যানের এক লতামণ্ডপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেবী সত্যভামা হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছেন। কৃষ্ণ ত্বরিতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সত্যভামার চোখে জল। কৃষ্ণ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে বললেন, 'আর্য, আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। তিনি আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছেন।'

তারপর সত্যভামা সত্য ঘটনা কৃষ্ণকে বললেন। শুনে কৃষ্ণ বললেন, 'দেবি, আপনার সত্যভামা নাম সার্থক। এ কথা গোপন রাখতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু আমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটেছে: যতক্ষণ সত্য কথা প্রকাশ না হবে ততক্ষণ আমার কলঙ্ক ঘুচবে না।'

সত্যভামা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমি প্রকাশ্যে পিতার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারব না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। সত্য আপনিই প্রকাশ পাবে।'

দুই

গৃহে ফিরে এসে কৃষ্ণ কাউকে কিছু বললেন না, কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যাত্রা করলেন। দাদাকে বলে গেলেন, 'শিকারে যাচ্ছি।'

দ্বারকা-নগরীকে পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে ঘিরে রেখেছে রৈবতক

গিরিশ্রেণী। পাহাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে প্রবেশদ্বার। বাইরে মরুভূমি আর জঙ্গল। কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে এলেন। তাঁরা ঘোড়ার পিঠে এসেছেন, কারণ, যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তার পক্ষে রথ উপযোগী নয়।

বাইরে একদিকে ধু-ধু মরুভূমি, অন্যদিকে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে পশুপক্ষীর সঙ্গে দু'-চার গোষ্ঠী বনচর আদিম মানুষ বাস করে; আর মরুভূমিতে বাস করে—সিংহ। এইখানেই সত্রাজিতের ভাই প্রসেন কোথায় লুকিয়ে আছে খুঁজে বার করতে হবে।

সকলে মিলে ইতস্তত খুঁজে বেড়াতে লাগল। চার-পাঁচ যোজন যাবার পর কৃষ্ণ দেখলেন, মরুভূমি আর জঙ্গলের সন্ধিস্থলে একটা ঘোড়া আর আরোহী মরে পড়ে আছে। তাদের ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে, মরুভূমির সিংহের হাতে তারা প্রাণ দিয়েছে।

মানুষটা যে প্রসেন, তা তার বস্ত্রাদি থেকে সহজেই অনুমান করা গেল। বেচারা বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু, স্যমন্তক মণি কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি আছে।

কৃষ্ণ চারদিকে খুঁজলেন, মৃতদেহ নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, কিন্তু কোথাও মণি পেলেন না। কোথায় গেল মণি? সিংহ মণি নিয়ে গেছে —এ তো আর সম্ভব নয়! তবে গেল কোথায়?

আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, প্রসেনের ডান হাতটা নেই। তার শরীরের বাকি অংশ, অস্থি-কঙ্কাল সবই রয়েছে, কেবল তার বাহু পর্যন্ত ডান হাতটা নেই। সিংহ সেটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে।

কৃষ্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। মৃত্যুকালে প্রসেনের ডান হাতের মুঠির মধ্যে স্যমন্তক মণি ছিল, সিংহ সেই হাতটাই ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

এখন উপায়? সবাই হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ হতাশ হলেন না, বললেন, 'সিংহ যে-পথে গিয়েছে, সেই পথে চল।'

সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সহজ নয়। সে বনের মধ্যে ঢুকেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো মাটির উপর তার নখের চিহ্ন, কোথাও বা ঘাসের গায়ে একটা রক্তের দাগ। তাই লক্ষ্য করে কৃষ্ণ চললেন।

অনেক দূর জঙ্গলের মধ্যে যাবার পর কৃষ্ণ এক জলাভূমিতে উপস্থিত হলেন। নরম মাটি তুলতুল করছে; খুব সাবধানে চলতে হয়, নইলে পাঁকের মধ্যে পুঁতে যাবার ভয়। এখানে সিংহের থাবার দাগ বেশ স্পষ্ট। কৃষ্ণ সেইদিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললেন।

কৃষ্ণের সঙ্গীরা কিন্তু জলার মধ্যে বেশি দূর যেতে সাহস করল না। তারা কৃষ্ণকে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। কৃষ্ণ কিন্তু ফিরলেন না; বললেন, 'সিংহ যেখানে যেতে পারে, আমিও সেখানে যেতে পারব। স্যমন্তক মণি আমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তোমরা এখানে থাক, আমি একাই যাচ্ছি।'

সঙ্গীরা ঘোড়া নিয়ে জলার এপারে রয়ে গেল, কৃষ্ণ পায়ে হেঁটে জলার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

জলাভূমি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে-ওখানে জলীয় উদ্ভিদের ঝাড়, শরের বন। ওপারে নিচু পাহাড়ের একটা শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণ সিংহের পদাঙ্ক দেখে-দেখে চললেন।

এইভাবে অনেক দূর যাবার পর, সূর্যাস্ত হতে যখন আর দন্ড-দুই বাকি আছে, তখন কৃষ্ণ একটা ঝোপের পাশে একটা জিনিস দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দেখলেন, যে সিংহকে তিনি এতদূর অনুসরণ করে এসেছেন, সে মাটিতে মরে পড়ে আছে, তার বুকে বিঁধে আছে শবরের তীব।

সিংহ শিকারীর তীর খেয়ে মরেছে। কিন্তু এখানে মানুষ এল কোথা থেকে? নিশ্চয় জলার পরপারে ঐ পাহাড়ের মধ্যে মানুষের বসতি আছে।

কৃষ্ণ মৃত সিংহের চার পাশে খুঁজলেন; কিন্তু কই, স্যমন্তক মণি তো নেই! প্রসেনের ছিন্ন হাতটা পড়ে আছে, কিন্তু তার মুঠির মধ্যে মণি নেই।

সিংহের আশে-পাশে মানুষের পায়ের দাগও রয়েছে; জংলি মানুষের নগ্ন পায়ের দাগ। যে মানুষ সিংহ মেরেছে, নিশ্চয় তাব পায়ের দাগ। সুতরাং সে-ই মণি নিয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই সিংহ-শিকারী? সে তো এখানে নেই, কেবল তার পদচিহ্ন রেখে গেছে।

কৃষ্ণ সিংহ-শিকারীর পদচিহ্ন অনুসরণ করলেন। এতদূর এসে তিনি শূন্য হাতে ফিরে যাবেন না। দেখা যাক, কোথায় নিয়ে যায় এই পলাতক মণি!

সিংহ-শিকারীর পদচিহ্ন জলার পরপারে পাহাড়ের দিকে গিয়েছে। ক্রমে সূর্যাস্ত হল, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে এল। কোথাও জনমানব নেই।

কৃষ্ণ যখন পাহাড়ের পাদমূলে পৌঁছলেন তখন দিনের আলো আর নেই, কেবল পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকান্ড গুহার মুখ রাক্ষসের মত হাঁ করে আছে। সিংহ-শিকারীর পায়ের চিহ্ন সেই গুহার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। গুহার ভিতরে অমারাত্রির অন্ধকার।

তিন

কৃষ্ণ গুহার বাইরে এক প্রস্তর-পট্টের উপর শুয়ে রাত কাটালেন। পরদিন সূর্য উঠলে গুহায় প্রবেশ করলেন।

দিনের বেলাতেও গুহার মধ্যে অন্ধকার, কিন্তু অল্প-অল্প দেখা যায়। আর একটা সুবিধা, গুহাটা সুড়ঙ্গের মত একদিকে চলে গেছে, পথ হারাবার ভয় নেই।

অনেকক্ষণ এই বিবর দিয়ে চলবার পর বিবর ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল, তারপর সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে ছোট একটি আলোর চক্র দেখা গেল।

আলোর চক্রটি সুড়ঙ্গ থেকে বার হবার পথ; কিন্তু এত ক্ষুদ্র, যে একটা মানুষ অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে বার হতে পারে। কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে বার হলেন, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

ছোট একটি সবুজ উপত্যকা ঘিরে একটি গ্রাম। গ্রামে পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট কুটির। তাতে কালো-কালো ভাল্লুকের মত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণ বুঝলেন, তিনি এক অনার্য জাতির রাজ্যে এসে পড়েছেন। কৃষ্ণকে তখনও কেউ দেখতে পায়নি; তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু ঘরে কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পাথরের নুড়ি নিয়ে খেলা করছে। আর, তাদের মধ্যে একটি মেয়ের হাতে—স্যমন্তক মণি!

কৃষ্ণ তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। অমনি ছেলেমেয়েগুলো অচেনা লোক দেখে চেঁচামেচি করে উঠল। যে মেয়েটির হাতে স্যমন্তক মণি ছিল, সে মণি ফেলে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে।

কৃষ্ণ মণি তুললেন।

এই সময় ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি শুনে একটা লোক ছুটে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়াল। মিশমিশে কালো গায়ের রঙ; প্রকান্ড জোয়ান। কৃষ্ণকে দেখে বললে, 'কে তুমি? আমার রাজ্যে কী করে এলে?'

কৃষ্ণ বললেন, 'আমার নাম যাদব; আমি এই মণির খোঁজে এসেছি। তুমি কে?'

জোয়ান বললে, 'আমি জাম্ববান, এই রাজ্যের রাজা।'

কৃষ্ণ তখন সংক্ষেপে মণি-অন্বেষণের কথা বললেন। শুনে জাম্ববান বললে, 'ঐ কালো নুড়িটার জন্য এত কষ্ট করেছ? কিন্তু নুড়ি এখন আমার, আমি আমার মেয়েকে খেলা করতে দিয়েছি। তোমাকে দেব কেন?'

কৃষ্ণ বললেন, 'আমি দান চাই না। মণি বাজি রেখে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর। যদি তোমাকে হারাতে পারি, মণি আমার হবে।'

অনার্য জাম্ববান মণি মাণিক্যের মূল্য কিছুই বোঝে না, সে ভারি খুশি হয়ে বললে, 'বেশ, এসো মল্লযুদ্ধ করি। তুমি দেখছি বীর, গায়ের রঙও প্রায় আমাদেরই মত। তুমি যদি আমার কাছে হেরে যাও তাহলে কিন্তু আমার রাজ্যে থাকতে হবে।'

কৃষ্ণ রাজী হলেন। রাজ্যের লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর দুই বীরের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল।

ভীষণ কুস্তি! জাম্ববানের গায়ে অসীম শক্তি; কৃষ্ণও মহা বলবান। কিন্তু কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধের কূট-কৌশল—যাকে প্যাঁচ বলে—তাই জানতেন। কংস যখন তাঁকে মারবার জন্য চাণূর নামক মল্লবীরকে নিয়োগ করেছিল, তখন কৃষ্ণ কূটকৌশলের সাহায্যে তাকে বধ করেছিলেন। জাম্ববানও কৃষ্ণের সঙ্গে পারল না, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হবার পর কৃষ্ণ তাকে আসমান দেখালেন। মল্লযুদ্ধে একজন যদি অন্যজনকে চিৎ করে ফেলতে পারে, অর্থাৎ আসমান দেখাতে পারে, তাহলেই তার জিত।

জাম্ববান হেরে গিয়ে কৃষ্ণকে খুব সম্মান করল। রাজ্যে মস্ত ভোজ হল; কৃষ্ণ খেয়ে-দেয়ে পরম পরিতুষ্ট হলেন। তারপর স্যমন্তক মণি নিয়ে ফিরে চললেন। জাম্ববান নিজে পথ-প্রদর্শক হয়ে তাঁকে জলাভূমি পার করে দিয়ে গেল।

ওদিকে কৃষ্ণের সঙ্গীরা দুদিন অপেক্ষা করে যখন দেখল কৃষ্ণ ফিরলেন না, তখন তারা ভাবল, তিনি সিংহের পেটে গেছেন কিম্বা জলার পাঁকে ডুবে গেছেন। তাবা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে দ্বারকায় ফিরে গেল। কেবল কৃষ্ণের ঘোড়াটাকে জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে গেল। কি জানি, বলা তো যায় না!

দ্বারকায় যখন রাষ্ট্র হল যে কৃষ্ণ মৃগয়া করতে গিয়ে ফিরে আসেননি, জলায় ডুবে গেছেন, তখন নগরের লোক মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কৃষ্ণ নেই—এ-কথা যেন কেউ ভাবতে পারে না। সত্যভামা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ওদিকে বলরাম হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কী, কৃষ্ণ জলায় ডুবে গেছে? জলা চষে ফেলব!'

তিনি লাঙল কাঁধে করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁকে জলা চষতে যেতে হল না। এই সময় কৃষ্ণ ফিরে এলেন।

তারপর পৌর-পরিষদে মহতী সভা হল। সভায় কৃষ্ণ নিজের কলঙ্কমোচনের জন্য সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। শেষে বললেন, 'আপনারা সমস্তই শুনলেন। এখন আপনারাই বলুন, এ মণি কার?'

সভাসুদ্ধ লোক গর্জন করে উঠল 'এই মণি এখন কৃষ্ণের।

সত্রাজিতের আর মণির ওপর কোনও অধিকার নেই।'

সত্রাজিৎ সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি ভারি ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একে ভাইয়ের শোক, তার ওপর মণিও হাতছাড়া হয়। তিনি তখন সভায় উঠে কাতর স্বরে বললেন, 'বাবা কৃষ্ণ, আমি না-বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি, আমায় মাপ কর। তুমি তো আমার পর নও, মণি তোমার ঘরে থাকাও যা, আমার ঘরে থাকাও তাই। তা, আমি বলি কি, তুমি আমার মেয়ে সত্যভামাকে বিয়ে কর। আমার ছেলে নেই, আমি মরলে আমার যা-কিছু তুমিই পাবে, স্যমন্তক মণিও পাবে। লক্ষ্মী বাবা, অমত করো না।'

কৃষ্ণও মনে-মনে তাই চান, তিনি হেসে রাজী হলেন। সভাজন জয়ধ্বনি করে উঠল। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি সত্রাজিতকে ফেরত দিলেন। তারপর ধুমধামের সঙ্গে কৃষ্ণ আর সত্যভামার বিয়ে হল।

ভালুকের বিয়ে

বনেব মধ্যে এক ভালুক থাকত। ইয়া লম্বা চেহাবা, সারা গায়ে কালো-কালো লোম, কুৎকুতে চোখ। কিন্তু স্বভাবটি ভাবি সবল। বনেব অন্য সব জন্তু জানোযাব তাকে খাতিব কবে চলত। কেবল বাঘ ছাড়া।

বাঘ ছিল বনেব বাজা। সে ভালুককে খাতিব কবত না ভালুকও বাঘকে খাতিব কবত না, কিন্তু দু'জনে দু'জনকে এড়িযে চলত।

একদিন বসন্তকালে ভালুক বনেব মধ্যে ঘুবে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ দেখল একটা গাছেব ডালে মৌমাছিবা চাক বেঁধেছে। দেখে তার ভাবি আনন্দ হল। অনেক দিন মধু খাওযা হয়নি। ভালুক গাছে উঠল।

মৌমাছিরা ভালুককে চেনে। তারা জানে আর সব জন্তুকে হুল ফুটিয়ে তাড়ানো যায়, কিন্তু ভালুকের গায়ে এত লোম যে, তার গায়ে হুল ফোটে না। তাই তারা যখন দেখল ভালুক মধু খেতে আসছে তখন আর বেশী বাক্যব্যয় না করে চাক ছেড়ে উড়ে গেল।

ভালুক তখন ডালে পা ঝুলিয়ে বসে চাক থেকে আঁজলা-আঁজলা মধু বার করে খেতে লাগল।

এক পেট মধু খেয়ে ভালুক যখন গাছ থেকে নামল তখন তার প্রাণে ভারি ফুর্তি। সে গলা ছেড়ে গান গাইতে-গাইতে চলল :

'হারে রেরে রেরে—
আম গাছেতে বোল ধরেছে
মহুয়া গাছে মৌ
আমি যাচ্ছি আনতে আমার
রাজকন্যে বৌ!
হারে রেরে রেরে. .'

বনের রাজা বাঘ একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, ভালুকের গান তার কানে এল। বাঘ জেগে উঠে ভাবল, কার এতবড় আস্পর্ধা, গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙায়! বাঘ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় ডাকল, 'কে রে! কে রে আমার ঘুম ভাঙালি?'

ভালুকের মেজাজ তখন চড়া সুরে বাঁধা। সে বলল, 'তুই কে রে? আমাকে চিনিস্ না! আমি ভোম্বলদাস ভাল্লুক।'

বাঘ রাগে গর্‌গর্ করতে-করতে ভালুকের সামনে এসে দাঁড়াল, 'ভালুকের এত আস্পর্ধা! জানিস্ আমি বিক্রম সিং বাঘ। বনের রাজা।'

ভালুক বলল, 'যা যা, তোর মত রাজা ঢের দেখেছি।'

বাঘ আর রাগ সামলাতে পারল না ভালুকের গালে এক থাবড়া মারল। ভালুক উল্টে পড়ে গেল, তারপর উঠে মারল বাঘের পেটে এক লাথি।

ব্যস, লেগে গেল ঘোর লড়াই। এ ওঠে তো ও পড়ে, ও পড়ে তো এ ওঠে। বাঘের গায়ে অবশ্য জোর বেশী, কিন্তু ভালুক মধু খেয়েছে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়।

অনেকক্ষণ লড়াই চলবার পর দু'জনেই হাঁপিয়ে পড়ল। কাহিল অবস্থা, গা দিয়ে কাল-ঘাম ছুটছে দু'জনেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

বেশ খানিকক্ষণ কাটবার পর ভালুক চাংগা হয়ে উঠে বসল। তার তখন মধুর নেশা কেটে গেছে সে জোড় হাতে বলল মহারাজ, আমার অন্যায় হয়েছে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

বাঘও উঠে বসল। ভারি খুশী হয়ে ভালুকের পিঠ চাপড়ে বলল, 'বেশ, বেশ। তোমার গায়ে তো খুব জোর! আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। তোমার কী চাই বল, যা চাইবে তাই পাবে।'

ভালুক বাঘের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'ধন্য আমি! মহারাজ, আমার ভারি বিয়ে করবাব ইচ্ছে হয়েছে, আপনি আমায় একটি বৌ যোগাড় করে দিন।'

বাঘ বলল, 'এ আর বেশী কথা কি। কেমন বৌ চাই বল। ভাল্লুকী চাও ভাল্লুকী এনে দেব, বাঁদরী চাও বাঁদরী পাবে, হরিণী চাও হরিণী ধরে আনব। আর যদি বাঘিনী চাও, তাও যোগাড় হবে।'

ভালুক বলল, 'না মহারাজ, আমার ইচ্ছে হয়েছে, মানুষের মেয়ে বিয়ে করব।'

বাঘ চোখ কপালে তুলে বলল, 'কি সর্বনাশ! মানুষের মেয়ে! বন্ধু, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ও কাজ কোরো না।'

'না মহারাজ, আমার ভারি ইচ্ছে হয়েছে।'

'তবে আর উপায় কি। কিন্তু বনের মধ্যে মানুষের মেয়ে পাবে কোথায়?'

'ওই যে বনের কিনারায় মানুষদের গ্রাম আছে, সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে দেখেছি।'

'হুঁ, তুমি তাহলে ছাড়বে না, মানুষের মেয়ে বিয়ে করবেই?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

বাঘ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বেশ, চল তাহলে। কাজটা কিন্তু ভাল করছ না বন্ধু। মানুষের মেয়ে খেতে ভাল, কিন্তু তাকে বিয়ে করা—! এর চেয়ে বোধহয় বাঘিনী বিয়ে করলেই ভাল করতে।'

ভালুক কিন্তু নাছোড়বান্দা। দু'জনে তখন বনের ভিতর দিয়ে চলল।

বনের কিনারায় যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। সামনেই ছোট্ট গ্রামটি। বন এবং গ্রামের মাঝখানে কয়েকটি গ্রামের মেয়ে জল-ডেঙাডেঙি খেলছে।

বাঘ 'হালুম' করে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সব মেয়েরা চীৎকার করতে-করতে পালাল, কেবল একটি মেয়ে পালাতে পারল না। ভালুক অমনি মেয়েটিকে বগলদাবা করে মারল ছুট।

গ্রামের লোক চীৎকার শুনে যতক্ষণে লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে এল ততক্ষণে বাঘ আর ভালুক বৌ নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সবাই হা-হুতাশ করতে লাগল, কিন্তু উপায় কি? রাত্রি হয়ে আসছে, এখন তো আর বনে ঢোকা যায় না।

ভালুককে তার গুহা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাঘ বলল, 'বন্ধু,

তুমি যা চাও তা পেয়েছ. এখন মনের সুখে ঘরকন্না কর।' বলে বাঘ চলে গেল।

ভালুকের গুহার মুখটি ছোট, কিন্তু ভেতরে বেশ বড়। ভালুক বৌকে নিয়ে গিয়ে গুহার মধ্যে রাখল। বৌ খুব কাঁদতে লাগল। ভালুক আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'কেঁদো না। তুমি আমার বৌ, আমি তোমাকে খাব না। বন থেকে ফলমূল এনে দেব, মৌচাক থেকে মধু এনে দেব। মনের সুখে থাকো।'

ভালুক বন থেকে কচি-কচি ঘাস এনে বৌয়ের বিছানা পেতে দিল, কয়েকটা জোনাকি ধরে এনে ঘরে আলো জেবলে দিল। বৌ তবু হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

দু'দিন যায়, চারদিন যায়। ক্রমে বৌয়ের কান্না থামল, ভালুকের সঙ্গে একটু একটু ভাব হল। ভালুক ভাল নাচতে জানে, বৌকে নাচ দেখায়। বৌ খিল্‌খিল্‌ করে হাসে।

ভালুক কিন্তু বৌকে বেশী বিশ্বাস করে না। সে যখন ফলমূলের খোঁজে গুহা থেকে বের হয় তখন গুহাব মুখে ভারি পাথর চাপা দিয়ে যায়, যাতে বৌ না পালায়।

একদিন বৌ আবদার ধবল. 'আমি বাপের বাড়ি যাব।'

ভালুক বলল, 'আরে, না না। ভালুকবংশে বাপের বাড়ি যাবার নিয়ম নেই।'

বৌ অমনি পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে শুরু করল, 'আমি বাপের বাড়ি যাব। ঘাসেব বিছানায় শুয়ে আমাব গা কুটকুট করে।'

ভালুক ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তা তোমার জন্যে শিমুল গাছ থেকে তুলো পেড়ে আনব, তুমি তুলোর বিছানায় শুয়ো।'

বৌ কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'শুধু তুলোর বিছানায় শুয়ে কী হবে? কাঁচা ফলমূল আমি মুখে দিতে পারি না।'

ভালুক বলল, 'সে কি কথা! ফলমূল খেলে গায়ে জোর হয়। এই দেখ না আমার গায়ে কত জোর! বনের রাজা যে বাঘ, তাকে আসমান দেখিয়েছিলুম।'

বৌ বলল. 'ও আমি খাব না। উপোস করব তবু খাব না।'

ভালুক ভারি মুশকিলে পড়ে গেল. বলল. 'তবে কী খাবে?'

বৌ বলল, 'ভাত ডাল চচ্চড়ি।'

'আরে সর্বনাশ!' ভালুক মাথায় হাত দিয়ে বসল। বনের মধ্যে ভাত ডাল চচ্চড়ি কোথায় পাবে সে?

একটা কাক গাছের ডালে বসে মজা দেখছিল, সে বলল. 'ও ভালুক, গাঁয়ে যাও না, গাঁয়ে ডাল ভাত চচ্চড়ি পাবে।'

ভালুক বলল, 'সে আমিও জানি। কিন্তু গাঁয়ে যাই কি করে?

গেলেই যে ঠেঙিয়ে মারবে।'

কাক বলল, 'বালাই, ষাট। ঠেঙিয়ে মারবে কেন? তুমি গাঁয়ের জামাই, তোমাকে জামাই-আদর করবে। যাও, যাও।' বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে লাগল।

ভালুক বলল, 'না বাবা, ওদিকে আর যাচ্ছি না।'

বৌ গিয়ে বিছানায় শুলো। খায় না দায় না, দিনে-দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। দেখে-শুনে ভালুকের মনে বড় কষ্ট হল। আহা, সত্যিই তো, বৌ গ্রামের মেয়ে, ভাত ডাল চচ্চড়ি না খেলে বাঁচবে কি করে? যার যা অভ্যেস।

ভালুক বৌকে বলল, 'আচ্ছা, আমি তোমার জন্যে গাঁ থেকে ভাত ডাল চচ্চড়ি আনতে যাচ্ছি।'

বৌ উঠে বসল। বলল, 'তুমি ভাত ডাল চচ্চড়ি কোথায় পাবে? ভাত ডাল চচ্চড়ি কি গাছে ফলে যে পেড়ে নিয়ে আসবে?'

ভালুক বলল, 'তবে?'

বৌ বলল, 'ভাত ডাল চচ্চড়ি রান্নাঘরে তৈরি হয়।'

ভালুক বলল, 'ও বাবা, তবে থাক্।'

বৌ বলল, 'এক উপায় আছে।'

'কী উপায়?'

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, আমি দেখিয়ে দেব রান্নাঘর কোথায়। তখন তুমি ভাত ডাল চচ্চড়ি চুরি করে এনো।'

'তোমাকে নিয়ে যাব? কিন্তু—'

'ভয় নেই, আমি আবার তোমার সঙ্গে ফিরে আসব।'

'ঠিক আসবে তো?'

'ঠিক আসব।'

ভালুক তখন বৌ নিয়ে গ্রামের পানে চলল।

যেতে-যেতে পথে বাঘের সঙ্গে দেখা। বাঘ বলল, 'কি বন্ধু, বৌ নিয়ে কোথায় চলেছ?'

ভালুক বলল, 'শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। বৌয়ের বড় ভাত ডাল চচ্চড়ি খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

বাঘ বলল, 'বন্ধু, অমন কাজটি কোরো না। তার চেয়ে এস, বৌকে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলি। মানুষের মাংস একবার খেলে আর ভুলতে পারবে না।' বলে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল।

ভালুক জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি, অমন কথা বলতে নেই। বৌ খেলে পাপ হয়।'

'যাও তবে শ্বশুরবাড়ি। কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।' বলে বাঘ

চলে গেল। ভালুকও বৌ নিয়ে বনের কিনারায় উপস্থিত হল।

দুপুরবেলা গাঁয়ের লোকেরা খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছে। বৌ আর ভালুক পা টিপে-টিপে গ্রামের ভিতর ঢুকল। বৌ একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই রান্নাঘর!'

ভালুক যেই রান্নাঘরে ঢুকেছে, অমনি বৌ বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল, তারপর চীৎকার করতে-করতে সমস্ত গাঁয়ের লোককে তুলল, 'শীগ্‌গির এস, ভালুককে ঘরে বন্ধ করেছি।'

সবাই ডাণ্ডা নিয়ে ছুটে এল।

'কোথায় ভালুক! কোথায় ভালুক!'

'ঐ ঘরে বন্ধ করেছি।'

'আজ ভালুকের দফারফা করব।'

সবাই দরজা খুলতে গেল। বৌ বলল, 'তোমরা ওকে মেরো না। ভালুক খুব ভাল নাচতে জানে, আমি ওকে পুষব।'

ওদিকে ভালুকের অবস্থা শোচনীয়। সে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমাকে প্রাণে মেরো না। বৌকে আমি ভালবাসি, সে যা বলবে আমি তাই করব।'

বৌ দোরের বাইরে থেকে বলল, 'তুমি যদি গ্রামে থাকতে রাজী হও তাহলে তোমাকে কেউ মারবে না।'

ভালুক বলল, 'আমি রাজী।'

'তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে নাচ দেখিয়ে বেড়াব।'

'রাজী।'

বৌ তখন দরজা খুলে দিল।

ভালুক গ্রামেই থাকে, ডাল ভাত চচ্চড়ি খায়। বৌ তার নাকে দড়ি দিয়ে অন্য গ্রামে নাচ দেখাতে নিয়ে যায়। নাচ দেখে সবাই পয়সা দেয়।

ভালুকের অবস্থা ফিরে গেছে, বৌকে নিয়ে আলাদা কুঁড়েঘরে থাকে। বনের কথা আর তার মনে পড়ে না।

মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রে বাঘ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, বলে, 'কি বন্ধু, শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে?'

ভালুক বলে, 'এমন জায়গা আর নেই।'

'আর বনে ফিরে যাবে না?'

'উহুঁ! আমি এখন একজন বড় আর্টিস্ট।' ভালুক আপন মনে গান ধরে—'হারে রেরে রেরে......'

পান্নাদিঘির জোড়া রুই

দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঘোড়ার খুরের মত বাঁকা একটা উঁচু বাঁধ। আর তার কোলে টলটল করছে পান্না দিঘির স্বচ্ছ জল।

বাঁধটা কিন্তু সত্যিকারের বাঁধ নয়; যাকে বাঁধ বলে মনে হয়, হাজার বছর আগে সেটা ছিল রাজপ্রাসাদ। তিন দিক থেকে প্রকাণ্ড দিঘিকে ঘিরে রেখেছিল। প্রাসাদে থাকতেন রাজা, রানী, রাজকন্যা; লোক-লস্কর দাস-দাসীতে চারিদিক গমগম করত। রানী এসে দিঘির

পাথর বাঁধানো ঘাটে স্নান করতেন, রাজকন্যা পান্নার মত জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটতেন। এখন আর সেখানে জন মানব নেই; রাজ-অট্টালিকা ভেঙে ধ্বসে পড়েছে, তার ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে। রাজা, রানী, রাজকন্যা স্বপ্নের মত অতীতের ছায়ায় মিলিয়ে গেছেন। কেবল পান্না দিঘির সবুজ জল আজও আগের মতই টলটল করছে।

দিঘির যেদিকে বাঁধ নেই সেই দিকে কিছু দূরে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের বৌ-ঝি'রা দিঘি থেকে জল নিতে আসে। পান্না দিঘির জল ঝাঁঝি আর শ্যাওলায় ভরে গেছে, তবু এমন মিষ্টি জল আর কোথাও নেই; যেন মিছরির সরবৎ। তাই গাঁয়ের মেয়েরা এখান থেকেই জল নিয়ে যায়।

পশ্চিমের আকাশে যখন সন্ধ্যের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে, তখন গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসে। দিঘির পাথর বাঁধানো পৈঁঠের ওপর বসে দু'দন্ড গল্প করে। হঠাৎ কোনও কোনও দিন তারা দেখতে পায়, এক জোড়া প্রকান্ড রুই মাছ ঘাটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে: কখনও ঘাটের খুব কাছে আসছে, কখনও গভীর জলে চলে যাচ্ছে। তাদের গায়ে যেন সোনার সাঁজোয়া পরা।

এই জোড়া রুই মাছ দেখে মেয়েরা গল্প বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে। তাদের মনে পড়ে যায় কত দিনের পুরনো রূপকথা, যা তারা নিজেদের মা-ঠাকুমা'র মুখে শুনেছে। সন্ধ্যের ঝিমিয়ে-পড়া আলোয় ভাঙা রাজপুরী আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পান্না দিঘিতে তখন অনেক মাছ ছিল। রাজকুমারী মধুমতী মাছ খেতে ভালবাসেন, তাই রাজা দিঘিতে নানা জাতের মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন। রুই কাৎলা চিতল, আরও কত কি। মধুমতীর যখন যে মাছ খাবার ইচ্ছে হয়, জেলেরা এসে জাল ফেলে সেই মাছ ধরে দিয়ে যায়।

দিঘিতে একটি মাছ ছিল, তার চেহারা ভারি সুন্দর। গোলাপী রঙ, নধর গড়ন। তাকে দেখে মনে হয় উঁচু বংশের মাছ। সে অন্য মাছেদের সঙ্গে মেশে না, ঘাটের কিনারায় কিনারায় ঘুরে বেড়াত।

একদিন সে দেখতে পেল মধুমতী সখীদের নিয়ে ঘাটে জলকেলি করছেন। তার চোখের আর পলক পড়ল না, সে মধুমতীর পানে চেয়ে রইল। কী রূপ মধুমতীর! যেন পান্না দিঘির সবুজ জলে সোনার পদ্ম ফুটে আছে।

সেদিন থেকে মাছ আর ঘাট ছেড়ে যায় না। যখনই মধুমতী স্নান করতে আসেন, জলের ভেতর থেকে পলকহীন চোখে তাঁর পানে চেয়ে থাকে। তিনি যখন সাঁতার কাটেন, সেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

রাজকুমারীর সখীরা বলে, 'ওমা, কি সুন্দর রুইমাছ, ঠিক যেন রাজপুত্তুর!'

মধুমতী হেসে বলেন, 'ও যদি মাছ না হয়ে মানুষ হত, ওর গলায় মালা দিতুম।'

শুনে মাছের খুব আনন্দ হয়। আবার দুঃখও হয়। জলের মাছের তো ডাঙার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

·এমনিভাবে দিন কাটে।

মাছের দেবতা হচ্ছেন মীনেশ্বর: সাক্ষাৎ মৎস্য অবতার। দিঘির অতল তলে ঝিনুকের মন্দিরে তিনি থাকেন। একদিন মাছ গিয়ে তাঁর দোরে ধর্ণা দিল।

'ঠাকুর, আমাকে মানুষ করে দাও।'

কিন্তু মাছের মানুষ হওয়া তো সহজ কথা নয়। মীনেশ্বর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না। মাছও নাছোড়বান্দা, ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইল। খায় না দায় না, কেবল বলে, 'ঠাকুর, আমাকে মানুষ করে দাও।' না খেয়ে খেয়ে তার শরীর আধখানা হয়ে গেল।

শেষে তার অবস্থা দেখে মীনেশ্বরের দয়া হল। মীনেশ্বর বললেন, 'আচ্ছা যা, বর দিলাম, ডাঙায় উঠলেই তুই মানুষ হয়ে যাবি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্—মানুষ হবার পর মাছ খাবি না। মাছ খেলেই আবার মাছ হয়ে যাবি।'

মাছ রাজী হল। মীনেশ্বরকে প্রণাম করে সে তাড়াতাড়ি জলের ওপর ভেসে উঠল। তার আর ত্বর সইছে না, কোনও রকমে ডাঙায় উঠতে পারলে হয়।

ওদিকে পান্না দিঘির কিনারায় তখন মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। রাজকন্যার পাকা রুইমাছের ঝোল খাবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই জেলেরা জাল নিয়ে দিঘিতে মাছ ধরতে এসেছে। কিন্তু যত বার জাল ফেলছে—রুইমাছ উঠছে না। উঠছে কাৎলা, মৃগেল, কালবোস।

তারপর আমাদের রুইমাছ যেই ভেসে উঠেছে অমনি ঝপাং করে জাল পড়ল। আর যাবে কোথায়। জেলেরা জাল টেনে ডাঙায় তুলল। জালের মধ্যে সোনার বরণ রুইমাছ ধড়্ফড়্ করছে।

তারপরই—অবাক কাণ্ড!

জাল ডাঙায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় রুইমাছ! তার বদলে জালের মধ্যে জড়িয়ে আছে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ।

জেলেরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে জাল ফেলে মারল টেনে দৌড়।

রাজকুমারী মধুমতী তিন তলার জানলায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখছিলেন, জেলেরা জাল ফেলে পালিয়ে গেল দেখে তিনি নেমে এলেন। ঘাটে এসে দেখলেন, জালে জড়িয়ে আছে সোনার বরণ রাজ-

কুমার; তার কানে শঙ্খের কুণ্ডল, হাতে শঙ্খের বাজুবন্ধ। রাজকুমারীকে দেখে সে হাসল। মধুমতীও হাসলেন, চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে জালের বাঁধন খুলে দিলেন। বললেন, 'তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি শঙ্খপুরীর রাজপুত্র, আমার নাম শঙ্খকুমার।'

মধুমতীর চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল।

ওদিকে রাজসভায় রাজা খবর পেয়েছিলেন। তিনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসে দেখলেন, ঘাটের পৈঁঠের ওপর মধুমতীর পাশে এক কন্দর্পকান্তি যুবা বসে আছে। রাজা বললেন, 'একি! অন্দরমহলের ঘাটে তুমি কে?'

শঙ্খকুমার রাজাকে নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা বললেন, 'শঙ্খকুমার, তুমি এখানে এলে কি করে?'

শঙ্খকুমার বললেন, 'পান্না দিঘি থেকে শঙ্খপুরী পর্যন্ত জলের তলায় সুড়ঙ্গ আছে, আমি সেই পথে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু নিজের রাজ্য ছেড়ে এখানে এলে কেন?'

শঙ্খকুমার বললেন, 'শঙ্খপুরীতে মানুষ নেই; সেখানে মন টেঁকে না। তাই মানুষের রাজ্যে এসেছি।'

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ, মনের আনন্দে বাস কর। তুমি যখন রাজপুত্র তখন আমার প্রাসাদেই থাকো।'

শঙ্খকুমার রাজপ্রাসাদে রইলেন। দাস-দাসীরা সেবা করে, রানী-মা আদর করে সামনে বসিয়ে খাওয়ান। শঙ্খকুমার ক্ষীর সর নবনী খান, কেবল মাছ খান না। রাজার পাকশালে রুই মাছের ঝোল, চিতল মাছের ঝাল রান্না হয়, শঙ্খকুমার তা স্পর্শ করেন না। রানী-মা বলেন, 'আহা, কেন বাছা তুমি মাছ খাও না?'

শঙ্খকুমার বলেন, 'মাছ আমার ভাল লাগে না।'

মধুমতী মনে মনে ভাবেন, ওমা এমন মানুষও আছে, যার মাছ ভাল লাগে না!

যাহোক, শঙ্খকুমার মনের সুখে আছেন, যেন ঘরের ছেলে। রোজ পান্না দিঘিতে স্নান করতে নামেন। মধুমতীও স্নান করতে আসেন; দু'জনে মিলে বিরাট দিঘির এপার ওপার সাঁতার কাটেন। মনে হয়, যেন দুটি রাজহংস দিঘির সবুজ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

একদিন হল কি, মধুমতী আগে দিঘির ঘাটে স্নান করতে এসেছেন; তিনি দেখলেন দিঘির ঠিক মাঝখানে একটি সুন্দর নীল পদ্ম ফুটেছে। মধুমতীর ইচ্ছে হল তিনি ওই পদ্মটি তুলে আনবেন, আর শঙ্খকুমার যখন আসবেন তখন তাঁকে সেটি দেবেন। মধুমতী জলে নামলেন, সাঁতরে ফুলটি তুলতে গেলেন। কিন্তু যেই তিনি ফুলটি তোলবার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, অমনি পদ্মের ভেতর থেকে

একটা কালো ভোমরা বেরিয়ে তাঁর আঙুলে হুল ফুটিয়ে দিলে।

অমনি মধুমতীর হাতে খিল ধরল; তিনি আর ভেসে থাকতে পারলেন না. ডুবে যেতে লাগলেন। এই সময় শঙ্খকুমারকে ঘাটে দেখতে পেয়ে মধুমতী ডাকলেন, 'শঙ্খকুমার, আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও।'

শঙ্খকুমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, পলকের মধ্যে সাঁতার কেটে গিয়ে মধুমতীকে জল থেকে তুলে আনলেন।

রাজা রানী এলেন। রানী মেয়েকে বুকে চেপে ধরলেন, রাজা শঙ্খকুমারকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কুমার, কি পুরস্কার চাও বল।'

শঙ্খকুমার হাসি-মুখে কুমারী মধুমতীর দিকে আঙুল দেখালেন।

রাজা বললেন, 'ভাল। তুমি মধুমতীর প্রাণ বাঁচিয়েছ, ওকে তোমার হাতেই দিলাম।'

তারপর মহা ধুমধাম। আলো-বাতি, বাজনা-বাদ্যি, নাচ-গান। রাজকন্যা মধুমতীর সঙ্গে শঙ্খকুমারের বিয়ে হয়ে গেল।

দু'জনে মনের আনন্দে আছেন। সোনালী দিন কাটে তো রুপালী রাত আসে। শীত কাটে তো বসন্ত আসে। ফুল ঝরে তো ফল ফলে। রাজবাড়িতে দিনে দোল, রাত্রে দেয়ালী। সুখের গাঙে যেন বান ডেকেছে।

কিন্তু মধুমতীর মনে একটি ছোট্ট কাঁটা ফুটে আছে—স্বামী মাছ খান না। মধুমতী নিজে মাছ ভালবাসেন, কিন্তু স্বামীর মাছে রুচি নেই তাই তাঁরও মাছ খেতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে স্বামীকে বলেন, 'তুমি মাছ খাবে না?'

শঙ্খকুমার বলেন, 'না।'

'একবার খেয়ে দেখ না, খুব ভাল লাগবে।'

'না।'

মধুমতী নিঃশ্বাস ফেলেন, তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। শঙ্খকুমার বলেন, 'চল, অশোক গাছে দোলা বেঁধেছি. দু'জনে মিলে দুলব।'

এমনি করে দিন কাটে।

রাজার পাকশালে এক রাঁধুনী ছিল, সে মাছ রাঁধত। সে একদিন মধুমতীকে বলল, 'রাজকুমারী, স্বামী মাছ খান না বলে তুমিও মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, তবে আর কার জন্য রাঁধি।'

মধুমতী বললেন, 'কি করি বল্!'

রাঁধুনী বলল, 'একটা উপায় করতে পারি। এমনভাবে মাছ রাঁধব যে, শঙ্খকুমার বুঝতেই পারবেন না যে মাছ খেয়েছেন। এমনি ভাবে খেতে খেতে অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন চেয়ে মাছ খাবেন।'

রাধুনীর কথা মধুমতীর মনে ধরল, বললেন, 'তাই কর্ তাহলে।'

রাধুনী তখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাছ রাঁধতে চলল।

সেদিন দুপুরবেলা শঙ্খকুমার খেতে বসেছেন। সোনার থালা ঘিরে বাটিতে ছত্রিশ ব্যঞ্জন। মধুমতী মুক্তার ঝালর বসানো পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। খেতে খেতে শঙ্খকুমার বললেন, 'এটা কিসের তরকারি?'

মধুমতী বললেন, 'ওটা ধোঁকার ডালনা। নতুন রান্না, খেয়ে দেখ, খুব ভাল লাগবে।'

শঙ্খকুমার না জেনে মাছ মুখে দিলেন।

অমনি তাঁর বুক ধড়ফড় করে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আসন থেকে উঠে তিনি টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দিঘির দিকে চললেন।

মধুমতী 'কি হল! কি হল!' বলে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছন পিছন ছুটলেন।

দিঘির ঘাটে গিয়ে শঙ্খকুমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অমনি —কোথায় শঙ্খকুমার! শঙ্খকুমার মাছ হয়ে পান্না দিঘির অগাধ জলে মিলিয়ে গেলেন!

মধুমতী কাঁদতে কাঁদতে ঘাটের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কান্না শুনে রাজা রানী ছুটে এলেন, ঘাটে দাস-দাসীর ভীড় জমে গেল। সকলের মুখে এক কথা, 'কি হল! কি হল! কোথায়—কোথায় গেল শঙ্খকুমার!'

মধুমতী আর মহলে ফিরে গেলেন না, ঘাটেই পড়ে রইলেন। দিন যায়, রাত যায়; মধুমতী দিঘির জলের পানে চেয়ে কেবল কাঁদেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর চক্ষু অন্ধ হল। তারপর একদিন তিনিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দেহ পান্না দিঘির অগাধ জলে ডুবে গেল।

রাজপুরীতে সুখের দিন ফুরোল। দেশে দুর্ভিক্ষ এল, মড়ক এল, রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধল। রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।

তারপর হাজার বছর কেটে গেছে। রাজার প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু পান্না দিঘির সবুজ জল এখনও টলটল করছে। সন্ধ্যেবেলা যখন জলের ওপর সোনালী আলো ঝিল্‌মিল্ করে গাঁয়ের বৌ-ঝি'রা দেখতে পায় দুটি প্রকাণ্ড রুই মাছ জলের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার গভীর জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সদাশিবের আদিকাণ্ড

সদাশিব গাঁয়ে টিকতে পারল না। একে তো সে বাপ-মা মরা ছেলে মামার বাড়িতে মানুষ; তার ওপর গাঁসুদ্ধ লোক তার ওপর চটা। সবাই বলে, 'আমরা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেলাম, আর তোর এমন তেল চিক্‌চিকে চেহারা হল কি করে? নিশ্চয় আমাদের খাবার চুরি করে খাস!'

সদাশিব কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'কক্ষনো না। কার চুরি করে খেয়েছি তোমরাই বল।'

তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না, কিন্তু শাসিয়ে দেয়, 'যেদিন ধরব সেদিন হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।'

সত্যিই গ্রামের অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রান্তে পশ্চিমঘাটের খাঁজের মধ্যে ছোট্ট গ্রামটি এতদিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল, কিন্তু কয়েক বছর থেকে এমন উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যে বলবার কথা নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেধেছে। উত্তর থেকে মোগলেরা এসে দৌলতাবাদ মহলে বসেছে, আর দক্ষিণে আছে আদিলশাহী বিজাপুর রাজ্য। দুই পক্ষে ঠোকাঠুকি লেগেছে। যুদ্ধ তো চলছেই, তার ওপর দুই পক্ষের সিপাহীরা সুবিধা পেলেই গ্রাম লুঠ করছে। গ্রামবাসী চাষারা সারা বছর পরিশ্রম করে যা দু'চার দানা জোয়ার-বাজরি তুলছে তা গ্রামবাসীদের পেটে যাচ্ছে না, বেশির ভাগই সিপাহীরা লুঠে নিয়ে যাচ্ছে। কথায় বলে রাজায়

রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়, গ্রামের অবস্থা হয়েছে তাই। আধপেটা খেয়ে গ্রামের লোক কোনও রকমে বেঁচে আছে।

উপরন্তু সম্প্রতি আর এক উপসর্গ হয়েছে। শিবাজী নামে এক মারাঠা যুবক একদল ডাকাত যোগাড় করে চারিদিকে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে। গরীব চাষাদের ওপর সে হানা দেয় না, তার নজর রাজা বাদশার ওপর। ভারি ডাকাবুকো লোক, কাউকে ভয় করে না। লোকে বলে শিবাজী নাকি মোগলদের তাড়িয়ে আর বিজাপুরী মুসলমানদের দমন করে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তা কি পারবে শিবাজী? মোগলদের তাড়ানো কি সামান্য ডাকাতের কাজ? মাঝ থেকে দেশের লোকের দুর্দশা বেড়েই যাচ্ছে। কারুর ঘরে অন্ন নেই, সকলের চেহারা কংকালসার।

কেবল সদাশিবের চেহারা ওরি মধ্যে একটু শাঁসে জলে। তার বয়স সতেরো কি আঠারো বছর, বেঁটে খাটো কমঠ দেহ, চিক্কণ শ্যাম গায়ের বর্ণ, মুখখানি ভালমানুষের মত। আচার আচরণও শান্ত

শিষ্ট। কিন্তু গাঁয়ের সবাই তার শত্রু। সবাই ভাবে—ছোঁড়া কোথা থেকে বেশি খাবার পায়? তার মামা সখারাম কিপটে মানুষ, সে নিজে না খেয়ে ভাগনেকে বেশি খেতে দেবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সদাশিবের ওপর নজর রাখে, কিন্তু কেউ কিছু ধরতে পারে না। তাদের খালি রাগ হয়। তারা জানে না যে গ্রামে সদাশিবের একটি বন্ধু আছে যে নিজে সিকি-পেটা খেয়ে নিজের খাবারের ভাগ সদাশিবকে দেয়। গাঁয়ে কেবল ওই একটি মানুষ সদাশিবকে ভালবাসে।

একদিন গ্রীষ্মের বিকেলবেলা সদাশিবের মামা সখারাম বললেন, 'বাবা সদাশিব, তোমাকে আর আমি খেতে দিতে পারছি না, এবার তুমি নিজের রাস্তা দেখ।'

গাঁয়ের বারোয়ারি বটতলায় পাঁচজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনেই সখারাম কথাটা তুললেন, বোধহয় মাতব্বরদের সঙ্গে আগেই সলা-পরামর্শ করে রেখেছিলেন।

সদাশিব হাঁ করে মামার মুখের পানে চেয়ে রইল, শেষে বলল, 'তুমি খেতে না দিলে আমি খাব কি?'

গাঁয়ের বুড়ো বিঠ্ঠল পাটিল বললেন, 'তুমি জোয়ান হয়েছ, নিজে পরিশ্রম করে রোজগার করে খাবে। মামা তোমাকে কতদিন খাওয়াবে?'

সদাশিব বলল, 'আমি পরিশ্রম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তোমরা আমায় কাজ দাও।'

একজন মোড়ল হাত উল্টে বললেন, 'কাজ কোথায়? দেখছ না আমরা সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছি। কার জন্যে চাষবাস করব? সিপাহীদের জন্যে?'

সদাশিব বলল, 'তবে আমি কি করব বলে দাও।'

বিঠ্ঠল পাটিল খিঁচিয়ে উঠলেন, 'তা আমরা কি জানি? তোমাকে গাঁয়ের কেউ চায় না। তুমি কালই যেখানে ইচ্ছে চলে যাও।'

সদাশিব ছল্‌ছল্‌ চোখে সকলের পানে তাকাতে লাগল। বলল, 'কোথায় যাব? আমি যে কখনো গাঁয়ের বাইরে যাইনি।'

একজন মাতব্বর বললেন, 'যাবার ভাবনা কি? মোগলদের দলে ভিড়ে পড় গিয়ে। তুমি তো আমাদের মত রোগা-পটকা নয়, বেশ মোটা-তাজা আছ। মোগলেরা লুফে নেবে।'

আর একজন বললেন, 'বিজাপুরীদের দলেও যোগ দিতে পার।'

তৃতীয় মাতব্বর রসিকতা করে বললেন, 'সবচেয়ে ভাল, তুমি শিবাজীর ডাকাতের দলে জুটে যাও। তোমার চুরি করা অভ্যেস আছে। ডাকাতের দলে খুব কদর হবে।'

 সদাশিব আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে

আস্তে গিয়ে নদীর কিনারে বসল। গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট পাহাড়ী নদী, গ্রীষ্মের তাপে প্রায় শুকিয়ে এসেছে; তীরে ঝোপঝাড় জঙ্গল। একটা পনস গাছ নিঃঝুমভাবে দাঁড়িয়ে আছে; গাছে একটিও ফল নেই, ইঁচড় অবস্থাতেই গাঁয়ের লোক পেড়ে নিয়ে গেছে। সদাশিব তার একটা নীচু ডালে উঠে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভাবতে লাগল।

সদাশিব অনেকক্ষণ বসে ভাবল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সদাশিব তখন ডাল থেকে নেমে নদীর তীর থেকে দুটি নুড়ি কুড়িয়ে আনল, নুড়ি দুটি পনস গাছের ডালের ওপর রেখে গাঁয়ে ফিরে চলল। দুটি নুড়ির সংকেত কেবল একজন বুঝবে—দুই পহর রাতে এখানে এস, দেখা হবে।

ফিরে যেতে যেতে সদাশিব দেখল গাঁয়ের ঝি-বৌরা নদীতে জল নিতে আসছে। সে তাদের এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

পাহাড়ের উপত্যকায় রাত্রি আসে তাড়াতাড়ি। সদাশিব ফিরে এসে মামীর দেওয়া আধখানা শুকনো বাজরির রুটি খেয়ে বাইরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল রাত দুপুরে। পূব আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠি উঠি করছে। সদাশিব নিঃশব্দে উঠে ছায়ার মত নদীর পানে চলল। পনস গাছের তলায় অন্ধকার; কিন্তু সদাশিব অন্ধকারে দেখতে পায়। সে দেখল গাছের নীচু ডালে ঠেস দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের মোড়ল বিঠ্‌ঠল পাটিলের মেয়ে কুঙ্কুম।

সদাশিব তার পাশে গিয়ে গাছের ডালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কুঙ্কুমের বয়স যদিও তের চৌদ্দ বছর, তাকে দেখলে মনে হয় নয়-দশ বছরের মেয়ে। ছোটখাটো শরীরটিতে কিন্তু বেশ সৌষ্ঠব আছে। বেশি কথা কয় না, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী। এতটুকু মেয়ের যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা হল। সদাশিব বলল, 'কুঙ্কু, সব খবর জানিস তো?'

কুঙ্কু বলল, 'জানি।—এই নাও খাও।' বলে হাতের খাবার সদাশিবের মুখের কাছে ধরল। সদাশিব খাবারে কামড় দিয়ে দেখল—পূরণপুরী! অনেকদিন সে পূরণপুরী খায়নি, মনের সুখে চিবতে চিবতে বলল, 'এবার আমি চলে যাব, তুই পেট ভরে খেতে পাবি। সিকি-পেটা খেয়ে খেয়ে তোর বাড়-বৃদ্ধি কমে গেছে।'

কুঙ্কু বলল, 'আহা, ভারি জানো তুমি। সিকি টুকরো রুটি খেয়েই আমার পেট ভরে যায়, বাকি রুটি কি ফেলে দেব? তাই তোমার জন্যে রেখে দিই।'

১৩ এতক্ষণে চাঁদ একটু উঁচুতে উঠেছে, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে

ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তাদের মুখে পড়েছে। সদাশিব বলল, 'আমি চলে গেলে কি করবি?'

কুঙ্কু একথার জবাব দিল না, বলল, 'সকালেই চলে যাবে?'

সদাশিব বলল, 'হাঁ। তোর বাবা গাঁয়ের পাটিল, সে চলে যেতে বলেছে। যদি না যাই, মেরে তাড়াবে। ভাবছি সকাল হবার আগেই চলে যাব।'

কুঙ্কু বলল, 'কোথায় যাবে?'

সদাশিব কিছুক্ষণ পুরণপুরী চিবিয়ে বলল, 'তা জানি না। কেউ বলে মোগলের দলে যাও, কেউ বলে বিজাপুরীদের দলে যাও। তুই কি বলিস?'

কুঙ্কু বলল, 'আমি বলি তুমি পুণায় যাও, শিবাজীর দলে যোগ দাও। শিবাজীকে লোকে ডাকাত বলে, কিন্তু তিনি সত্যি ডাকাত নয়। তিনি বিদেশী শত্রুদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে লড়ছেন। তিনি যখন রাজা হয়ে বসবেন তখন দেশে সুখ শান্তি ফিরে আসবে।'

সদাশিব উৎসাহ ভরে বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস কুঙ্কু, আমি শিবাজীর দলে যোগ দেব। মোগল আর বিজাপুরীদের জ্বালায় পেট ভরে খেতে পাই না, ওদের দেশ থেকে তাড়াব।'

পুরণপুরী খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুঙ্কু সদাশিবের হাতে একটা থলি দিয়ে বলল, 'এটা নাও, পথে কাজে লাগবে।'

থলিতে কি আছে সদাশিব জিজ্ঞাসা করল না, থলিটা কাঁধে ফেলল; কুঙ্কুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কুঙ্কু, এবার তবে যাই। আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু বলল, 'এসো আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু দাঁড়িয়ে রইল, সদাশিব বেরিয়ে পড়ল। সে আর ঘরে ফিরে যাবে না, সিধা পুণার দিকে যাত্রা করবে। আকাশে চাঁদ আছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়াই ভাল। কিন্তু পুণার দিকে যেতে হলে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সদাশিব গ্রামের ভিতর দিয়ে চলল। মরা জ্যোৎস্নায় অসাড় গ্রামটিও যেন মরে গেছে। সদাশিব একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

কুঙ্কুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সদাশিব দেখল, বিঠ্‌ঠল পাটিলের ঘোড়াটা বাড়ির সামনের মাঠে বাঁধা রয়েছে। ঘোড়াটার চেহারা দেখে দুঃখ হয়, হাড় জির্‌জির্‌ করছে। যে-গাঁয়ে মানুষই পেট ভরে খেতে পায় না, সে-গাঁয়ে ঘোড়াকে কে খেতে দেবে? গ্রীষ্মকালে বনের ঘাসও শুকিয়ে গেছে।

ঘোড়াটার পানে চেয়ে চেয়ে সদাশিবের মনে ভারি কষ্ট হল। আহা! ঘোড়াটা বোধ হয় বাঁচবে না, না খেতে পেয়ে মরে যাবে। এমন

একটা জন্তু না খেয়ে মরে যাবে? তার চেয়ে—

সদাশিব একবার সতর্কভাবে চারিদিকে তাকাল। নিঃশব্দ নিশুতি গ্রাম, কোথাও সাড়া নেই। সে পা টিপে টিপে ঘোড়ার কাছে গেল, তার গলার রশি খুলে মুখে লাগাম বসালো, তারপর লাগাম ধবে ঘোড়াটাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে চলল।•

গ্রামের বাইরে গিয়ে সদাশিব ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, তারপর পুণার দিকে মুখ করে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

দুই

গ্রাম থেকে পুণায় যাবার কোনও সড়ক নেই, পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে যেতে হয়। তবে পুণা শহরটা কোন দিকে তা মোটামুটি সদাশিবের জানা ছিল। সে সেই দিকে চলল।

পাহাড়ের গুহায় জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে: দলবন্ধ শিয়াল, দলবন্ধ নেকড়ে, বুনো কুকুর, তরস। তরক্ষু বা হায়েনাকে এদেশে তরস বলে। কিন্তু সদাশিবের বরাত ভাল, সে জন্তু-জানোয়ারের পাল্লায় পড়ল না। জানোয়ারেরা বোধহয় অন্য দিকে শিকারে বেরিয়েছে।

ক্রমে সকাল হল, চাঁদ ফ্যাকাসে হয়ে মিলিয়ে গেল, সূর্য উঠল। পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালেও রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা থাকে, দিনে গবম। সূর্য যত উঁচুতে ওঠে গরমও তত বাড়তে থাকে। সদাশিবের ঘোড়াটা অনাহারে শীর্ণ, তবু সে পাহাড়ী ঘোড়া· সদাশিবকে পিঠে নিয়ে পাহাড় ভেঙে চলেছে। কখনও চড়াই কখনও উৎরাই; একের পব এক ঘাট আর উপত্যকা। দেখলে মনে হয় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ হঠাৎ জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে।

কোথাও জনমানব নেই, গ্রামের চিহ্ন নেই। একবার উপত্যকায় নেমে সদাশিব দেখল, ছোট উপত্যকার নাবাল্ কোণে ঝরণার জল জমেছে, গ্রীষ্মের তাপে একেবারে শুকিয়ে যায়নি। ঘোড়াটাও দেখতে পেয়েছিল, সে বল্গার ইঙ্গিত পাবার আগেই সেই দিকে ছুটল।

ছোট্ট ডোবার মত জলাশয়, তাকে ঘিরে সবুজ ঘাসের পাড়; সদাশিব ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেল; ঘোড়াটাও চোঁ চোঁ করে খুব খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে কাচ ঘাস খেতে লাগল।

কিছু দূরে একটা পাথরের চাঁই উঁচু হয়ে একটু ছায়া করেছিল, সদাশিব সেই ছায়ায় গিয়ে বসল। কুঙ্কু থলিতে কি দিয়েছে এখনও দেখা হয়নি।

থলিতে বেশি কিছু নেই। কয়েক মুঠো ভুট্টার দানা, মোটা মোটা দুটো বাজরির রুটি, আর একটি বজ্রের মত কঠিন মুগের লাড়ু। সদাশিব খাবার জিনিসগুলি স্নেহভরে নিরীক্ষণ করতে করতে ভাবল—কুঙ্কু যা খাবার দিয়েছে তাতে একদিন কেন, দু'দিন চলে যাবে। সে কল্পনার চক্ষে দেখতে লাগল গ্রামে এতক্ষণ কী হচ্ছে। পাটিলের ঘোড়া অদৃশ্য হওয়ায় নিশ্চয় খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে।. সদাশিবের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে এক মুঠি ভুট্টার দানা খেয়ে আবার পেট ভরে জল খেল, তারপর ঘোড়ায় চড়ে আবার চলল। ঘোড়াটাও ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঘাস খেয়ে নিয়েছে।

দুপুরবেলা সদাশিব এক পাহাড়ের ডগায় উঠে ঘোড়া দাঁড় করালো। চারিদিকে চেয়ে দেখল, সূর্যের খর তাপে আকাশ-বাতাস যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূরে অনেকগুলো পাহাড়ের পরপারে একটা দুর্গের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কোন্ দুর্গ বলা যায় না। মহারাষ্ট্র দেশের পাহাড় পর্বতের খাঁজে খাঁজে কত দুর্গ আছে; কোনোটা বিজাপুরীদের দখলে, কোনোটা মোগলদের দখলে, আবার কোনোটা শিবাজী ছলে-বলে দখল করে নিয়েছেন। ওই দুর্গটা কার দখলে তা না জেনে ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া ওখানে যেতে হলে কোন্ পথে কত পাহাড় ঘুরে যেতে হবে তা কে জানে। তার চেয়ে নাকের সোজা চলাই ভাল।

সারাদিন সদাশিব চলল। ক্ষিদে পেলে ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই কিছু খেয়ে নিল। অবশেষে সূর্য যখন পাটে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় সে একটা নতুন উপত্যকায় পৌঁছল। বেশ বড় উপত্যকা, অনেক গাছপালা; মাঝখান দিয়ে একটা সরু নদী বয়ে গেছে। সদাশিব ভাবল, পুণার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, হয়তো মানুষের দেখা পাব। তা যদি নাও পাই, এখানে রাত কাটানো শক্ত হবে না। অনেক বড় বড় গাছ আছে।

উপত্যকায় নেমে এসে সদাশিব কিন্তু জনমানুষ দেখতে পেল না। আগে এখানে গ্রাম ছিল, এখনও নদীর পাড়ে ছাইয়ের একটা চক্র তারই সাক্ষী দিচ্ছে; গ্রামবাসীরা শত্রুর আক্রমণে মরেছে, যারা পেরেছে পালিয়েছে। শত্রু গ্রাম লুঠ করে ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে।

নদীর পাড় থেকে জলের ধারে গিয়ে সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়ার লাগাম খুলে সামনের পা ছেঁদে দিয়ে ছেড়ে দিল। নদীর ধারে কচি ঘাস আছে; ঘোড়া তাই খাবে কিন্তু বেশি দূরে পালাতে পারবে না।

তারপর সে জলের ধারে পাথরের ওপর বসে পেট ভরে খাবার খেল; থলি প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু মুগের লাড়ুটা সে কালকের জন্য রেখে দিল। কাল লোকালয়ে পোঁছতে পারবে কিনা বলা যায় না। কিছু রসদ থাকা ভাল।

খাওয়া শেষ করে সদাশিব গাছ খুঁজতে বেরুল। রাত্রে মাটিতে শোয়া চলবে না, নেকড়ে তরস আছে।*গাছে উঠে রাত কাটানোই সব চেয়ে নিরাপদ। নদী থেকে খানিকটা দূরে একটা প্রকান্ড গাছ রয়েছে, বুনো জাম গাছ। গাছের ডালে ডালে থোকা থোকা কালো ফল ফলেছে, গাছের তলায় ঝরে-পড়া পাকা জাম বিছিয়ে আছে। সদাশিব দেখল এই গাছটাই উপত্যকাব মধ্যে সব চেয়ে বড় গাছ, এত বড় গাছ আর একটাও নেই। সদাশিব আর দ্বিধা করল না, সে গাছে উঠে পড়ল। মাটি থেকে পনরো হাত উঁচুতে একটা জুতসই ডালে বসে অন্য একটি ডাল ভাল কবে জড়িয়ে নিযে সে চোখ বুজল।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সদাশিবের শরীরে সারাদিনের ক্লান্তি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মানুষের গলার আওয়াজ! সদাশিব চোখ খুলে দেখল আকাশে চাঁদ উঠেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, দু'জন লোক গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের সাজ-পোষাক সৈনিকের মত, হাতে বল্লম। সদাশিব নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছে।

একজন বলল, 'এস মিঞা, এই গাছতলায় পোঁতা যাক।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'এই গাছের তলায় কেন? অন্য গাছ কি দোষ করেছে?'

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'বুঝলে না, এই গাছটা এখানকার সব চেয়ে বড় গাছ। পরে যখন আমরা মাল উদ্ধার করতে আসব তখন খুঁজে বেড়াতে হবে না। জানা থাকবে যে-গাছটা সব চেয়ে বড় তার তলাতেই মাল পোঁতা আছে।'

'তা বটে। বেশ, তাহলে এখানেই গর্ত খোঁড়া যাক।'

দু'জনে বল্লমের ফলা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তারা মারাঠী ভাষায় কথা বলছিল, তাই সদাশিব বুঝল ওরা মোগল নয়, বিজাপুরী দলের মুসলমান সিপাহী। তারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কথাবার্তা বলতে লাগল। পাথুরে মাটি সহজে খোঁড়া যায় না; একজন ক্লান্ত

হয় তো অন্য জন খোঁড়ে। সদাশিব গাছের ওপর বসে তাদের কথা শুনতে শুনতে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল।—

বিজাপুরীদের একটা দুর্গ থেকে আর একটা দুর্গে খাজনা যাচ্ছিল। সঙ্গে পঞ্চাশজন রক্ষী ছিল। ডাকাতের ভয়ে দিনের বেলা মাল চালান হয় না, রাত্রে হয়। আজ সন্ধ্যেবেলা এরা দুটো গরুর গাড়িতে মোহর আর টাকা চাপিয়ে দুর্গ থেকে যাত্রা করেছিল, আশা করেছিল ভোর হবার আগেই দুর্গে পৌঁছে যাবে; দুই দুর্গের মাঝে কেবল দশ-বারো ক্রোশের তফাত। কিন্তু ডাকাতেরা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে এরা পারল না। রক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেল, কয়েকজন পালিয়ে গেল। ডাকাতেরা একটা গরুর গাড়ির মাল লুঠে নিল।

দ্বিতীয় গরুর গাড়িটাকে তখনও একদল রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতেরা এবার সেটাকে আক্রমণ করল। কিন্তু আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দলের একজন লোক গুরুতর আহত হল, তার ঘোড়াটাও মারা পড়ল। সে বোধ হয় দলের নেতা; ডাকাতেরা তখন আহত নায়ককে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, দ্বিতীয় গরুর গাড়িটা লুঠ করল না।

ডাকাতেরা যখন চলে গেল তখন রক্ষীদের মধ্যে মাত্র এগারোজন লোক আছে। পাঁচ-ছয়জন মরে গেছে, বাকি পালিয়েছে। এই এগারো-জন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল—ডাকাতেরা তো একটা গরুর গাড়ি লুঠে নিয়ে গেছে, এরা এগারোজন দ্বিতীয় গরুর গাড়ির মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে, তারপর কাল সদরে গিয়ে বলবে, দুটো গরুর গাড়িই লুঠ হয়ে গেছে। কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।

দ্বিতীয় গরুর গাড়িতে কেবল মোহর ছিল; এগারোজন নিজেদের মধ্যে মোহর সমান ভাগ করে নিয়ে যার যেদিকে ইচ্ছে চলে গেল। এরা দু'জন এখানে এসেছে, গাছতলায় নিজেদের ভাগের মোহর পুঁতে রেখে সদরে ফিরে যাবে। তারপর সুযোগ সুবিধা বুঝে এখানে ফিরে আসবে এবং গুপ্তধন তুলে নিয়ে যাবে।—

সদাশিব গাছে বসে শুনল। সে চুপটি করে রইল; একটু নড়লে চড়লে এরা যদি টের পায় তাহলে তাকে কেটে ফেলবে। যাহোক, গর্ত খোঁড়া হলে ওরা দুটো থলি তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দিল। তারপর কথা বলতে বলতে চলে গেল। সদাশিব শুনতে পেল একজন বলছে, 'সিপাহীর কাজ আর নয়। এবার এই টাকা দিয়ে একটা দোকান খুলব, খুব বড় আতর গোলাপের দোকান। হবে না?'

অন্য সিপাহী বলল, 'আরে মিঞা, ওসব মতলব ছাড়। দোকান করলেই লোকের চোখ টাটাবে। তার চেয়ে চুপটি করে ঘরে বসো

গিয়ে, আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না।—আমি তো মাল নিয়ে হজ্ করবার নামে বেরিয়ে পড়ব, একেবারে দিল্লীতে গিয়ে বসব। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই দেখবে ওমরা হয়ে বসেছি। শোভানাল্লা!'

কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। সদাশিব অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। যখন দেখল কোনও দিক থেকে আর সাড়া-শব্দ আসছে না, তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল।

গর্তের ঢিলা মাটি আঙুল দিয়ে খুঁড়তে বেশি কষ্ট হল না। গর্তের তলা থেকে দুটি থলি বেরিয়ে এল। সদাশিব গুণে দেখল, প্রত্যেক থলিতে চারশো চক্‌চকে সোনার টাকা। সে আগে কখনও সোনার টাকা দেখেনি, চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল।

এই সময় হঠাৎ পিছন দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। সদাশিব চমকে উঠল; ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রায় একশো গজ দূরে নদীর ধার দিয়ে একদল ঘোড়সওয়ার আসছে। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে না, কদম চালে আসছে।

সদাশিব বিদ্যুদ্বেগে সোনার টাকাগুলো নিজের থলিতে ভরল থলিটা শক্ত করে কোমরে বাঁধল, তারপর আবার গাছে উঠে বসল। গাছের তলায় বেশি আলো নেই, ঘোড়সওয়ারেরা বোধ হয় তাকে দেখতে পায়নি।

তিন

ঘোড়সওয়ারের দল সদাশিবের গাছের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন একজন সওয়ার হাত তুলে বলল, 'দাঁড়াও।'

সকলে দাঁড়াল। সওয়ার বলল, 'নদীর কাছে ওটা কী জানোয়ার?'

আর একজন বলে উঠল, 'জয় ভবানী! ঘোড়া! এখানে ঘোড়া এল কোত্থেকে?'

আর একজন বলল, 'ঘোড়া! কোত্থেকে এল জানবার দরকার নেই। ধরে নিয়ে এস ঘোড়াটাকে। আমাদের দরকার।'

দু'জন সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে নদীর দিকে গেল।

সদাশিব গাছের ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। এরা যে মারাঠা হিন্দু তা এদের কথা শুনেই বোঝা যায়। হয়তো যে ডাকাতের দল বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করেছে এরা তারাই। কিন্তু—এরা যদি সদাশিবের ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তাহলে তো ভারি বিপদ! সদাশিব তাহলে শিবাজীর কাছে যাবে কি করে!

সদাশিব গাছের ওপর আর স্থির থাকতে পারল না। হোক ডাকাতের দল, তাই বলে তার ঘোড়া নিয়ে যাবে! সে গাছ থেকে নেমে এল।

ঘোড়সওয়ারের দল হঠাৎ গাছ থেকে একটা লোক নেমে আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল—'আরে! এ আবার কে?'

একজন বল্লম বাগিয়ে বলল, 'কে রে তুই?'

সদাশিব মোটেই ভয় পেল না, বলল, 'আমি তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সওয়ারেরা সর্দারকে দেখিয়ে দিল; সদাশিব সর্দারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের বয়স বেশি নয়, বড় জোর কুড়ি একুশ। সর্দার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, দুই হাতে একজন আহত লোককে সামনে ধরে আছে। সর্দার কোলের লোকটিকে বলছে, 'যেসা, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

আহত ব্যক্তি বলছে, 'কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দাও, আমি ঠিক যেতে পারব।'

এই সময় দু'জন সওয়ার সদাশিবের ঘোড়াটাকে এনে সর্দারের সামনে হাজির করল। তারা ঘোড়ার ছাঁদন-দড়ি খুলে মুখে লাগাম লাগিয়েছে। সর্দার চোখ তুলল। প্রথমেই সদাশিবের ওপর তার নজর পড়ল। সর্দার বলল, 'তুমি কে?'

'আমার নাম সদাশিব। তোমরা আমার ঘোড়া ধরেছ কেন?'

সর্দার বলল, 'ঘোড়ার মালিক তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি ডোঙ্গরপুরে।'

'ডোঙ্গরপুরে! সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তুমি গ্রাম থেকে এত দূরে এলে কি করে?'

'আমি শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

সর্দার কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সদাশিবের পানে চেয়ে রইল—'তাই নাকি? শিবাজীর সঙ্গে তোমার কি দরকার?'

'আমি শিবাজীর অধীনে যুদ্ধ করব।'

সর্দার এবার হাসল, বলল, 'তা বেশ। আমরাও শিবাজীর দলের লোক। তুমি আমাদের সঙ্গেই এস না।'

'যেতে পারি। কিন্তু আমার ঘোড়া?'

'তোমার ঘোড়াটা আমাদের একটু দরকার আছে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের দলের একজন জখম হয়েছে, ওর ঘোড়াটা মরে গেছে। তাই ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটা পেলে ওকে তার পিঠে বসিয়ে দেব। কেমন, দেবে তোমার ঘোড়া গড়ে পৌঁছে তুমি তোমার ঘোড়া আবার ফেরত পাবে।'

সর্দারের কথা বলবার ভঙ্গী এত মিষ্টি যে 'না' বলা যায় না। সদাশিব রাজী হল, বলল, 'কিন্তু আমি যাব কি করে?'

সর্দার বলল, 'তোমাকে আমি নিজের ঘোড়ায় তুলে নেব। আমার ঘোড়াটা মজবুত আছে, দু'জনের ভার বইতে পারবে।'

তখন কয়েকজন সওয়ার ধরাধরি করে আহত লোকটিকে সর্দারের ঘোড়া থেকে নামিয়ে সদাশিবের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। সদাশিব সর্দারের পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসল। ঘোড়সওয়ারের দল আবার আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

চলতে চলতে সদাশিব লক্ষ্য করল, সর্দার ছাড়া অন্য সব সওয়ারের ঘোড়ার দু'পাশ থেকে লম্বা লম্বা ছালা ঝুলছে, দেখলেই বোঝা যায় ছালার ভিতর ভারী মাল আছে। সদাশিবের মনে আর সন্দেহ রইল না যে এরাই বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করেছে। সঙ্গে একজন আহত লোক রয়েছে, সবই মিলে যাচ্ছে।

সওয়ারের দল আবছায়া জ্যোৎস্নায় উপত্যকার ভিতর দিয়ে লম্বা-লম্বি চলল। সদাশিব দেখল এরা পাহাড়ের পিঠ বেয়ে বেশি উঠছে না, এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় যাবার গুপ্তপথ কোথায় আছে এরা সব অন্ধিসন্ধি জানে। সেই সব সোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে সর্দারের সঙ্গে সদাশিবের দু'চারটে কথা হল। সর্দার প্রশ্ন করল, 'তুমি গ্রাম থেকে চলে এলে কেন?'

সদাশিব সরলভাবে বলল, 'মামা তাড়িয়ে দিয়েছে।' তারপর গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করল।

শুনে সর্দার বলল, 'মারাঠা দেশে সর্বত্র এই অবস্থা। মোগলদের তাড়াতে না পারলে দেশের অবস্থা ফিরবে না।'

সদাশিব প্রশ্ন করল, 'তোমরা এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

সর্দার বলল, 'তুমি যখন শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ তখন তোমাকে বলতে দোষ নেই। আমরা বিজাপুরীদের খাজনা লুঠতে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হল না। সদাশিবের কোমরে যে লুঠের মোহর বাঁধা আছে তা সে বলল না। সর্দারকে বলে কি হবে? বলতে হয় একেবারে শিবাজীকে বলবে।

সদাশিব এবার প্রশ্ন করল, 'তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ?'

সর্দার বলল, 'আমরা তোর্ণা দুর্গে যাচ্ছি।'

'কিন্তু শিবাজী তো পুণায় থাকেন!'

'এখন তোর্ণা দুর্গে আছেন।'

'তোর্ণা দুর্গ কী শিবাজীর?'

'কিছুদিন আগে বিজাপুরীদের ছিল, এখন শিবাজীর।'

'শিবাজী ভারি বীর—না?'

'শিবাজীর দলে সবাই বীর। তুমি শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ, তোমাকেও বীর হতে হবে।'

সদাশিব মারাঠা ছেলে, তার শরীরে ভয়-ডর নেই; সে সহজভাবে বলল, 'হব।'

* * *

ওরা যখন তোর্ণা দুর্গে গিয়ে পৌঁছল তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। উঁচু টিলার ওপর দুর্গ, লোহার দরজা। দু'জন সওয়ার বল্লমের কুঁদো দিয়ে দরজায় ঘা দিল—'হর হর মহাদেও!' অমনি দরজা খুলে গেল। সকলে দুর্গে প্রবেশ করল।

প্রথমেই আহত লোকটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সর্দার এবং আরও কয়েকজন দুর্গের লোক ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। দুর্গের অঙ্গন ঘিরে ঘরের সারি; মানুষ থাকার ঘর, রান্নাঘর, আস্তাবল, সব আছে। সওয়ারেরা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে আস্তাবলে নিয়ে গেল। সদাশিব একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দুর্গে আরও অনেক লোক আছে, দু'চার জন স্ত্রীলোকও আছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেউ কুয়া থেকে জল তুলছে, কেউ কাঠ ফাড়ছে, কেউ তলোয়ারে শান দিচ্ছে, কেউ ঘোড়া ডলাই-মলাই করছে; মেয়েরা এক জায়গায় বসে জাঁতা ঘুরিয়ে জোয়ার-বাজরি পিষছে। সকলেই কাজ করছে।

যে সওয়ারেরা ডাকাতি করতে গিয়েছিল তারা এবার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের কাঁধে দুটি করে ছালা। তারা ছালাগুলিকে অঙ্গনের মাঝখানে জমা করল। তারপর একজন বয়স্থ কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ইনি বোধহয় শিবাজীর খাজাঞ্চি! বড় বড় পাকা গোঁফ, পাকা গালপাট্টা; মাথায় নাক তোলা পাগড়ী-টুপী। ইনি এসে ছালা উজাড় করে পাথরের মেঝের ওপর টাকা ঢাললেন। স্তূপাকার রুপার টাকা। সেকালে টাকাকে হোন বলত; এক হোন চার টাকার সমান।

খাজাঞ্চি গুণে গুণে হোন দু'ভাগ করলেন। সকলে ঘিরে দেখতে লাগল আর নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-তামাশা করতে লাগল। সদাশিব একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল।

টাকা দু'ভাগ করে খাজাঞ্চি প্রথমে এক ভাগ ধামায় ভরে তোশাখানায় রেখে এল। ওটা শিবাজীর অংশ। তারপর বাকি যারা সঙ্গে ছিল তাদের ভাগ বাটোয়ারা শুরু হল। চল্লিশজন জোয়ান লুঠ করতে গিয়েছিল, টাকা সমান চল্লিশ ভাগ হল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল একশো আশী হোন। সবাই নিজের নিজের ভাগ নিয়ে চলে গেল।

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। কী মজার এদের জীবন! দলে যোগ দেবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

এই সময়ে একজন বল্লমধারী রক্ষী এসে বলল, 'তোমার নাম সদাশিব? এস, শিবাজী তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে চলল। না জানি শিবাজী কেমন লোক! তিনি কি আমাকে নেবেন? যদি বলেন, 'তোমার বয়স কম, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না।'

একটি বড় ঘর; পাথরের মেঝে, পাথরের দেয়াল; সরু সরু দুটি জানলা দিয়ে দুর্গের বাইরে দেখা যায়। শিবাজী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বললেন, 'এস সদাশিব।'

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল। যে সর্দারের সঙ্গে সে এক ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, সেই শিবাজী! এত কম বয়স! এই বয়সে সমস্ত দেশে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে! সে অবাক হয়ে বলল, 'তুমি শিবাজী!'

শিবাজী বললেন, 'তুমি ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছ দেখছি।—হ্যাঁ, আমিই শিবাজী।'

সদাশিব বলল, 'তুমি নিজে গিয়েছিলে লুঠ করতে?'

'হাঁ। নিজের কাজ আমি নিজেই করি।'

'তুমি একজন আহত লোককে কোলে করে আনছিলে!'

'ও আমাব বাল্যবন্ধু যেসাজী কঙ্ক। ও যদি জখম না হোত তাহলে দুটো গাড়িই লুঠ করতে পারতাম। কিন্তু সে যাক। তোমাব বয়স কত?'

সদাশিব বলল, 'সতেরো কি আঠারো।'

শিবাজী বললেন, 'বেশ, যুদ্ধ করবার বয়স হয়েছে। কিন্তু তোমার হাতিয়ার কৈ? হাতিয়ার না হলে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে?'

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল—'হাতিয়ার।'

শিবাজী বললেন, 'হাঁ। তলোয়ার বল্লম সাঁজোয়া—এসব না হলে কি যুদ্ধ করা যায়?'

সদাশিব নিরাশকণ্ঠে বলল, 'এসব তো আমার কিছু নেই।'

শিবাজী বললেন, 'যারা আমার দলে যুদ্ধ করতে আসে তারা নিজের ঘোড়া আর হাতিয়ার নিয়ে আসে। এখনও সৈন্যদের ঘোড়া আর হাতিয়ার দেবার ক্ষমতা আমার হয়নি, যখন হবে তখন দেব। তোমার ঘোড়া আছে কিন্তু হাতিয়ার নেই। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে?'

হঠাৎ সদাশিবের মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ তার মনেই ছিল না যে তার কোমরে থলির মধ্যে সোনার টাকা আছে। সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমার টাকা আছে, সোনার টাকা!' এই বলে কোমর থেকে

থলি খুলে শিবাজীর পায়ের কাছে সব মোহর ঢেলে দিয়ে বলল, 'রাও, এই নাও তোমার ভেট। আমাকে তোমার দলে ভর্তি করে নাও।'

এবার শিবাজী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। শেষে বললেন, 'এত মোহর তুমি কোথায় পেলে?'

সদাশিব তখন মোহর পাওয়ার ইতিহাস বলল। শুনে শিবাজী খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন, 'সাবাস! আমরা লুঠেছি রুপোর টাকা আর তুমি লুঠেছ সোনার মোহর। তোমার বুদ্ধিও আছে দেখছি। তোমার মত লোক আমি চাই। সব মোহর আমাকে দিতে হবে না। তবে আমার এখন টাকার দরকার, তাই তোমার টাকা আমার তোশাখানায় জমা রাখলাম। যখন চাইবে তখনই ফেরত পাবে। উপস্থিত একটি মোহর তুমি নিজের কাছে রাখো, এক মোহরে তোমার সমস্ত হাতিয়ার হবে।—তুমি তলোয়ার খেলা জানো?'

সদাশিবের বুক আবার দমে গেল। সে বলল, 'না।'

শিবাজী বললেন, 'সে জন্যে ভাবনা নেই। আমার নাপিত জীব মহালা মহারাষ্ট্র দেশের সেরা তলোয়ারবাজ, সে তোমাকে তলোয়ার খেলা শেখাবে। একমাসের মধ্যে তুমি শিখে যাবে।'

সদাশিব উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'আমি কবে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে বেরুব রাও?'

শিবাজী তার আগ্রহ দেখে হাসলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তার এখনও দেরি আছে। সামনে বর্ষা এসে পড়ল। বর্ষার সময় কোনও কাজ হয় না। এই কয় মাসে তুমিও তৈরি হয়ে যাবে। তারপর দশহরার দিন বেরুব। কি বল?'

'হাঁ রাও।'

শিবাজী তখন খাজাঞ্চিকে ডেকে মোহরগুলো নিয়ে যেতে বললেন। আর তলোয়ারবাজ জীব মহালাকে ডেকে বললেন, 'জীবা, তোমার একজন সাকরেদ এসেছে। ওকে ভাল করে তলোয়ার খেলা শেখাও।'

সদাশিবের অগ্নিকাণ্ড

তোর্ণা দুর্গে সদাশিবের বর্ষাকালটা ভারি আনন্দে কাটল। সে জীব মহালার কাছে তলোয়ার খেলা শেখে, দুর্গের কাজকর্ম করে। শিবাজীর মা জিজাবাঈ তাকে স্নেহ করেন, নিজের হাতে খাবার তৈরি করে তাকে খেতে দেন। দুর্গে তার সমবয়স্ক জোয়ান অনেক আছে। তাদের সঙ্গে সদাশিবের ভাব হয়েছে। এ যেন একটা প্রকাণ্ড পরিবার; সকলে সকলের আপনার জন। সকলে সকলের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সকলে যুদ্ধে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এখন বর্ষার এই তিন মাস কাটলে হয়।

মহারাষ্ট্র দেশে বৃষ্টি বেশি হয় না। বর্ষাকালে পশ্চিম সমুদ্র থেকে মেঘ এসে সহ্যাদ্রিতে আটকে যায়, মহারাষ্ট্র দেশে ঢুকতে পারে না। যে দু'চারটে মেঘ কোনও রকমে ঢুকে পড়ে তাতে অল্প বৃষ্টি হয়। কিন্তু পাহাড়ী নদীগুলোতে তখন জলের তোড় বেড়ে যায়; তখন সৈন্য-সিপাহী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর বড় অসুবিধা। তাই বর্ষা-কালে কেউ যুদ্ধ করতে বেরোয় না; দুর্গের মধ্যে কিংবা তাঁবু ফেলে

তিনটে মাস কাটিয়ে দেয়।

সদাশিব দুর্গের চূড়া থেকে যখন বাইরের দিকে তাকায় তখন দেখতে পায় চারিদিকের পাহাড় আর উপত্যকার গায়ে সবুজ রঙ ধরেছে। কোথাও পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরণা ঝরে পড়ছে। পাহাড় পেরিয়ে সদাশিবের দৃষ্টি নিজের গ্রামের দিকে চলে যায়। ওই ওদিকে তার গ্রাম! গ্রামে কুঙ্কু আছে। কি করছে সে এখন?

ক্রমে বর্ষা শেষ হয়ে এল। নদীর জল নেমে যাচ্ছে। সকলের মনে উৎসাহ। দশহরার দিন হচ্ছে যুদ্ধযাত্রার দিন। সেদিন সকলে সকলকে তিলক পরায়, কাঞ্চন গাছের পাতা পরস্পরকে দিয়ে ইষ্ট কামনা করে, তারপর 'হর হর মহাদেও' বলে যুদ্ধ করতে বেরোয়। সেই দশহরার দিন আর বেশি দূর নয়, মাত্র পাঁচ দিন।

সেদিন দুপুরবেলা আকাশের মেঘ হালকা হয়ে গিয়েছিল, ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘের ফাঁকে ভিজে রৌদ্র বেরিয়ে পড়েছিল। দুর্গের ছাদেব ওপর জিজাবাঈ আর শিবাজী পাশা খেলতে বসেছিলেন। বাজি রেখে খেলা হচ্ছে। মা বলেছেন, 'শিব্বা, তুই যদি আমাকে হারাতে পারিস আমি তোকে দুধি-হালুয়া খাওয়াব, আর যদি হেরে যাস আমাকে নতুন দুর্গ গড়ে দিবি। দুর্গের নাম রাখব রায়গড়।'

শিবাজী বলেছেন, 'বেশ, চলে এস। দুধি-হালুয়া আমি খুব ভালবাসি।'

খেলা আরম্ভ হয়েছে। শিবাজীর দুই বন্ধু তানাজী মালসরে আর যেসাজী কঙ্ক পাশে বসে খেলা দেখছেন। সদাশিবও ছাদে আছে। সে তার প্রিয় তলোয়ারটি নিয়ে ছাদে এসেছে। তলোয়ারটি তার চক্ষের মণি, একদণ্ডের তরে চোখের আড়াল করে না। সে মাঝে মাঝে এসে পাশা খেলা দেখছে, তারপর উঠে গিয়ে ছাদের আলসের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সন্তর্পণে তলোয়ারটি খাপ থেকে বার করে দু'পাক ঘুরিয়ে নিচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সে খুব ভাল তলোয়ার খেলা শিখেছে। তার মন আর ধৈর্য মানছে না। কবে সে সত্যিকারের যুদ্ধে তলোয়ার চালাবে?

ওদিকে খেলা চলছে, এদিকে সদাশিব আলসের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; হঠাৎ সে দেখতে পেল দূরে একজন সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গের দিকে আসছে। সদাশিব একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কালো রঙের ঘোড়া, সওয়ারের গায়ে লোহার সাঁজোয়া রৌদ্র লেগে ঝল্‌মল্ করে উঠছে। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সওয়ার আসছে।

সদাশিব হাঁক দিয়ে বলল, 'শিব্বারাও! একজন সাঁজোয়াপরা ঘোড়সওয়ার আসছে।'

শিবাজী পাশার দান ফেলতে যাচ্ছিলেন, এক লাফে এসে আলসের

কাছে দাঁড়ালেন; তাঁর দুই বন্ধু ছুটে এলেন। সদাশিব আঙুল দেখাল—'ঐ যে!'

শিবাজী চোখের ওপর হাত আড়াল করে কিছুক্ষণ অশ্বারোহীকে দেখলেন। এখনও অশ্বারোহী অনেক দূরে, তার মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না। তারপর শিবাজী তানাজীর দিকে ফিরে বললেন, 'রত্নাজী মনে হচ্ছে, না রে তানা?'

তানাজী সওয়ারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'হুঁ। রত্নাজী ছাড়া আর কে হতে পারে? ঐ যে হাত নাড়ছে. আমাদের দেখতে পেয়েছে। রত্নাজীই বটে।'

দুর্গচূড়া থেকে এরাও হাত নাড়ল। শিবাজী বললেন, 'তানা, তুই যা, রত্নাজীকে এখানে নিয়ে আয়। নিশ্চয় জরুরী খবর আছে।'

তানাজী ছাদ থেকে নেমে গেলেন। যেসাজী বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সুন্দর ঘোড়াটা। রত্নাজী এমন ঘোড়া পেল কোথায়?'

শিবাজী হেসে বললেন, 'নিশ্চয় চুরি করেছে।'

জিজাবাঈ ডেকে বললেন, 'কি দেখছিস রে শিব্বা?'

শিবাজী মা'র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'মা, রত্নাজী আসছে। বোধহয় গুরুতর খবর আছে।'

মা উঠে বললেন, 'আমি তবে যাই. রত্নাজীর জন্যে খাবার তৈরি করি গিয়ে। তোরা এখানেই থাকবি তো?'

'হাঁ মা।'

জিজাবাঈ নেমে গেলেন। শিবাজী আর যেসাজী সেইখানে বসলেন। সদাশিব পিছনে বসল। সে আস্তে আস্তে বলল, 'শিব্বারাও, রত্নাজী কে?'

শিবাজী অসমাপ্ত পাশাখেলার ঘুঁটিগুলি কৌটায় তুলে রাখতে রাখতে বললেন, 'রত্নাজী আমার গুপ্তচর। সে পদাতি সৈনিক সেজে বিজাপুরী ফৌজের সঙ্গে আছে।'

ব্যাপার বুঝে সদাশিব চমৎকৃত হয়ে রইল। শুধু তলোয়ার ঘোরানো নয়, দেশ উদ্ধার করতে হলে আরও অনেক কাজ করতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে রত্নাজীকে নিয়ে তানাজী এলেন। শিবাজী উঠে রত্নাজীকে আলিঙ্গন করলেন। রত্নাজীর বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর; মজবুত চেহারা, মুখে দাড়িগোঁফ আছে। যেসাজী তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'রত্না, এমন ঘোড়া কোথায় পেলে?'

রত্নাজী হেসে উঠল, বলল, 'সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ'র ঘোড়া। সেনাপতির অনেকগুলো ভাল ঘোড়া আছে। আমার ওপর হুকুম

হয়েছিল ঘোড়াগুলোকে সকাল বিকেল টহল দেওয়াবার। তা আমি আজ সকালবেলা সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটার পিঠে চড়ে চলে এলাম।'

সকলে হাসল। তারপর শিবাজী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এবার আসল খবর বল।'

রত্নাজী বলল, 'আসল খবর ভাল নয়। বিজাপুরের সাত হাজার ফৌজ তোর্ণা দুর্গ অবরোধ করতে আসছে। ওরা খবর পেয়েছে তুমি বর্ষার সময় তোর্ণা দুর্গে আছ, তাই বর্ষা শেষ হবার আগেই বেরিয়েছে। ওদের মতলব তোমাকে দুর্গ থেকে বেরুতে দেবে না, দুর্গ ঘেরাও করে কামান দিয়ে দুর্গ চুরমার করে দেবে। ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আর একশো পিপে বারুদ আছে।'

খবর শুনে তিন বন্ধু গালে হাত দিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবাজী মুখ তুলে বললেন, 'ওরা এখন কতদূরে?'

রত্নাজী বলল, 'সকালবেলা পনরো ক্রোশ দূরে ছিল। সঙ্গে কামান আছে তাই আস্তে আস্তে আসছে; আমার বিশ্বাস কাল দুপুরবেলা এসে পৌঁছবে।—পনরো দিন আগে আমরা বেরিয়েছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা জানতাম না; কেবল সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ আর তার চার-পাঁচজন পার্ষদ জানত। কাল রাত্রে সেনাপতির তাঁবুতে মজলিশ বসেছিল, মুর্গী আর শিরাজি চলছিল। আমি কানাতের বাইরে পাহারায় ছিলাম। ওদের কথা শুনে জানতে পারলাম তোর্ণা দুর্গে তোমাকে ঘেরাও করতে আসছে। ব্যাস্, আজ সকালে কেউ জেগে ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম।'

শিবাজী আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। সদাশিব ভাবতে লাগল—কি সর্বনাশ, সাত হাজার ফৌজ! সঙ্গে কামান! কি করে শিব্বারাও রক্ষা পাবেন? কি করে দুর্গ রক্ষা পাবে? হে মা ভবানী, আমাকে বুদ্ধি দাও, যেন শিবাজী মহারাজকে রক্ষা করতে পারি।

অনেকক্ষণ পরে শিবাজী কথা কইলেন। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা কি বল? এখন উপায় কি?'

তানাজী বললেন, 'তুমি বল। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

শিবাজী তখন বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোর্ণা দুর্গে এখন মাত্র আড়াইশো যোদ্ধা আছে। আড়াইশো লোক নিয়ে সাত হাজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। ওদের সঙ্গে কামান আছে, আমাদের একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় উপায় কি? দুটো রাস্তা আছে। এক, দুর্গ ছেড়ে পালানো। তাতে প্রাণ বাঁচবে বটে, কিন্তু দুর্গ ওদের দখলে চলে যাবে। দ্বিতীয় রাস্তা, দুর্গের তোরণ বন্ধ করে বসে থাকা। কিন্তু ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আছে। তোর্ণা ছোট দুর্গ, ওরা কামান দেগে দুর্গ ধুলো করে উড়িয়ে দেবে।'

শিবাজী চুপ করলেন। সকলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। শেষে যেসাজী বললেন, 'এ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই?'

শিবাজী প্রশ্ন করলেন, 'এ দুটো রাস্তার একটাও তোমাদের পছন্দ নয়?'

সকলে একসঙ্গে মাথা নাড়লেন, 'না।'

শিবাজী তখন একটু হেসে বললেন, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা—বারুদের পিপে।'

• সবাই অবাক। 'বারুদের পিপে!'

'হাঁ। ওদের সঙ্গে একশো পিপে বারুদ আছে। সেই বারুদই এখন আমাদের ভরসা।'

তানাজী বললেন, 'বারুদ আমাদের ভরসা! কি বলছ তুমি, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে বলছি শোন।' এই বলে শিবাজী দ্রুতকণ্ঠে তাঁর মতলব প্রকাশ করে বললেন। শুনে সকলের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল্ করে উঠল। তানাজী নিজের ঊরুতে প্রচণ্ড চড় মেরে বললেন, 'আমি যাব।'

যেসাজী বললেন 'তোর যে প্রকাণ্ড চেহারা, তোকে মানাবে না। আমি যাব।'

রত্নাজী করুণ স্বরে বলল, 'আমাকে যে দেখলেই চিনে ফেলবে। নইলে আমি যেতাম।'

শিবাজী বললেন, 'তোমাদের কাউকে দিয়ে হবে না।'

তানাজী বললেন, 'তবে কি তুমি যাবে নাকি? না, সে হবে না। তোমাকে আমরা যেতে দেব না। শেষকালে যদি—'

শিবাজী বললেন, 'না, আমি যাব না। যাবে সদাশিব।'

সদাশিব শিবাজীর পিছনে বসে শুনছিল, সে চমকে উঠল। শিবাজী তাকে সামনে টেনে এনে বললেন, 'সদাশিব দেখতে ছোট-খাটো, এখনও ভাল করে গোঁফ বেরোয়নি; তাছাড়া ওর বুদ্ধি আছে। এ কাজ যদি কেউ পারে তো সদাশিব।'

আনন্দে সদাশিবের বুক নেচে উঠল। সে বলল, 'রাজা, কি করতে হবে আমাকে শিখিয়ে দাও।'

শিবাজী তখন সদাশিবকে শেখাতে আরম্ভ করলেন।

দুই

পরদিন ভোরবেলা, তখনও সূর্যোদয় হয়নি, দুর্গের লৌহকবাট একটু ফাঁক হল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সদাশিব আর একপাল ছাগল। কবাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সদাশিবের গায়ে ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়। তার ডান হাতে পাঁচনবাড়ি; পাঁচনবাড়ির মুঠে লোহা দিয়ে বাঁধানো। বাঁ হাতে নারকেল ছোবড়ার লম্বা দড়ি গোল করে পাকানো। সে একবার পিছন ফিরে দুর্গদ্বারের পানে তাকাল, তারপর ছাগলের পিছন পিছন চলল।

দুর্গে গোটা কুড়ি ছাগল থাকে, কারণ মা জিজাবাঈ ছাগলের দুধ খান। একটা ছোট ছেলে রোজ ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ সে আসেনি, তার বদলে সদাশিব ছাগল চরাতে বেরিয়েছে।

ছাগলগুলো লাফাতে লাফাতে ম্যা ম্যা করে ডাকতে ডাকতে চলল। দুর্গের কাছে-পিঠে ঘাস বা ঝোপঝাড় নেই; পাথর ছড়ানো মাটি। তারপব ক্রমে ঘাস গজাতে শুরু করেছে; সমতলে নেমে এলে শুধু ঝোপঝাড় নয়, দু'চারটে বড় গাছও দেখা যায়। বর্ষার জলে সব সবুজ হয়ে উঠেছে। ছাগলগুলো সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চরতে লাগল।

সূর্য উঠল। আজ আকাশে বেশি মেঘ নেই। সদাশিব ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, আর তার চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে। যেদিক থেকে কাল দুপুরবেলা রঘুজী ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, সেই দিকে তার চোখ বার বার যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে এখনো মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পেছনে দুর্গের কালো মূর্তি আকাশের গায়ে মাথা তুলেছে। সব ঘিরে শুয়ে আছে উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি। নিস্তব্ধ সকাল।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। ছাগলেরা ঝোপঝাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে. সদাশিব তাদের পিছনে আছে। দু'একটা ছাগল যখন এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে, তখন তাদের তাড়িয়ে দলে ফিরিয়ে আনছে। সদাশিব গাঁয়ের ছেলে, ছাগল চরানো তার কাছে নতুন নয়। ছাগল চরাতে চরাতে সে বেশ খানিকটা দূরে চলে এল।

মাঝে মাঝে রৌদ্র ফুটে বেরুচ্ছে আবার মেঘের আড়ালে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে; পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া ওঠা-নামা করছে। মাটিতে অসংখ্য পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে চক্‌মকি পাথর আছে; সেগুলো সূর্যের আলো লেগে ঝক্‌মক করে উঠছে। সদাশিব এক টুকরো নুড়ির মত চক্‌মকি পাথর হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে নুড়িটা কোমরে গুঁজে নিয়ে আবার ছাগলের পিছনে চলল।

সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। সদাশিব ছাগলের পাল নিয়ে দুর্গ থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে এসে পড়েছে, এমন সময় পাহাড়ের দিক থেকে আওয়াজ শুনে সে কান খাড়া করল। আওয়াজ নয়, আওয়াজের প্রতিধ্বনি। গ্রীষ্মকালে শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে যখন দুপুরবেলার গরম হাওয়া বয়ে যায়, তখন যে-রকম শব্দ হয় সেই

রকম শব্দ। বিজাপুরের সাত হাজার ফৌজ আসছে। এখনও তাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আসছে।

আর খানিকক্ষণ পরে তাদের দেখা গেল। ঐ দূরে পাহাড়ের ফাঁক থেকে পিল্‌পিল্‌ করে বেরুচ্ছে! আগে আগে আসছে ঘোড়-সওয়ারের দল, তার পিছনে পদাতিক; তার পরে কুড়িটা গরুর গাড়িব ওপর কুড়িটা কামান। প্রত্যেক গরুব গাড়ি টানছে আট দশটা বলদ, তারপর আরও অগুনতি গরুর গাড়িতে তাঁবু রসদ আরও কত কি।

এক সঙ্গে এত মানুষ সদাশিব জীবনে কখনও দেখেনি। সে চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল, তার বুক দুরদুর করে উঠল। সে মনে মনে মা ভবানীর নাম স্মরণ করল, তারপর ছাগলগুলোকে একটা ঝোপের মধ্যে জড়ো কবে চুপটি করে বসে বইল।

* * *

বেলা তিন প্রহরে বিজাপুরী সৈন্য তোর্ণা দুর্গের সামনে থানা দিয়ে বসল। দুর্গের কাছে গেল না, কারণ দুর্গে যদি বন্দুক থাকে তবে পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল; দুর্গদ্বার থেকে তিনশো গজ দূবে চক্রাকারে ঘিরে বসল। অসংখ্য তাঁবু দেখতে দেখতে খাড়া হল; তাদেব মাঝখানে সেনাপতির প্রকাণ্ড শিবির। চারদিকে লোক লস্কর হুকুম বরদার খানসামা পিল্‌পিল্‌ করতে লাগল। কড়্‌কড়্‌ কড়্‌কড়্‌ শব্দে নাকাড়া বেজে উঠল। ছাউনির পিছন দিকে বাবুর্চিখানা, সেখানে সাত হাজার সিপাহীর রান্না চড়ল।

সেনাপতির শিবিরের সামনে দিওয়ান পাতা হযেছে; পুরু গালিচার ওপর বড় তাকিয়া। লিযাকৎ খাঁ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে গড়গড়া টানছেন। তিনি বয়স্থ ব্যক্তি, ঝানু সেনাপতি। গড়গড়া টানতে টানতে তিনি দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'জন পার্ষদ হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসে আছেন। সেনাপতি ক্লান্ত, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছেন।

সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ দুর্গের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'পাহাড়ী ইঁদুর খাঁচায় ধরা পড়েছে, পালাতে পারেনি।'

একজন পার্ষদ বললেন, 'পালাবার সময় পায়নি। পালালে কিল্লার দরজা খোলা থাকত।'

সেনাপতি বললেন, 'ও থেকে কিছু বলা যায় না। শিবাজী ভয়ানক ধূর্ত, দু'জন লোককে কিল্লায় রেখে বাকি সকলকে নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু পালায়নি; দুর্গেই আছে। আমি চরের মুখে খবর পেয়েছি।'

অন্য পার্ষদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সেই বেইমান ঘোড়া-চোরটা?'

সেনাপতির মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'সে হারামখোর কুত্তাটা শিবাজীর গুপ্তচরই বটে, কাল দুপুরবেলা কিল্লায় এসেছে। শিবাজী খবর আগেই পেয়েছে, কিন্তু লুঠের মাল নিয়ে পালাবার সময় পায়নি। এখন আর যাবে কোথায়? সবাইকে একসঙ্গে তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।'

এই সময় একজন জোয়ান ফৌজদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল, 'হজরৎ, বারুদের পিপে ছাউনির পিছন দিকে কানাত ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। কামানগুলো এখনও গরুর গাড়ি থেকে নামানো হয়নি। এখন কি করতে হবে হুকুম করুন।'

সেনাপতি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন; সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। তিনি বললেন, 'আজ সন্ধ্যা হয়ে এল। কামান গরুর গাড়ি থেকে নামাবার দরকার নেই। কাল সকালে দুর্গের সামনে কামান বসাব। আজ আর কোনও কাজ নেই, তোমরা আরাম করো গিয়ে। রাত্রে যেন পাহারা পুরোদস্তুর থাকে।'

'জো হুকুম।' ফৌজদার সেলাম করে চলে গেল।

সেনাপতি কিছুক্ষণ বসে গড়গড়া টানলেন; তারপর হঠাৎ পাশের দিক থেকে মিহি গলার ম্যা ম্যা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। তার সঙ্গে সিপাহীদের হাসির হল্লা। শব্দটা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি চোখ পাকিয়ে তাকালেন। কী ব্যাপার!

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, দুই সারি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে এক পাল ছাগল আসছে, তাদের পিছনে একজন সিপাহী একটা ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছে। তাদের আশেপাশে একদল সিপাহী হাসতে হাসতে আসছে। তাঁবুতে ছাগলের পাল! মজা দেখবার জন্যে সিপাহীরা সঙ্গে চলেছে।

যে-সিপাহী সদাশিবের কোমরে ছাগল-দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছিল, সে সেনাপতির সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সেনাপতি বললেন, 'কান্ডটা কি? এ ছেলেটা কে? এত ছাগল কোত্থেকে এল?'

সিপাহী বলল, 'হজরৎ, এই ছেলেটা ছাগলগুলোকে নিয়ে ছাউনির পশ্চিমদিকের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ম্যা ম্যা শব্দ শুনে আমি গিয়ে ওকে ধরেছি।'

'সাবাস!' সেনাপতি তাঁর বড় বড় চোখ সদাশিবের দিকে ফিরিয়ে মোটা গলায় বললেন, 'তুই কে রে?'

সদাশিব ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

যেসব সিপাহী মজা দেখতে এসেছিল তারা হো হো করে হেসে উঠেই আবার চুপ করল। সেনাপতির সামনে হাসলে গোস্তাকি

হয়।

সেনাপতি দেখলেন ছেলেটার বয়স চৌদ্দ পনরোর বেশি নয়। তাঁর সামনে এসে খুব ভয় পেয়েছে। তিনি গলার আওয়াজ একটু নরম করে বললেন, 'ভয় নেই। তুই ছাগল কোথায় পেলি?'

সদাশিবের কান্না একটু কমল। সে বলল, 'দুর্গের ছাগল। আমি চরাই।'

সেনাপতি তখন তাকে জেরা আরম্ভ করলেন 'তুই দুর্গে থাকিস?'

সদাশিব বলল 'হ্যাঁ।'

'শিবাজী দুর্গে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আর কে আছে?'

'আরও দু শো তিনশো লোক আছে।'

'কাল বাইরে থেকে দুর্গে কোনও লোক এসেছিল?'

'আমি জানি না। আমি ভোরবেলা ছাগল চরাতে বেরুই। সন্ধ্যে বেলা দুর্গে ফিরে যাই।'

'আজ ফিরে যাসনি কেন?'

'ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। আমি ভয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।'

সদাশিবের আকার প্রকার দেখে সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁর বিশ্বাস হল যে সে সত্যি কথা বলছে, তাঁর সামনে মিথ্যে কথা বলবে এত বুদ্ধি তার নেই। তিনি তখন সিপাহীকে বললেন, 'ওর কোমরের দড়ি খুলে দাও।'

দড়ি খোলা হলে সদাশিব দড়ি আর লাঠি হাতে মাটিতে বসে আবার কাঁদতে শুরু করল।

সেনাপতি বললেন, 'আবার কি হল?'

সদাশিব বলল, 'আমি দুর্গে ফিরে যাব।'

'দুর্গে ফিরে যাবি কি করে? দুর্গের দোর যে বন্ধ।'

'আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

সিপাহীরা হেসে উঠল। সেনাপতিও একটু হাসলেন। বললেন, 'এটাকে নিয়ে যা, কিছু খেতে দে। আর ছাগলগুলোকে বাবুর্চি-খানায় পাঠিয়ে দে।'

*　　*　　*

যে-সিপাহী সদাশিবকে ধরে এনেছিল সে তাকে বাবুর্চিখানার

দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবি?'

সদাশিব বলল, 'বাজ্‌রির রুটি আর চিঞ্চের চাট্‌নি।'

বাজ্‌রির রুটি আর তেঁতুলের চাট্‌নি! সিপাহী হেসে উঠল। বলল, 'কোফ্‌তা কাবাব খাবি না?'

সদাশিব বলল, 'সে কাকে বলে?'

'গোস্ত্‌! গোস্ত্‌! খাসনি কখনো?'

'না, ও খেলে জাত যায়। ও আমি খাব না।'

বিজাপুরী ফৌজে অনেক হিন্দু সৈন্যও ছিল: তাদের আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। সিপাহী সদাশিবকে সেইখানে নিয়ে গেল। খোলা জায়গায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না চড়েছে, অনেক টিকিধারী পাচক রান্না করছে। সিপাহী একজনকে ডেকে বলল. 'সেনাপতির হুকুম। এই ছেলেটাকে খেতে দাও।'

পাচক জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?'

সিপাহী বলল, 'অত খোঁজে তোমার দরকার কি? যা বলছি কর।' বলে সিপাহী চলে গেল।

সদাশিব একা। ছাগলগুলোকে অন্য সিপাহীরা কান ধরে মুসলমানদের বাবুর্চিখানায় নিয়ে গেছে। সদাশিবের মনে একটু দুঃখ হল, কিন্তু কি করবে? সে দড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিল, লাঠিটা পাশে রেখে মাটিতে বসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। এটা ছাউনির পিছন দিক। কিছু দূরে দুই সারি গরুর গাড়ির ওপর মোটা মোটা কামান চাপানো রয়েছে, যেন তাল গাছের গুঁড়ি। দুই সারির মাঝখানে সরু গলির মত জায়গায় কানাত-ঢাকা কুপোর মত জিনিস রয়েছে। দু'জন দাড়িওয়ালা চৌকিদার বল্লম কাঁধে গরুর গাড়ির সারির দু'পাশে পাহারা দিচ্ছে। সদাশিব আন্দাজ করল, কানাত-ঢাকা জিনিসগুলি বারুদের পিপে। পাছে বৃষ্টি হয়, বারুদ ভিজে যায়, তাই কানাত ঢাকা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে পাচক সদাশিবকে খাবার এনে দিল। জোয়ারির মোটা রুটি, তুরের ডাল, আর তেলাকুচোর ভাজি, তার সঙ্গে ঘি। সদাশিব পেট ভরে খেল।

তখনও রাত্রি হয়নি, কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সদাশিব খাওয়া শেষ করে উঠে ছাউনির এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চারিদিকে লোক লস্কর হামাল পিয়াদা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সদাশিবকে কেউ গ্রাহ্য করল না।

ক্রমে রাত্রি হল, চারিদিকে মশাল জ্বলে উঠল। প্রত্যেক তাঁবুতে ভারে ভারে খাবার যাচ্ছে, সিপাহীরা খেতে বসেছে। এই ফাঁকে সদাশিব রাত্রির মত একটা আস্তানা খুঁজতে বেরুল।

যেখানে কামানের গরুর গাড়ি সাজানো ছিল সেখান থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে এক গাদা ফাল্তু তাঁবু আর কানাত পড়ে ছিল। সদাশিব তারই মধ্যে গিয়ে গুটিসুটি পাকিয়ে শুয়ে রইল। আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গরুর গাড়ির দু'পাশে দু'জন চৌকিদার টহল দিচ্ছে। সদাশিব পাঁচনবাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইল।

তিন

বেশ এক ঘুম দিয়ে সদাশিব চোখ মেলল। চাঁদ অস্ত গেছে, আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এক আকাশ তারা ঝল্মল্ করছে। ছাউনিতে সাড়া শব্দ নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সদশিব তাঁবু আর কানাতের বিছানার ওপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। কোমরে হাত দিয়ে দেখল নারকেল ছোবড়ার দড়ি আর চক্মকি পাথর ঠিক আছে, লোহা-বাঁধানো পাঁচনবাড়িও হাতের কাছে আছে। এতক্ষণে তার চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে; তার কানও খুব তীক্ষ্ণ। সে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে রইল।

না, ছাউনির সবাই ঘুমোয়নি, চৌকিদারেরা জেগে আছে। কামানের পাশে দু'জন চৌকিদার আগের মতই টহল দিচ্ছে; তাছাড়া কয়েক জন চৌকিদার মশাল জ্বালিয়ে সমস্ত ছাউনি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। তারা চক্কর দিতে দিতে মাঝে মাঝে চিৎকার করে হাঁক দিচ্ছে-- 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! দুশমনের এলাকায় সাবধানে ঘুমোও।' মশালের আলোতে চৌকিদারদের দেখে মনে হয় ওরা মানুষ নয়। প্রেতমূর্তি; ওদের বিকট হাঁক শুনে পিলে চমকে ওঠে।

সদাশিব মনে মনে মা ভবানীর নাম স্মরণ করে নিল, তারপব হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর গাদা থেকে নামল। যেদিকে বারুদের পিপে কানাত-ঢাকা আছে সেই দিকে চলল। কালো বিড়াল অন্ধকারে যেভাবে চলে সেইভাবে চলল। একটু শব্দ হল না।

যে চৌকিদারগুলো ছাউনির চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে তারা অন্য দিকে চলে গেল। যে দু'জন কামান পাহারা দিচ্ছে তাদের মশাল নেই, অন্ধকারেই পাহারা দিচ্ছে; তারা একবার কামানের সারির এধারে আসছে, একবার ওধারে চলে যাচ্ছে। সদাশিব কামানের সারির দশ-বারো গজের মধ্যে এসে একটা ঝোপের আড়ালে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল। চৌকিদার দু'জন এদিকেই আসছে।

সদাশিব নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল। চৌকিদারদের পায়ের

শব্দ এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তারা নীচু গলায় কথা কইছে। একজন বলল, 'কি মিঞা, ঠাণ্ডা লাগছে?'

দ্বিতীয় চৌকিদার বলল, 'হাঁ আগা, বেশ ঠাণ্ডা। পাহাড়ে দেশ, তাই রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে। একটু আগুন জ্বালতে পারলে বড় ভাল হত।'

আগা বলল, 'খবরদার! আগুনের নাম মুখে এনো না। বারুদের কাছে আগুন জ্বাললে গর্দানে মাথা থাকবে না।'

উত্তরে মিঞা কি বলল শোনা গেল না, তারা আবার কামানের সারির দু'পাশ দিয়ে উল্টো দিকে ফিরে চলল। তাদের কথা শুনে সদাশিব নিশ্চিন্ত হল, বারুদের পিপে এখানেই আছে।

তাদের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর সদাশিব ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল, হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার মত গরুর গাড়ির দিকে চলল। তাকে যদি কেউ দেখতে পেত, মনে করত একটা প্রকাণ্ড কাঁক্‌ড়া গর্ত থেকে বেরিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে; মানুষ বলে চিনতে পারত না।

দশ-বারো গজ এইভাবে গিয়ে সদাশিব সামনের গরুর গাড়ির তলায় লুকিয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় শুনতে পেল চৌকিদারেরা ফিরে আসছে। সদাশিব গরুর গাড়ির তলায় মাটির সঙ্গে মিশে নিঃসাড়ে বসে রইল।

চৌকিদারেরা সামনা সামনি হয়ে আবার কথা কইল। সদাশিব তাদের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে; তারা এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে হাত বাড়িয়ে তাদের ছুঁতে পারে।

একজন বলল, 'মিঞা, এ সময় এক পেয়ালা শিরাজি হলে কেমন হত?'

মিঞা বলল, 'শিরাজি মাথায় থাক, এক ভাঁড় তাড়ি পেলে বর্তে যেতাম আগা।'

আগা গলার মধ্যে হাসল, তারপর দু'জনে আবার ফিরে চলল। তাদের পায়ের আওয়াজ যখন দূরে চলে গেল তখন সদাশিব গরুর গাড়ির তলা থেকে ভিতর দিকে যেখানে কানাত-ঢাকা বারুদের পিপে আছে সেইখানে ঢুকে পড়ল, কানাতের কোণ তুলে তার তলায় লুকিয়ে রইল। এখানে বেশ নিরাপদ, বাইরে থেকে দেখা যাবার ভয় নেই।

এতক্ষণে সদাশিব ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছে। এবার আসল কাজ। কানাতের তলায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, মিশ্‌মিশে অন্ধকার। সদাশিব হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল। তার হাতে ঠেকল একটা পিপের গা।

পিপের ওপর তক্তা ঢাকা, তার ওপর কানাত। সদাশিব তক্তার

তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল; বালির মত গুঁড়ো পিপেতে ভরা রয়েছে। শিবাজী মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সদাশিবের বুঝতে বাকি রইল না যে এ বারুদই বটে। তার বুক নেচে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ—ঢং ঢং ঢং ঢং। নিঃশব্দ রাত্রির মাঝখানে এই আওয়াজ যেন আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে এল।

কিছুই নয়, ছাউনিতে রাত দুপুরের ঘণ্টা বাজছে! কিন্তু সদাশিব প্রস্তুত ছিল না, তাই একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা থেমে যাবার পরও সে খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর শুনতে পেল ছাউনির চৌকিদারেরা হাঁক দিতে দিতে চলে গেল, 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার—!'

সদাশিব চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার!

কোমর থেকে নারকেল ছোবড়ার দড়ি খুলে তার একটা মুখ সে পিপের বারুদের মধ্যে গুঁজে দিল, দড়ির অন্য মুখটা মাটিতে রেখে কষি থেকে চকমকি পাথরের নুড়ি বার করল। পাঁচনবাড়ির মুঠ লোহা বাঁধানো। সদাশিব অতি সন্তর্পণে লোহা দিয়ে চকমকি ঠুকতে লাগল। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। খুব আস্তে ঠুকতে হবে, কানাতের বাইরে আওয়াজ না যায়! চৌকিদারেরা যদি আওয়াজ শুনতে পায় তাহলেই সর্বনাশ।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। আগুনের ছোট ছোট ফুলকি বেরিয়ে ছোবড়ার দড়ির মুখে পড়তে লাগল। ক্রমে দড়ির মুখে আগুন ধরল। একটু-খানি আগুন, প্রায় চোখে দেখা যায় না; কিন্তু একবার যখন ধরেছে তখন আর নিভবে না। দড়ি পুড়তে পুড়তে আগুন বারুদের পিপেয় গিয়ে ঢুকবে। তখন...

বাইরে চৌকিদার দু'জন নিশ্চিন্ত মনে টহল দিচ্ছে। তারা জানে না তাদের হাতের কাছে কী ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলছে।

তারপর সুযোগ বুঝে সদাশিব কানাতের তলা থেকে বেরিয়ে এল। ছায়ার মত ছাউনি পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে দুর্গের দিকে ছুটল। কেউ কিছু জানতে পারল না।

দুর্গের দরজায় সদাশিব পাঁচনবাড়ির ঠোকা দিল। স্বয়ং শিবাজী দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পিছনে দুর্গের সমস্ত লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজ হয়েছে?'

সদাশিব বলল, 'হয়েছে।'

শিবাজী দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুর্গের ছাদে আল্‌সের ধারে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ভেদ করে তাদের দৃষ্টি দূরে ওই ছাউনির ওপর গিয়ে পড়েছে। ছাউনি ভাল দেখা যাচ্ছে না; কেবল তারার আলোয় সাদা তাঁবুর আভা। আর তাদের ঘিরে জোনাকির মত মশালের আলো পাক খাচ্ছে।

শিবাজী মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর এক পাশে সদাশিব, অন্য পাশে তানাজী আর যেসাজী। কারুর মুখে কথা নেই, সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছেন। নির্দয় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—নারকেল ছোবড়ার দড়ির মুখে এতটুকু আগুন।

সময় যেন আর কাটে না। একটি মুহূর্ত কাটছে আর সদাশিব ভাবছে—কী হল? এখনও কিছু হচ্ছে না কেন? তিন হাত দড়ি জ্বলতে এতক্ষণ সময় লাগে? তবে কি আগুন নিবে গেছে!...

ক্রমে পূবের আকাশে একটুখানি আলোর ছোঁয়া লাগল, দক্ষিণ দিক থেকে কন্‌কনে ঠান্ডা বাতাস বইতে লাগল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে—

হঠাৎ ছাউনির মাটি বিদীর্ণ করে আগুনের একটা উচ্ছ্বাস আকাশে ছড়িয়ে পড়ল; তার তীব্র আলোতে চোখ ঝলসে যায়। তারপর এল আওয়াজ। কী ভীষণ আওয়াজ! এক লক্ষ রাক্ষস যেন একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। একটা দমকা হাওয়া আগুনের হলকার মত দুর্গের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

'হর হর মহাদেও!'

দুর্গের ছাদে তানাজী টপ করে সদাশিবকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন। শিবাজী বললেন, 'জয় মা ভবানী!—চল, এখনি দুর্গ থেকে বেরুতে হবে।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে শিবাজী তাঁর আড়াইশো সৈন্য নিয়ে বেরুলেন। যেখানে ছাউনি ছিল সেখানে ছাউনির চিহ্ন নেই; প্রায় পাঁচশো সিপাহীর মৃতদেহ পড়ে আছে। জ্যান্ত মানুষ একটাও নেই, সব পালিয়েছে। ঝলসানো মাটির ওপর কেবল তালগাছের গুঁড়ির মত কামানগুলো পড়ে আছে, গরুর গাড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তবু ছাউনিতে এবং তার আশেপাশের জায়গায় অনেক জিনিস পাওয়া গেল। টাকা মোহর হাঁড়িকুড়ি বল্লম তলোয়ার, আরও কত ধাতুনির্মিত জিনিস। শিবাজীর সৈন্যেরা যে যা পেল দখল করল।

শিবাজী কামানগুলোকে দখল করলেন। কামান দুর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। একটা কামান তুলে নিয়ে যেতে ত্রিশজন করে লোক লাগল। অনেক কামানের গোলাও চারিদিকে পড়ে ছিল,

সেগুলোকেও আনা হল। শিবাজী বললেন, 'এই কামান দিয়ে আমি তোর্ণা দুর্গ রক্ষা করব। যত ইচ্ছা শত্রু আসুক, আর ভয় করি না।'

সদাশিব বলল, 'কিন্তু—বারুদ?'

শিবাজী বললেন, 'বারুদ তৈরি করতে জানে এমন আতস কারিগর পুণায় আছে, তাদের নিয়ে আসব। বারুদ তৈরি করা শক্ত নয়, কামান ঢালাই করাই শক্ত। এখন কামান পেয়েছি, আর কারুর সাধ্য নেই তোর্ণা দুর্গ কেড়ে নেয়।'

বিকেলবেলা সবাই দুর্গে ফিরে এলেন। সবাই আনন্দে আত্মহারা, সবাই সদাশিবকে কাঁধে তুলে নাচতে চায়। কিন্তু সদাশিব পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কাঁধে উঠে নাচা তার অভ্যাস নেই।

সন্ধ্যার সময় জিজাবাঈ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'কি খাবি বল?'

সদাশিব বলল, 'দুধির হালুয়া।'

সদাশিব আগে কখনও দুধির হালুয়া অর্থাৎ লাউয়ের হালুয়া খায়নি।

সদাশিবের দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

শিবাজীর বাবা শাহজী ভোঁসলে ছিলেন বিজাপুর রাজ্যের একজন মনসবদার। তাঁকে বিজাপুর দরবারে থাকতে হত; সুলতান যখন যেখানে যেতে হুকুম করতেন তখন দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হত। পুণা ছিল শাহজীর খাস জায়গীর, কিন্তু পুণায় তিনি বেশি আসতে পারতেন না; শিবাজী তাঁর মা জিজাবাঈকে নিয়ে পুণায় থাকতেন। বাপের সঙ্গে ছেলের দেখা সাক্ষাৎ হত না। এই কারণে শিবাজী পিতৃশাসনের বাইরে স্বাধীনভাবে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

বড় হয়ে শিবাজী যখন বিজাপুরের দুর্গগুলি একে একে দখল করতে আরম্ভ করলেন তখন সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ শাহজীকে ডেকে বললেন, 'এ কি রকম কথা! তুমি আমার মনসবদার, আর তোমার ছেলে আমার দুর্গ কেড়ে নিচ্ছে! তুমি ছেলেকে শাসন করতে পার না?'

শাহজী বললেন, 'হজরৎ, আমার ছেলে বড় দুষ্টু, আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি। সে আমার শাসন মানে না, আপনিই তাকে শাসন করুন।'

সুলতান মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর একবার ইচ্ছা হল শাহজীকে হুকুম করেন—তুমি আমার পক্ষ থেকে সৈন্য নিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। শাহজী যদি যুদ্ধ করতে গিয়ে দলবল নিয়ে ছেলের সঙ্গে মিলে যান তাহলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। সুলতান বললেন, 'আচ্ছা, তোমার ছেলেকে আমিই শাসন করব।—তুমি যাও, সেনাপতি মুস্তাফা খাঁকে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে পাঠাচ্ছি, তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দাও।'

জিঞ্জি দুর্গ বিজাপুরের দক্ষিণে, আর পুণা বিজাপুরের উত্তরে, পুণা থেকে জিঞ্জি প্রায় তিনশো ক্রোশ দূরে। শাহজী জিঞ্জি চলে গেলেন। তারপর আদিল শাহ শিবাজীকে দমন করবার অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত সাত হাজার সৈন্য পাঠালেন। এই সাত হাজার সৈন্যের কী দশা হল তা আমরা জানি।

বিজাপুরের সাত হাজার সৈন্য বারুদের বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পর তোর্ণা দুর্গে সারা দিন খুব আনন্দ উৎসব চলল। শত্রু নিপাত হয়েছে, এখন আর দশহরার দিন যুদ্ধ যাত্রা করবারও দরকার নেই। বিনা যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করেছেন শিবাজী।

কিন্তু তবু আনন্দ উৎসবের মধ্যেও শিবাজীর মনে একটা দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। এই সেনা-নিপাতের খবর যখন বিজাপুর দরবারে পৌঁছবে তখন সুলতান কী করবেন? শিবাজীকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু শিবাজীর বাবা শাহজী তাঁর মুঠোর মধ্যে। রাগের জ্বালায় সুলতান যদি শাহজীকে হত্যা করেন?

পরদিন বিকেলবেলা শিবাজী বন্ধুদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। বন্ধুদের মধ্যে তানাজী যেসাজী আর বাজি পসলকর। মা জিজাবাঈও বসে মন্ত্রণা শুনছেন। ছেলেদের মন্ত্রণার সময় জিজাবাঈ প্রায়ই উপস্থিত থাকেন। হাজার হোক ওরা ছেলেমানুষ, যদি কাঁচা কাজ করে ফেলে তাই তিনি নজর রাখেন। কিন্তু নিতান্ত দরকার না হলে কথা বলেন না।

সদাশিব সেদিন মন্ত্রণা-সভায় ছিল না। সারা দিন হৈ হৈ করার পর সে আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করছিল। ঘোড়াটি এ কয় মাসে খেয়ে-দেয়ে বেশ মোটা-তাজা হয়েছে।

'সদাশিউউউ—' কে ডাকছে? তানাজীর মোটা ভরাট গলা। সদাশিব তাড়াতাড়ি আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে তাকালো। ছাদের

আলসের কাছে দাঁড়িয়ে তানাজী হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছেন।

সদাশিব ঘোড়ার ডলাই-মলাই ছেড়ে তখনি ওপরে উঠে গেল। নিশ্চয় গুরুতর ব্যাপার।

ছাদের মাঝখানে সভা বসেছে। শিবাজী কথা বলছেন, আর সকলে বসে শুনছে। সদাশিব চুপিচুপি গিয়ে শিবাজীর পিছনে বসল।

শিবাজী বলছেন, 'বিজাপুরে খবর পৌঁছতে অন্তত চার পাঁচ দিন লাগবে। একবার খবর পৌঁছলে চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে, তখন সুলতান কী করবেন কিছুই বলা যায় না। তাই খবরটা সুলতানের কাছে পৌঁছনোর আগেই বাবার কাছে পৌঁছনো দরকার। তারপর খবর পেয়ে তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।'

বাজি পসলকর বললেন, 'ঠিক কথা। আগে খবর পেলে শাহজী পুণায় পালিয়ে আসতে পারেন। তখন আর সুলতান তাঁর নাগাল পাবেন না।'

শিবাজী বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু বাবা বিজাপুরে উপস্থিত না থাকতে পারেন, হয়তো সুলতানের হুকুমে তাঁকে অন্য কোথাও যেতে হয়েছে। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর কাছে খবর যাওয়া চাই। এখন কথা হচ্ছে, কে যাবে খবর নিয়ে। শত্রুর রাজধানীতে যাওয়া মানে প্রাণ হাতে করে যাওয়া। ধরা পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। তাই এমন লোককে পাঠাতে হবে যে চতুর এবং সাহসী; যার ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম। কে যাবে?'

বাজি পসলকর বললেন, 'তুমি যাকে হুকুম করবে সেই যাবে।'

তানাজী বললেন, 'শিব্বা আমাকে হুকুম কর, আমি যাব।'

শিবাজী হেসে বললেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি শিবাজীর বন্ধু একথা অনেকেই জানে, তোমার চেহারাটাও এমন যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি গেলে ধরা পড়বার ভয় বড় বেশি।'

'তবে কাকে পাঠাতে চাও?'

শিবাজী হাত বাড়িয়ে সদাশিবকে সামনে টেনে আনলেন। বললেন, 'এই ছেলেটাকে পাঠাতে চাই। ওর যে বুদ্ধি আছে সাহস আছে সে-পরিচয় ও দিয়েছে। উপরন্তু ওকে আমার দলের লোক বলে এখনো কেউ চেনে না। শত্রুপক্ষের যারা ওকে দেখেছিল তারা কেউ বেঁচে নেই। সুতরাং ওকে পাঠানোই সব চেয়ে নিরাপদ।'

সকলে নীরব রইলেন; শিবাজীর দূত-নির্বাচন যে ঠিক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কেবল জিজাবাঈ একটু আপত্তি তুললেন, 'সদাশিব বড্ড ছেলেমানুষ, ও কি পারবে অতদূর যেতে? যদি রাস্তা ভুলে যায়—'

শিবাজী হেসে উঠলেন, 'সদাশিব রাস্তা ভোলবার ছেলে নয়।

কি বলিস সদাশিব?'

সদাশিব লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, রাস্তা ভুলব না। আমি দেখতে ছোট বটে কিন্তু আঠারো বছর বয়স হয়েছে। যেখানে যেতে বলবে আমি যেতে পারব। কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি ঠিক বিজাপুরে গিয়ে পৌঁছুব।'

শিবাজী বললেন, 'রাস্তা তোকে দেখিয়ে দেব। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, যত শীগ্গির পারিস পৌঁছতে হবে।'

সদাশিব বলল, 'আমার ঘোড়া খেয়ে-দেয়ে বেশ মোটা হয়েছে, সে আমাকে যতদূর বলো নিয়ে যেতে পারবে।'

শিবাজী মাথা নেড়ে বললেন, 'তোর ঘোড়া পারবে না। রাস্তায় অনেক নদী পার হতে হবে; তোর ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারবে না, টুপ করে ডুবে যাবে। আমার একটা ঘোড়া আছে, তার নাম সিন্ধু-ঘোটক, সেই ঘোড়ায় চড়ে তুই যাবি। তিন মণ বোঝা ঘাড়ে করে সে কৃষ্ণা-গোদাবরী পার হতে পারে।'

সদাশিব সিন্ধুঘোটককে চিনত। আস্তাবলে শিবাজীর খাস ঘোড়া দশ বারোটা ছিল, তার মধ্যে সিন্ধুঘোটক একটা। গোলগাল নাদা-পেট ঘোড়া, বেশি জোরে দৌড়ুতে পারে না, কিন্তু ভারি মজবুত। সদাশিব উৎসাহিত হয়ে উঠল। শিবাজীর খাস ঘোড়ায় চড়ে সে যাবে, কত বড় সম্মান। সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়ি না কেন?'

শিবাজী আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আজ আর হবে না। কাল ভোরবেলা তুই বেরুবি। তোকে বিজাপুরের রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসব।—কিন্তু একটা কথা। বাবা তোকে চেনেন না, যদি তোর কথায় বিশ্বাস না করেন?'

জিজাবাঈ নিজের হাত থেকে একটি তামার কবচ খুলে নিয়ে সদাশিবের হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, 'এই কবচ তাঁকে দেখাস, তিনি চিনতে পারবেন। তোরও কবচ ধারণ করলে মঙ্গল হবে, ওতে মা ভবানীর ফুল আছে।'

দুই

পরদিন তখনও সূর্য ওঠেনি, সবেমাত্র পূর্বদিক ফরসা হয়েছে, এমন সময় সদাশিব ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বেরুল। সঙ্গে আছেন শিবাজী আর তানাজী।

সদাশিবের গায়ে ফরসা জামা কাপড়, পায়ে জুতো। জিজাবাঈ তার চোখে কাজল পরিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিয়েছেন।

সদাশিবকে আর চেনা যায় না; তিন দিন আগে যে-ছেলেটা ছেঁড়া জামা কাপড় পরে ছাগল চরাতে বেরিয়েছিল, কে বলবে এ সেই ছেলেটা।

শিবাজী আর তানাজী আগে আগে ঘোড়া চালিয়ে চললেন, পিছনে নাদুসনুদুস ঘোড়ার পিঠে সদাশিব। তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ঢাল তলোয়ার কিছু নেই, শুধু আছে কোমরে গোঁজা একটি ছোট ছুরি, আর একটা খাবার ভরা ছালা। তাছাড়া ট্যাঁকে আছে গণ্ডা কয়েক তামার পয়সা। তখনকার দিনে একলা মানুষের বেশি টাকা-কড়ি নিয়ে রাস্তা চলা নিরাপদ ছিল না; সবাই চোর, সবাই ডাকাত। শিবাজী তাই সদাশিবকে এমনভাবে পাঠাচ্ছেন যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

তিন দিন আগে তোর্ণা দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের যে গিরি-সংকট দিয়ে বিজাপুরী ফৌজ এসেছিল সেই গিরিপথ দিয়ে শিবাজী আর তানাজী সদাশিবকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চললেন। ক্রমে সকাল হল, চারিদিক শিশির-ভেজা আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। সদাশিব দেখল, পাথর ছড়ানো রাস্তার ওপর তখনো কামান-বোঝাই গরুর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। মানুষগুলো নেই, কিন্তু চাকার দাগ রয়েছে। সাত হাজার মানুষের মধ্যে একটাও কি বেঁচে নেই? হয়তো দু'চার জন আছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে কে জানে।

পাহাড়ের এলাকা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় পৌঁছতে বেলা প্রায় দুপুর হল। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে সড়ক গিয়েছে; খুব ভাল রাস্তা নয়, তবু রাস্তা; ঘোড়ার পিঠে যাওয়ার অসুবিধা নেই।

শিবাজী সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই রাস্তা বিজাপুরে গিয়েছে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম আছে। রাত্তিরে গ্রামে থাকবি, কিন্তু যেখানে বেশি মানুষের ভিড় সেখানে যাবি না। বিজাপুর শহরে পৌঁছতে পাঁচ-ছয় দিন লাগবে। সেখানে কাজ সেরেই ফিরে আসবি। রাস্তা চিনে ফিরে আসতে পারবি তো?'

সদাশিব বলল, 'পারব।'

'যা যা বলে দিয়েছি মনে আছে?'

'আছে।'

'আচ্ছা, তাহলে এবার বেরিয়ে পড়। জয় ভবানী।'

'জয় ভবানী' বলে সদাশিব ঘোড়া চালাল। শিবাজী আর তানাজী ঘোড়ার পিঠে বসে চেয়ে রইলেন। সদাশিবের ঘোড়া যখন অনেক দূরে চলে গেল তখন তাঁরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আবার তোর্ণা দুর্গে

ফিরে চললেন।

সদাশিব চলেছে। এখন সে একলা, গুরুতর কাজের ভার তার মাথায়। কিন্তু তার মনে ভয় হল না। বরং সে এই ভেবে উদ্দীপনা অনুভব করতে লাগল যে এখন থেকে যা কিছু করবার সে নিজের বুদ্ধিতে করবে।

ঘোড়াটা দুল্‌কি চালে চলেছে; খুব জোরেও নয়, খুব আস্তেও নয়। এই চালে চললে দিনে অন্তত পনরো-ষোল ক্রোশ যাওয়া চলবে। সিন্ধুঘোটকের পিঠটি বেশ চৌরস, মনে হয় যেন সিংহাসনে বসে আছি। তার মেজাজও বেশ ঠাণ্ডা। সদাশিব মনের আনন্দে চলল।

সূর্য মাথার ওপর উঠে পশ্চিমে হেলে পড়ল। সদাশিব মনের আনন্দে ক্ষিদে তেষ্টার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সিন্ধুঘোটক ভোলেনি। প্রায় দু'ঘড়ি চলবার পর এক জায়গায় এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার ডান দিক থেকে ঝরণার জল এসে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে; কাকচক্ষু জল, জলের তলায় বালি তক্‌তক্‌ করছে। সিন্ধুঘোটক জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘাড় নীচু করে চোঁ চোঁ শব্দে জল খেতে লাগল।

সদাশিবের মনে পড়ল এখনও খাওয়া হয়নি। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে খাবারের থলিটি নিয়ে রাস্তার ধারে একটি পাথরের ওপর গিয়ে বসল।

জিজাবাঈ অনেক খাবার দিয়েছেন। ঘিয়ে ভাজা জোয়ারির রুটি, ছোলার ডালের ঝাল চক্‌রি, মোতিচুরের লাড্ডু, আরও কত কি। এমন সব জিনিস দিয়েছেন যা দু'এক দিনে নষ্ট হয়ে যাবে না। খাওয়া শেষ করে সদাশিব দেখল থলির একটা কোণও খালি হয়নি। সে উঠে পড়ল, আঁজ্‌লা ভরে ঝরণার জল খেয়ে সিন্ধুঘোটককে ডাকল।

সিন্ধুঘোটক ইতিমধ্যে রাস্তার ধার থেকে বেশ খানিকটা ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে নিয়েছে। সদাশিব তার পিঠে উঠে বসল; দু'জনে ঝরণার আধ হাঁটু জল পার হয়ে দুল্‌কি চালে চলল।

রাস্তায় লোক চলাচল নেই। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে লোকালয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়, দু'চারটে মাটির ঘর যেন ভয় পেয়ে একত্র জড়ো হয়েছে। কিন্তু ঘরগুলি শূন্য, একটিতেও মানুষ নেই। কয়েকদিন আগে বিজাপুরী ফৌজ এই দিক দিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই ভয়ে মানুষগুলো পালিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।

সদাশিব চলেছে। ক্রমে সূর্য যখন পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়েছে তখন সে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছল। বেশ বড় নদী, এপার ওপার প্রায় দু'শো গজ। সদাশিব আন্দাজ করল, এই নীরা

নদী। নীরা নদী সহ্যাদ্রি থেকে বেরিয়ে আরও পূব দিকে গিয়ে ভীমা নদীর সঙ্গে মিলেছে।

নদীর কিনারে রাস্তার ধারে গ্রাম রয়েছে, কিন্তু গ্রামে মানুষ নেই। ঘাটের কাছে একটা নৌকা আধ ডুবন্ত অবস্থায় কানা জাগিয়ে আছে। বোধহয় খেয়ার নৌকা।

এইখানে নদী পার হতে হবে। কারণ রাস্তাটা এইখানে নদীতে ডুব দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে। সদাশিব ঠিক করল আজ রাত্রিটা এইখানেই কাটাবে। অনেক শূন্য ঘর পড়ে রয়েছে, একটা ঘরে রাত কাটিয়ে ভোর হতে না হতে আবার যাত্রা শুরু করবে।

এই সময় সিন্ধুঘোটক ঘাড় উঁচু করে একবার চিঁহি শব্দ করল; একটা ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার গন্ধ পেলে যেরকম শব্দ করে সেই রকম। সদাশিব চারিদিকে তাকাল কিন্তু ঘোড়া বা মানুষ কাউকে দেখতে পেল না। সে তখন ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে গ্রামের মধ্যে ঢুকল।

সবসুদ্ধ কুড়ি পঁচিশটা মেটে ঘর, একটা গরু-বাছুরের গোয়াল, আর কিছু নেই। সব ঘরের দরজা খোলা। সদাশিব কয়েকটা ঘরে উঁকি মেরে দেখল ভিতরে কিচ্ছু নেই। গ্রামবাসীরা সব কিছু নিয়ে পালিয়েছে।

গোয়ালে উঁকি মেরে সদাশিব আশ্চর্য হয়ে গেল--একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। মেহ্দি রঙের বড় ঘোড়া, পাহাড়ী ঘোড়া নয়। এ ঘোড়া এখানে কোথা থেকে এল!

ঘোড়াটা সদাশিবকে দেখে কান খাড়া করে নাকের মধ্যে শব্দ করল, সিন্ধুঘোটক তার উত্তর দিল। সদাশিব দেখল ঘোড়াটার সামনের ডান পায়ের হাঁটুতে ন্যাকড়ার ফেট্টা বাঁধা রয়েছে, সে নড়তে চড়তে খোঁড়াচ্ছে।

সদাশিব আস্তে আস্তে গোয়াল ঘরের সামনে থেকে সরে এল। ঘোড়ার মালিক নিশ্চয়ই এই গ্রামের মধ্যে আছে, কিন্তু বেশিদিন নয়, আজই এখানে এসেছে। কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাচ্ছে? সামনে আসছে না কেন? তবে কি চোর ডাকাত?

সূর্য অস্ত গিয়েছে, আকাশের মাঝখানে আধখানা চাঁদ নিজেকে স্পষ্ট করে তুলছে। সদাশিব গ্রামের সামনের দিকে ফিরে এল। একটা বড় কুঁড়েঘর, বোধহয় গাঁয়ের পাটিলের ঘর; তার দরজায় হুড়কো আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। সদাশিব ঠিক করল এই ঘরেই রাত কাটাবে। ঘরের সামনে খানিকটা খোলা মাঠ, তাতে বেশ বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। সিন্ধুঘোটক এই মাঠে চরবে।

সদাশিব সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে লাগাম খুলে নিল, পিঠ থেকে

কম্বল খুলে ঘরের মধ্যে রাখল। এই কম্বলটা হবে তার বিছানা। তারপর সে ঘরের দোরে বসে থলি নিয়ে রাত্রির খাওয়া খেতে বসল।

কিন্তু তার মনে অস্বস্তি লেগে আছে। গোয়ালে বাঁধা খোঁড়া ঘোড়ার মালিক কে? এখানে লুকিয়ে আছে কেন? ঘোড়া বেঁধে রেখে যদি চলে গিয়ে থাকে? না, তা সম্ভব নয়; এই কুঁড়েঘরগুলোর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ঘোড়া ফেলে কেউ চলে যায় না। একটা ঘোড়া যখন, মানুষও নিশ্চয় একটা। কিন্তু লুকিয়ে আছে কেন? সদাশিবকে দেখে ভয় পেয়েছে, তাই লুকিয়ে আছে?

ইতিমধ্যে জ্যোৎস্না ফুটেছে; নীলাভ কুয়াশার মত ঝাপসা আলোয় চারিদিক আচ্ছন্ন। সদাশিব খাওয়া সেরে নদীর ধারে গিয়ে জল খেয়ে এল।

কোথাও জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই। সিন্ধুঘোটক নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। সদাশিব দোরের হুড়কো লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা মানুষ যদি থাকেই তাতে ভয় কি? সদাশিবের কাছে ছুরি আছে। সে ছুরিটি কোমর থেকে বার করে মাথার পাশে নিয়ে শুলো। কাল ভোরেই উঠে নদী পার হতে হবে। ..

অনেক রাতে সিন্ধুঘোটকের নাক ঝাড়ার শব্দে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল। দরজার পাশে ছোট্ট ঘুলঘুলি, তাই দিয়ে সে বাইরে উঁকি মারল।

তখনও চাঁদ অস্ত যায়নি, কিন্তু অস্ত যেতে বেশি দেরিও নেই। সিন্ধুঘোটক ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে মাঠের মাঝখানে বসে আছে। একটা লোক খোঁড়া ঘোড়াটার লাগাম ধরে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় সদাশিব লোকটার মুখ দেখতে পেল। মুখে দাড়ি—

লোকটা আঙুলে তুড়ি দিয়ে মুখে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করল, কিন্তু সিন্ধুঘোটক উঠল না, আবার নাক ঝাড়া দিল। লোকটা সন্তর্পণে চারিদিকে তাকিয়ে সিন্ধুঘোটকের কোমরে আস্তে একটা লাথি মারল, যাতে সে উঠে দাঁড়ায়। সিন্ধুঘোটক কিন্তু উঠল না।

মুহূর্তমধ্যে সদাশিব সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারল। লোকটা কে, কেন এখানে লুকিয়ে আছে, তার ঘোড়া কেন খোঁড়া, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। সে ঘুলঘুলি দিয়ে গলা বাড়িয়ে মুখে বিকট শব্দ করল,—'হর্‌র্‌র্‌—হুং কটকট—হুক্ক হুক্ক—!'

লোকটা চমকে উঠে এক লাফে নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, তারপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে পালাল। সদাশিব তখন হুড়কো খুলে বাইরে এল। দেখল, ঘোড়সওয়ার নদীর দিকে যাচ্ছে। তারপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হল। ঘোড়া নদী পার হচ্ছে।

সদাশিব ঘরে ফিরে এসে আবার দরজায় হুড়কো লাগাল। লোকটা

মুসলমান। বিজাপুরের যে ফৌজ তোর্ণা আক্রমণ করতে এসেছিল, লোকটা সেই দলে ছিল; ঘোড়াটাও ছিল। কোনও রকমে ওদের দু'জনেরই প্রাণ বেঁচে যায়। কেবল ঘোড়াটার হাঁটু জখম হয়। তখন খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে লোকটা বিজাপুরে খবর দিতে যাচ্ছে। পাছে শিবাজীর এলাকায় ধরা পড়ে তাই লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে।

সদাশিব ঠিক করল, যেমন করে হোক ওই লোকটার আগে তাকে বিজাপুরে পৌঁছতে হবে। কিন্তু আজ রাত্রেই তাকে তাড়া করবার দরকার নেই। খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে সে কতদূর যাবে?

সদাশিব আবার কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—লোকটা বোধহয় সিন্ধুঘোটককে চুরি করবার মতলবে ছিল! ভাগ্যিস ঠিক সময়ে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল! নইলে সকাল-বেলা উঠে দেখত সিন্ধুঘোটক অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে খোঁড়া ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে।

তিন

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সদাশিব বেরিয়ে পড়ল। নদীর জল সূর্যোদয়েব আগে বেশি ঠাণ্ডা মনে হয় না, তাই নদী পার হতে তার বেশি কষ্ট হল না। নীরা নদী এখানে প্রায় দু'শো গজ চওড়া হলেও কিনারার জল গভীর নয়, মাঝখানে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ অথৈ জল। সিন্ধুঘোটক সদাশিবকে পিঠে নিয়ে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে গেল, সদাশিব কেবল পা দুটো তুলে তার পিঠের ওপর বসে রইল।

নদী থেকে উঠে সিন্ধুঘোটক একবার গা-ঝাড়া দিল। সদাশিব আর একটু হলেই তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে নিল। তারপর সিন্ধুঘোটক আবার দুল্‌কি চালে চলতে আরম্ভ করল।

রাস্তায় রাহী নেই। রাস্তার ধারে একটা ছোট গ্রাম পড়ল, কিন্তু গ্রামে জনমানব নেই। শূন্য চারিদিক, তার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা উঠছে নামছে, কখনও গিরিস্কন্ধের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ারকে কিন্তু দেখা গেল না। সে বোধ হয় সারারাত ঘোড়া চালিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বেলা বাড়তে লাগল। ক্রমে দুপুর হল।

একটি গ্রাম। সদাশিব দূর থেকে দেখল এখানে দু'চারজন লোক ফিরে এসেছে। গ্রামের সামনে দিয়ে যাবার সময় সদাশিব ঘোড়া দাঁড়

করালো, হাত তুলে হাঁক দিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা কেউ কাছে এল না, লাঠি হাতে সন্দিগ্ধভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সদাশিব আবার হাঁক দিল। তখন একজন বুড়ো লোক এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি কে? কি চাও?'

সদাশিব বলল, 'আমি রাহী। জরুরী কাজে বিজাপুরে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন?'

বুড়ো বলল, 'বিজাপুরের সিপাহীরা আমাদের গ্রাম লুটে নিয়েছে। তুমি কি বিজাপুর দলের লোক?'

সদাশিব বলল, 'না, না, আমি পুণার লোক। দেখছ না আমি মারাঠী।'

বুড়ো বলল, 'তবে বিজাপুরে যাচ্ছ কেন?'

এ প্রশ্নের জবাব সদাশিবের তৈরি ছিল, সে বলল, 'আমার মামাকে খুঁজতে যাচ্ছি।—বলতে পারো, এ রাস্তা দিয়ে খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে কেউ গিয়েছে?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভোরবেলা গিয়েছে, তখনও সূর্য ওঠেনি। সেই বুঝি তোমার মামা?'

মামাই বটে! একেবারে সাক্ষাৎ কংস মামা। সদাশিব আর দাঁড়াল না, ঘোড়া চালিয়ে দিল।

খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার রাতারাতি অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। যাহোক, সন্ধ্যার আগেই সদাশিব তাকে ধরে ফেলবে।

রাস্তায় আর বড় নদী নেই; তবে ছোটখাটো ঝরণা অনেক আছে। সদাশিব ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই দুপুরের খাওয়া শেষ করল; ঘোড়াটাকে ঘাস খাবার জন্যে কিছুক্ষণ ছেড়ে দিল। তারপর আবার চলল।

কিন্তু খোঁড়া ঘোড়ার দেখা নেই। সন্ধ্যে হয় হয়, সূর্য ডুবুডুবু। কোথায় গেল ঘোড়াটা? তবে কি রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথ ধরেছে? উঁহু, পাহাড়ের পথে যাওয়া খোঁড়া ঘোড়ার কর্ম নয়; নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গেল কোথায়?

সন্ধ্যা হল, চাঁদের আলো ফুটল। সেই কালকের চাঁদ, আজ একটু বড় হয়েছে। সদাশিব থামল না, চলতেই লাগল। যদি একটা শূন্য গ্রাম পায় তার শূন্য ঘরে রাত কাটাবে। নইলে গাছের ডালে রাত কাটাতে হবে। তাছাড়া খাবারও ফুরিয়ে এসেছে, বড় জোর কাল সকাল পর্যন্ত চলবে। খাবার যোগাড় করতে হবে। ঘোড়াটাও ক্লান্ত, চলতে চলতে থেমে যাচ্ছে। আবার তার পেটে গোড়ালির গুঁতো মেরে চালাতে হচ্ছে।

এই রকম এক জায়গায় সিন্ধুঘোটক থেমেছে, হঠাৎ সদাশিবের

কানে এল ঠুং ঠুং ঘণ্টির আওয়াজ। এ আওয়াজ সদাশিবের চেনা; গাঁয়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টি বাজছে।

সদাশিব পাশের দিকে তাকালো কিন্তু গ্রাম দেখতে পেল না। খানিকটা চড়াই উঠেছে, তার গায়ে মানুষের পায়ে হাঁটা পথের মত অস্পষ্ট চিহ্ন। হয়তো চড়াইয়ের ওপারে গ্রাম আছে, রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে না। সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে তার রাশ ধরে সেইদিক পানে চলল।

এবড়ো-খেবড়ো চড়াই। পঞ্চাশ-ষাট গজ গিয়ে সদাশিব তার মাথায় উঠল। হ্যাঁ, সামনেই চড়াইয়ের কোলে একটি ছোট গ্রাম। ত্রিশ চল্লিশটি খড়-ছাওয়া কুটির, কিন্তু একটি কুটিরেও বাতি জ্বলছে না। চাঁদের আলোয় শূন্য গ্রামটি নিঝুম হয়ে আছে।

সদাশিব অবাক হল। গ্রামে কেউ নেই, তবে ঘণ্টি বাজাচ্ছিল কে? ঠিক এই সময় সদাশিব আবার শুনতে পেল ঘণ্টির শব্দ—ঠুং ঠুং ঠুং। গ্রামের ভিতর থেকেই শব্দ আসছে।

সিন্ধুঘোটককে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে সদাশিব নেমে গেল। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলি অবিন্যস্তভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে যাতায়াতের পথ। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ দেখতে পেল একটি ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। পাথরের মন্দির; বোধহয় গ্রামের মধ্যে এই একটিমাত্র পাকা বাড়ি। কিন্তু লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সদাশিব পা টিপে টিপে সেইদিকে চলল। মন্দিরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দেখল, ভিতরে বিঠোবার মূর্তি রয়েছে; আর, একটি মেয়ে মন্দিরের মধ্যে বসে পূজা করছে।

মেয়েটি দরজার দিকে পিছন ফিরে পূজা করছিল, তাই সদাশিবকে দেখতে পেল না। সদাশিব দেখল, মেয়েটি একলা, তার সঙ্গে অন্য কেউ নেই।

সদাশিব সন্তর্পণে যেই আর এক-পা বাড়িয়েছে অমনি পায়ের তলায় পাথরকুচি পড়ে একটু শব্দ হল। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তারপর অস্ফুট চিৎকার করে ধড়মড়িয়ে উঠে মন্দিরের দোর ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ দু'পক্ষই চুপচাপ। তারপর সদাশিব গলা ঝাড়া দিয়ে বলল, 'ভয় পেও না, আমি তোমার অনিষ্ট করব না।'

মন্দিরের ভিতর থেকে সাড়াশব্দ এল না। তখন সদাশিব আবার বলল, 'আমার কোনো বদ মতলব নেই। তুমি যদি ভয় পাও আমি চলে যাচ্ছি।'

সে কিন্তু চলে গেল না, অপেক্ষা করে রইল। খানিক পরে মন্দির

থেকে মেয়েলী মিহি গলায় আওয়াজ এল, 'তুমি কে? কি চাও?'

সদাশিব বলল, 'কিছু চাই না। আমি মারাঠী, হিন্দু। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঘণ্টির শব্দ শুনে এসেছি। এটা কি বিঠ্ঠলের মন্দির?'

ভিতর থেকে মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ। তুমি বিজাপুরের সিপাহী নও?'

সদাশিব বলল, 'না, আমি পুণা থেকে আসছি।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর খুট করে শব্দ হল, দরজা একটু ফাঁক করে মেয়েটি উঁকি মারল। সে দেখল আগন্তুক ছেলেমানুষ, তার হাতে অস্ত্রশস্ত্রও নেই, শুধু একটা ঝুলি। দরজা আর একটু ফাঁক করে সে বলল, 'তোমার নাম কি?'

'সদাশিব।'

'এখানে কি চাও?'

'বলেছি তো কিছু চাই না। মন্দিরের ঘণ্টি শুনতে পেয়ে এসেছি। তুমি বিঠ্ঠলের পুজো করছিলে?'

'হ্যাঁ।'

সদাশিব মন্দিরের পৈঁঠায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, তারপর বলল, 'গাঁয়ে লোকজন কেউ নেই কেন?'

মেয়েটি এবার বেরিয়ে এল, বলল, 'বিজাপুরী সিপাহীরা এসেছিল, তাই গাঁয়ের লোক সব পালিয়েছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

সদাশিব এবার মেয়েটিকে ভাল করে দেখল। সামনে থেকে চাঁদের আলো আর পিছন থকে প্রদীপের আলো তার গায়ে পড়েছে। কালোকোলো মেয়েটি, ছোটখাটো গড়ন; বেশ শ্রী আছে। বয়স এগারো-বারো বছরের বেশি নয়। সে এই নির্জন গ্রামে একলা কী করছে!

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে একলা আছ?'

মেয়েটি একটু হাসল, বলল, 'না, আমিও পালিয়েছি। আমার বাবা বিঠ্ঠলের পুজারী; তিনি বুড়ো মানুষ, তার ওপর বিজাপুরী-দের হাতে জখম হয়েছেন। তিনি আসতে পারেন না, তাই আমি বিঠ্ঠলের পুজো দিতে আসি।'

সদাশিব একটা নিশ্বাস ফেলে পৈঁঠার ওপর বসল, বলল, 'বিজাপুরী সিপাহীরা বড় অত্যাচার করে—না? শিবাজীর সৈন্য কিন্তু গ্রামের লোকের ওপর অত্যাচার করে না।'

মেয়েটির এতক্ষণে ভয় কেটেছে, কৌতূহল দেখা দিয়েছে। সেও চাতালের ওপর বসল। বলল, 'শিবাজীর নাম শুনেছি। তুমি বুঝি শিবাজীর দলের লোক?'

সদাশিব একটু ঘাড় নাড়ল। এই মেয়েটিকে দেখে, ওর কথা শুনে কুঙ্কুর কথা মনে পড়ে যায়। সে বলল, 'আমার গাঁয়ে তোমার মত একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুঙ্কু। তোমার নাম কি?'

মেয়েটি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'সেবন্তী।'

তারপর দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। সেবন্তীর মনে ভারি কৌতূহল, সে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সদাশিব এক সময় বলল, 'সেবন্তি বহিন, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিতে পার?'

'দিচ্ছি' বলে সেবন্তী মন্দির থেকে জল এনে দিল, সদাশিব ঢক্‌ঢক্ করে এক ঘটি জল খেয়ে ফেলল।

ঘটি রেখে এসে সেবন্তী আবার বসল। বলল, 'সদাশিব ভাই, তোমার থলিতে কী আছে?'

সদাশিব বলল, 'খাবার। কিন্তু বেশি নেই, সব ফুরিয়ে এসেছে। কাল কি খাব তাই ভাবছি।'

সেবন্তী প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন কি করবে? রাত্তিরে কি এখানেই থাকবে?'

সদাশিব বলল, 'তাই ইচ্ছে। যদি তোমার অমত না থাকে। কোনও একট ঘরে শুয়ে থাকব, সকাল হলেই চলে যাব।—সেবন্তি বহিন, তুমি আমাকে কিছু খাবার দিতে পার? আমি এমনি চাই না, আমার কাছে পয়সা আছে।'

সেবন্তী গালে হাত দিয়ে খানিক ভাবল, তারপর বলল, 'গ্রামে তো খাবার জিনিস কিছু নেই। যা ছিল তার বেশির ভাগ বিজাপুরী সিপাহীরা লুটে নিয়ে গেছে। বাকি গ্রামের লোকেরা গুহায় নিয়ে গেছে।'

সদাশিব বলল, 'তবে থাক, আমি চালিয়ে নেব। তুমি এবার ফিরে যাও, দেরি হলে তোমার বাবা ভাববেন।'

সেবন্তী বলল, 'তুমি তাহলে রাত্তিরে এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

সেবন্তী মন্দিরের সামনে একটা কুঁড়েঘর দেখিয়ে বলল, 'তুমি ওই ঘরে শুয়ো। ওটা আমাদের ঘর।'

'আচ্ছা।'

সেবন্তী উঠল। মন্দিরের দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'আমি তবে যাই?'

'এস বহিন।'

সেবন্তী চলে গেল, চাঁদের আলোয় যেন মিলিয়ে গেল। সদাশিব আরও কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি খাওয়া

দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া দরকার। ভোরেই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। এখনও দু'দিনের রাস্তা বাকি।

সেবন্তীর ঘরে দোর বন্ধ করে সদাশিব ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখনও চাঁদ অস্ত যায়নি, দরজায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনে সে জেগে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে শোনবার পর সে সতর্কভাবে বলল, 'কে?'

বাইরে থেকে মিহি গলায় উত্তর এল, 'আমি সেবন্তী। দোর খোলো।'

সদাশিব দোর খুলে দেখল সেবন্তী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটি পুঁটুলি। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি আবার এলে যে?'

সেবন্তী পুঁটুলি দেখিয়ে বলল, 'তোমার জন্য খাবার এনেছি। কৈ, তোমার থলি বার কর।'

সদাশিব আরও আশ্চর্য হয়ে থলি বার করে দিল, বলল, 'খাবার কোথায় পেলে?'

সেবন্তী পুঁটুলি থেকে খাবার সদাশিবের থলিতে ভরে দিতে দিতে বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কি? এতে তোমার দু'দিন চলে যাবে।'

সদাশিব গাঢ়স্বরে বলল, 'তোমাকে যতই দেখছি কুঙ্কুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কত পয়সা দেব, সেবন্তি বহিন?'

সেবন্তী বলল, 'পয়সা চাই না। তুমি আবার এই রাস্তা দিয়ে ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে নগর থেকে কিছু-মিছু কিনে এনো। আমি রোজ সকাল সন্ধ্যে এইখানে বসে তোমার পথ চেয়ে থাকব।'

'আচ্ছা। যদি ফিরি নিশ্চয়ই আনব।'

'তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। সকাল হতে এখনো অনেক দেরি। আচ্ছা।'

'আচ্ছা।'

সেবন্তী কিছুদূর চলে যাবার পর সদাশিব ডাকল, 'সেবন্তি বহিন।'

সেবন্তী ফিরে এসে কাছে দাঁড়াল—'কী?'

সদাশিব বলল, 'গ্রামবাসীদের বলো তারা এখন গ্রামে ফিরে আসতে পারে। আর কোনও ভয় নেই।'

সেবন্তী বলল, 'কিন্তু—বিজাপুরী সিপাহীর দল যে এই পথ

দিয়ে ফিরে আসবে।'

সদাশিব বলল, 'না, তারা আর ফিরে আসবে না

চার

পরদিন কাক কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিব যাত্রা শুরু করল। সারাদিন পথ চলল। দুপুরবেলা সেবন্তীর দেওয়া খাবার খেল। কয়েক মুঠি শুকনো ছোলা, কয়েকটা জনারের রুটি আর এক ডেলা আকের গুড়। যাদের সর্বস্ব সিপাহীরা লুটে নিয়ে গেছে তারা এর বেশি আর কী দিতে পারে? সেবন্তী বহিন যেন কুঙ্কুর যমজ বোন, নিশ্চয় নিজের খাবার তাকে দিয়েছে। সব মেয়েই কি এক রকম হয়?

সারাদিন চলেও সে খোঁড়া ঘোড়ার দেখা পেল না। কোথায় গেল ঘোড়া আর তার সওয়ার? তবে কি তারা পিছিয়ে গেছে? হয়তো খোঁড়া ঘোড়া আর চলতে পারেনি, তাই সওয়ার পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে এগিয়ে গিয়ে থাকে! সদাশিব শাহজীকে খবর দেবার আগেই যদি বিজাপুর দরবারে খবব পেঁছে যায় তাহলেই সর্বনাশ! সদাশিবের এতদূর আসাই মিথ্যে হয়ে যাবে। শাহজীকে সুলতান হয়তো কোতল করবে।

সদাশিব যথাসাধ্য জোরে ঘোড়া চালাল কিন্তু খোঁড়া ঘোড়ার নাগাল পেল না। সন্ধ্যাবেলায় সে এমন এক জায়গায় এসে পৌছল যেখানে কোনো লোকালয় নেই। কি করা যায়? সে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে সিন্ধুঘোটককে একটা গাছের তলায় ছেড়ে দিল, আর নিজে গাছে উঠে বসল। গাছটি বেশ বড় আর ঝাঁকড়া। সদাশিরেব গাছে ঘুমানো অভ্যেস আছে; সে একটা মোটা ডালের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসল, গুঁড়িটি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে তার গায়ে গাল রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাছের নীচে আশেপাশে ঘাস গজিয়েছে, সিন্ধুঘোটক চাঁদের আলোয় তাই খেতে লাগল। তারপর পেট ভরলে গাছের তলায় বসে সেও ঘুমোতে লাগল।

পরদিন সদাশিব আবার চলল। আজ কিন্তু রাস্তার চেহারা অন্য রকম। মাঝে মাঝে রাস্তায় দু'চারটে লোক দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে গ্রামের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রামেই মুসলমানের বাস। সদাশিব বুঝল বিজাপুর নগর আর বেশি দূর নয়।

দুপুরবেলা সদাশিব সিন্ধুঘোটককে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর

ছেড়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসল। বসে বসে খাচ্ছে আর ভাবছে, এমন সময় দেখল পিছন দিক থেকে এক পাল ভেড়া নিয়ে একটা লোক আসছে। বোধহয় কাছের কোনো গ্রাম থেকে আসছে, কারণ সদাশিব আগে তাদের রাস্তায় দেখতে পায়নি। লোকটা ভারি জোয়ান একজন মুসলমান, এড়ো বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে। ভেড়াগুলো তার আগে আগে যাচ্ছে।

সদাশিবের সামনা-সামনি এসে লোকটা বাঁশী থামাল, এক-গাল হেসে বলল, 'কি স্যাঙাৎ, এখানে বসে কি হচ্ছে?'

সদাশিব দেখল লোকটা বেশ ফুর্তিবাজ। সেও হেসে বলল, 'খাচ্ছি। খেয়েই আবার রওনা দিতে হবে। বিজাপুর আর কতদূর বলতে পার?'

লোকটা বলল, 'তুমি বিজাপুর যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা সিন্ধুঘোটকের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'তোমার ঘোড়া আছে দেখছি। তবু আজ বিজাপুরে পৌঁছতে পারবে না, আজ রাত্তিরটা পথেই কাটাতে হবে। কাল বেলা দু'ঘড়ি আন্দাজ শহরে পৌঁছবে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

লোকটা হো হো করে হেসে বলল, 'আমিও বিজাপুর যাচ্ছি। আমি পৌঁছব পরশু।'

'এত ভেড়া নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ভেড়া কাটব, বিক্রি করব। আমি কশাই।' লোকটা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে সদাশিব সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে রওনা হল। কিছুদূর এগিয়ে ভেড়ার পাল আর কশাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা। কশাই বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে, হেসে বলল, 'বিজাপুরে আবার দেখা হবে। ভাল মাংস চাও তো আমার দোকানে এস। পীরবক্স কশাইয়ের নাম সবাই জানে। এমন মাংস আর কোথাও পাবে না।' হো হো করে হেসে সে আবার বাঁশী বাজাতে লাগল।

সদাশিব এগিয়ে চলল। ভাবল, ভারি মজাদার কশাই তো! অবশ্য পীরবক্স কশাইয়ের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সদাশিব এক নদীর ধারে পৌঁছল। নদী খুব চওড়া নয়, গভীরও নয়, তবে নৌকা চলে। ওপারে একটা খড়-বোঝাই নৌকা বাঁধা রয়েছে। নদীর ধারে এক গাদা খড় ডাঁই করা রয়েছে।

সদাশিব নদী পার হল। নদীর জল সিন্ধুঘোটকের পেট পর্যন্ত পৌঁছল। ওপারে গিয়ে সদাশিব দেখল নৌকায় মাঝিমাল্লা কেউ নেই।

হয়তো কাছেই গ্রাম আছে।

সদাশিব একটু ভাবল। গ্রাম কোথায় খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না, তার চেয়ে নদীর ধারে এই খড়ের গাদার মধ্যে রাত কাটালে মন্দ হয় না। সকাল না হলে মাঝিমাল্লা আসবে না, তার আগেই সে বেরিয়ে পড়বে।

সিন্ধুঘোটককে নদীর ধারে ছেড়ে দিয়ে সদাশিব রাত্রির খাবার খেয়ে নিল, তারপর খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে শুয়ে রইল। খড়ের মধ্যে বেশ গরম, সদাশিবের শরীরও ক'দিন অনবরত ঘোড়া চালিয়ে ক্লান্ত হয়েছিল, সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

একেবারে ঘুম ভাঙল যখন পূবের আকাশে ঊষার আলো ঝিলমিল করছে। সদাশিব খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, নদীর জলের ওপর সাদা মল্‌মলের মত কুয়াশা জমেছে। ঘোড়াটা খানিক দূরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব তাড়াতাড়ি সেইদিকে চলল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে! কিন্তু ঘোড়ার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! এ কি! এ তো সিন্ধুঘোটক নয়! এ যে—এ যে সেই খোঁড়া ঘোড়াটা! ঐ যে হাঁটুতে ফেট্টা বাঁধা রয়েছে।

সদাশিব মাথায় হাত দিয়ে বসল। ব্যাপার বুঝতে তার দেরি হল না। খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার কখন এক সময় পৌঁছিয়ে গিয়েছিল, তারপর সারা রাস্তা তার পিছন পিছন আসছিল। আজ রাত্তিরে কোনও সময় সে নদী পার হয়ে সিন্ধুঘোটককে চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছে, তারপর নিজের খোঁড়া ঘোড়াটা এখানে রেখে সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়! সদাশিবের কান্না এল। এই খোঁড়া ঘোড়াটার পিঠে চড়েই বিজাপুর যেতে হবে। হয়তো পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সুলতানের কানে খবর উঠবে—

কিন্তু উপায় কি? সদাশিব খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে কম্বল বাঁধল, মুখে লাগাম লাগালো, তারপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বিজাপুরের দিকে চলল।

পাঁচ

ঢেউ খেলানো রাস্তা।

বেলা দু'ঘড়ির সময় একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে সদাশিব দেখল, দূরে আকাশের গায়ে বিজাপুর শহরের দুর্গপ্রাকার যেন আঁকা রয়েছে।

সেখানে পৌঁছতে কিন্তু দুপুর পার হয়ে গেল।

বিজাপুর নগরের দুর্গপ্রাকারের নীচে দাঁড়িয়ে তার মাথার দিকে তাকালে ঘাড় খচে যায়, এত উঁচু। তোরণের প্রবেশপথও উঁচু, কিন্তু বেশি চওড়া নয়। সদাশিব যখন পৌঁছল দুর্গদ্বারে বেশি ভিড় নেই। প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, দু'চারজন মুসাফির শহরে ঢুকছে, দু'চারজন বেরুচ্ছে। বাইরে উটের দল বসে আছে, একপাল গাধা পিঠে মালের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে প্রাকারের গায়ে বড় বড় লোহার আংটা ঝুলছে, তাতে পাশাপাশি কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

সদাশিব কোনও দিকে না তাকিয়ে একেবারে ঘোড়াসুদ্ধ তোরণ-দ্বারের সামনে হাজির হল। অমনি দু'জন প্রহরী বল্লম নিয়ে তার পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। একজন বলল, 'ঘোড়া নিয়ে এ ফটক দিয়ে ঢোকবার হুকুম নেই। কে তুমি?'

সদাশিব বলল, 'আমি পুণা থেকে জরুরী কাজে এসেছি।'

প্রহরী বলল, 'আগে ঘোড়া বেঁধে রেখে এস, তারপর তোমার কথা শুনব।'

সদাশিব ঘোড়া বাঁধার জায়গায় গেল। সেখানে ছ'সাতটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে অন্য ঘোড়াদের পাশে নিজের ঘোড়া বাঁধতে যাবে, একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দে চমকে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখল—আবে এ কি! সিন্ধুঘোটক। যে লোকটা সিন্ধু-ঘোটককে চুরি করেছিল সে এইখানে তাকে বেঁধে রেখে নগরে প্রবেশ করেছে।

সদাশিবের বুক নেচে উঠল। কিন্তু এখন সময় নেই। সে সিন্ধু-ঘোটকের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে ফটকের কাছে ফিরে গেল।

প্রধান প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, 'নগরে কার সঙ্গে তোমার জরুরী কাজ?'

সদাশিব বলল, 'আমার মামা বলবন্ত রাও মনসবদার শাহজী ভোঁস্‌লের অধীনে কাজ করে। আমি মামাকে জরুরী খবর দিতে এসেছি।'

প্রহরী বলল, 'কিন্তু মনসবদার শাহজী ভোঁস্‌লে তো এখানে নেই। তিনি নিজের দলবল নিয়ে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ'র সঙ্গে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে গিয়েছেন।'

'অ্যাঁ! এখানে নেই?'

'না।'

'জিঞ্জি দুর্গ কোথায়? কতদূর?'

প্রহরী ডান দিকের রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'জিঞ্জি দুর্গ এইদিকে। চার-পাঁচ দিনের পথ।'

সদাশিব একটু ভাবল। এ মন্দ হল না। সুলতান খবর পেলেও শাহজী তাঁর নাগালের বাইরে। এখনও সময় আছে।

সে বলল, 'আমাকে যেতেই হবে। মামাকে খবর না দিলেই নয়। আচ্ছা, সেলাম।'

'সেলাম।'

সদাশিব ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। সে তখন সিন্ধুঘোটককে খুলে নিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল, যে রাস্তা প্রহরী দেখিয়ে দিয়েছিল সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ছয়

সদাশিব চলেছে তো চলেছেই। দিন যায়, রাত আসে; আবার দিন আসে। পূর্ণিমা কেটে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। কিন্তু জিঞ্জির পথ আর শেষ হয় না। কোথায় জিঞ্জি? কত দূরে?

এদিকে রাস্তার ধারে ধারে যে-সব গ্রাম আছে তাদের অবস্থা ভাল। এদিকে তো আর লুটপাট হয়নি। গ্রামবাসীরা সদাশিবকে খেতে দেয়, রাত্রে শোবার জায়গা দেয়। সদাশিব প্রশ্ন করে, 'জিঞ্জি এখান থেকে কত দূর?'

তারা হাঁ করে থাকে, বলে, 'জিঞ্জি আবার কি?'

সদাশিব ঘুরিয়ে বলে, 'বিজাপুরী পল্টন কোন্ দিকে গেছে?'

তারা আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই দিকে।'

সদাশিব সেই দিকে ঘোড়া চালায়।

রাস্তা আগের মতই আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু; মাঝে মাঝে নদী আছে। রাস্তায় যারা যাতায়াত করে তারা কেউ দূরের যাত্রী নয়, বেশির ভাগই এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যায়। কদাচিৎ দু'একদল সওদাগরের উট গলা উঁচু করে চলে যায়; দু'চারটে গরুর গাড়ি মালের বোঝা নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে চলতে থাকে।

একদিন বিকেলবেলা সদাশিব চলেছে, শুনতে পেল পিছনে খট্‌খট্ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দু'জন সওয়ার আসছে। তাদের সাজপোশাক তলোয়ার বল্লম দেখে সদাশিব বুঝল এরা বিজাপুরী সৈনিক। সে তাড়াতাড়ি রাস্তার এক পাশে সরে গেল।

বিজাপুরী সওয়ারদের তেজী ঘোড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সদাশিবের পাশাপাশি হল। সদাশিবের ঘোড়া দেখে বিজাপুরী ঘোড়া দুটো অবজ্ঞাভরে নাক ঝাড়া দিল। সওয়ার দু'জনও সিন্ধুঘোটকের পানে তাকাতে তাকাতে চলল। তারা নিজের ঘোড়ার বেগ কমিয়ে সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

সদাশিব লক্ষ্য করল সওয়ার দু'জন সামান্য সিপাহী শ্রেণীর লোক নয়, তাদের দর্জা আরও উঁচু। বোধহয় হাবিলদার কি জমাদার। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ হেসে উঠে বলল, 'শোভান মিঞা, এমন জালার মত পেটওয়ালা ঘোড়া কখনও দেখেছ?'

শোভান মিঞা হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল, তারপর তার চোখ ঘোড়া ছেড়ে আরোহীর দিকে উঠল। সে দেখল, একটা ছোট ছেলে, এখনো গোঁফ ওঠেনি। সে বলল, 'কি রে ছোঁড়া, তোর ঘোড়া কি খায়?'

সদাশিব বলল, 'ঘাস খায়।'

দু'জনে হো হো করে হেসে উঠল। যেন ভারি হাসির কথা। অন্য মিঞা জিজ্ঞাসা করল, 'শুধু ঘাস খায়? দানা খায় না?'

সদাশিব বলল, 'না।'

শোভান মিঞা বলল, 'তবে বোধহয় হাওয়া খায়। হাওয়া খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে গেছে। উড়তে পারে?'

সদাশিব মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু।'

শোভান মিঞা বলল, 'তবে পক্ষীরাজ নয়। পক্ষীরাজ হলে উড়ত। কি বলো হায়দর মিঞা?'

এইভাবে হাসি-মস্করা করতে করতে দুই মিঞা সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কিছুদূর চলবার পর হায়দর মিঞা সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর নাম কি রে? কোথায় যাবি?'

'আমার নাম সদাশিব। আমি জিঞ্জি যাব।'

'তুইও জিঞ্জি যাবি! জিঞ্জিতে তোর কী দরকার?'

'মামার সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হয়েছে মনে হল। হায়দর মিঞা সন্দেহভরা চোখে তার পানে তাকিয়ে বলল, 'তোর বাড়ি কোথায়? কোথা থেকে আসছিস?'

'পুণা থেকে।'

'পুণা থেকে!'

হায়দর মিঞা আর শোভান মিঞা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর হায়দর মিঞা কড়া সুরে বলল, 'তুই জিঞ্জিতে কার কাছে কি জন্যে যাচ্ছিস সব কথা খুলে বল। নইলে কেটে ফেলব।'

সদাশিব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম—'

'বল। সত্যি কথা বলবি।'

সদাশিব তখন শিবাজীর শেখানো গল্প বলল, 'আমার মামা বলবন্ত রাও নাইক বিজাপুরের মনসবদার শাহজীর সৈন্যদলের এক-

জন হাবিলদার। পুণায় মামার ঘরবাড়ি জমি-জিরাত আছে, মালদার লোক। মামা পুণায় থাকে না, শাহজীর ফৌজের সঙ্গে বিজাপুরে থাকে; আর মামী ছেলেপুলে নিয়ে পুণায় থাকে। আমিও মামার বাড়িতে থাকি। এক মাস আগে শিবাজীর দলের ডাকাতেরা মামার ঘরবাড়ি লুটে নিয়ে গেছে। তাই আমি মামাকে খবর দিতে বেরিয়েছিলাম। বিজাপুরে গিয়ে শুনলাম মামা শাহজীর সঙ্গে জিঞ্জি গিয়েছে। তাই আমিও জিঞ্জি যাচ্ছি।'

দুই মিঞা আবার মুখ তাকাতাকি করল। শোভান মিঞা বলল, 'শাহজী ভোঁস্‌লে শিবাজীর বাপ তুই জানিস?'

সদাশিব বলল, 'জানি। বাপ-বেটায় মুখ দেখাদেখি নেই।'

'হুঁ।' দুই মিঞা কিছুক্ষণ খাটো গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলল, তারপর শোভান মিঞা সদাশিবকে বলল, 'আমরাও জিঞ্জি যাচ্ছি, তুই আমাদের সঙ্গে আয়।'

সদাশিব উল্লসিত হয়ে বলল, 'তোমরাও জিঞ্জি যাচ্ছ? তবে তো ভালই হল। একলা যেতে বড় ভয় করে। তোমরা বুঝি বিজাপুরের ফৌজদার?'

'হ্যাঁ। আয় আমাদের পিছন পিছন।'

'আচ্ছা। কতদিন আর লাগবে জিঞ্জি পৌঁছতে?'

'কাল সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছনো যাবে।'

দু'জনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সদাশিব ওদের পিছনে চলল।

কিন্তু সদাশিবের প্রাণে শান্তি নেই। এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। ওরা যদি মিথ্যে কথা ধরে ফেলে তবেই সর্বনাশ। ওরা নিশ্চয় বিজাপুর দরবারের দূত, জিঞ্জিতে যাচ্ছে শাহজীকে বন্দী করতে। এখন উপায়? যেমন করে হোক ওদের আগে শাহজীকে সাবধান করে দিতে হবে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই এমন সময় সদাশিব এক গ্রামে এসে উপস্থিত হল। মিঞারা আগেই এসেছে। গ্রামের বেশির ভাগ লোক মুসলমান, দু'চার ঘর হিন্দু আছে। সদাশিব দেখল মিঞাদের ঘোড়া দুটিকে দু'জন ষণ্ডা লোক ডলাই-মলাই করছে। মিঞা দু'জন খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে বসেছে, ফরসিতে তামাকু খাচ্ছে। গ্রামবাসীরা অনেকে খাটিয়া ঘিরে উপুড় হয়ে বসেছে। হাসি গল্প হচ্ছে।

সদাশিবকে দেখে শোভান মিঞা বলল, 'আরে, তুই এসেছিস! আমি ভেবেছিলাম তোর ঘোড়াটা রাস্তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল, যেন মিঞার রসিকতা বুঝতেই পারেনি এমনি সরলভাবে বলল, 'ঘুমোয়নি। বড্ড থকে আছে কিনা

তাই বেশি জোরে ছুটতে পারে না।—আমি কি আজ এই গ্রামেই থাকতে পাব?'

হায়দর মিঞা বলল, 'হ্যাঁ, পাবি। আমরাও থাকব। তুইও থাকবি। কাল সকালে এক সঙ্গে বেরুব।'

সদাশিব মিঞাদের মতলব বুঝল; তারা তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে। কিন্তু সদাশিবের মতলব অন্য রকম; ওদের আগে তাকে জিঞ্জি পৌঁছতে হবে। ওরা যদি শাহজীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে জিঞ্জি যাত্রা করে থাকে, তাহলে যেমন করে হোক ওদের আগে শাহজীর ছাউনিতে পৌঁছনো দরকার।

সে-রাত্রে সদাশিব একজন হিন্দু গ্রামবাসীর ঘরে খাওয়া-দাওয়া করে তার দাওয়ায় শুয়ে রইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেল মিঞারা খানাপিনা হৈ-হুল্লোড় করছে।

সাত

শেষ রাত্রে তার ঘুম ভাঙল। কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ আকাশের মাঝখানে, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝিমঝিম করছে। গ্রাম নিশুতি। সদাশিব আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল সিন্ধুঘোটক রাস্তার এক পাশে বসে আছে। সদাশিবকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

সদাশিব সিন্ধুঘোটকের মুখে লাগাম লাগালো, পিঠে কম্বল বাঁধল, তারপর যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ল; গ্রাম থেকে কিছু দূরে গিয়ে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সকাল হতে এখনও দু'তিন ঘড়ি দেরি আছে, সদাশিব এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

সকাল হল; তারপর সূর্য মাথায় উঠল। সদাশিব চলেছেই। মাঝে দু'একটা গ্রাম পড়ল, সদাশিব থামল না। এদিকে সে যতই এগিয়ে চলেছে ততই চারিদিকে পাহাড় ঘিরে ঘুরে আসছে। দাক্ষিণাত্য পার্বত্য দেশ, কিন্তু মাঝে মাঝে সমতল উপত্যকা আছে। এখন আবার পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে পাথুরে পথ পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

সদাশিব সামনের দিকে চলেছে বটে কিন্তু তার কান পড়ে আছে পিছন দিকে। ঐ বুঝি ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু দুপুর কেটে গেল, মিঞাদের দেখা নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করে তাদের বোধহয় ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে।

বিকেলের দিকে পাহাড়ের খাঁজে এক জায়গায় কাঁচ ঘাস দেখে সদাশিব সিন্ধুঘোটককে সেখানে ছেড়ে দিল, নিজেও কিছু খেয়ে নিল। থলিতে সে মাঝে মাঝে যে খাবার সংগ্রহ করেছে তা প্রায় শেষ হয়ে এল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সে আবার চলল। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মেঘ ঘোরাফেরা করছে, হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। তার আগে জিঞ্জি পৌঁছতে পারলেই ভাল। জিঞ্জি আর বেশি দূর নয়।

পাহাড়ী জায়গায় কখন সূর্যাস্ত হয় বোঝা যায় না। সদাশিব দেখল, সূর্য দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘের গায়ে সোনালী রোদ লেগে আছে। সূর্যাস্ত হতে বেশি দেরি নেই। সদাশিব আরও জোরে ঘোড়া চালাল। কৈ, জিঞ্জি আর কত দূর?

এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে; মাটি ভিজে ভিজে, গাছের পাতায় জল লেগে আছে। সামনে নিচের দিকে গভীর একটা খাত দেখা যাচ্ছে, তার কিনারায় ছোট্ট একটি গ্রাম। সিন্ধুঘোটক সামনে ঢালু রাস্তা পেয়ে জোরে চলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় পিছনে শব্দ শুনে সদাশিব চমকে উঠল।

ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্‌ শব্দ। সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হ্যাঁ, দুই মিঞা আসছে।

সদাশিব গাঁয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতে তারা এসে সদাশিবকে ধরে ফেলল; তিনটে ঘোড়া মুখোমুখি দাঁড়ালো। হায়দর মিঞা চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই আমাদের ফেলে পালিয়ে এসেছিস যে!'

সদাশিব অবাক হয়ে বলল, 'পালিয়ে আসব কেন? তোমাদের সঙ্গে বেরুলে পেছিয়ে পড়তাম তাই আগে বেরিয়েছি। এখন এক-সঙ্গে যাব।'

'হুঁ।' মিঞারা দেখল সদাশিব ন্যায্য কথাই বলেছে। তারা আর কিছু বলল না।

ইতিমধ্যে তিনজন সওয়ারকে রাস্তায় দেখে গাঁয়ের কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, শোভান মিঞা তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'জিঞ্জি আর কত দূর?'

একজন সামনে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে ওর ওপারে জিঞ্জি দুর্গ। এখান থেকে তিন চার কোশ।'

শোভান মিঞা বলল, 'এস, রাত্রি হবার আগেই জিঞ্জি পৌঁছনো যাবে।' বলে ঘোড়ার রাশ আলগা করল।

গ্রামবাসী বলল, 'আজ পৌঁছতে পারবেন না।'

শোভান মিঞা ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল, বলল, 'কেন? আজ পৌঁছতে পারব না কেন?'

গ্রামবাসী বলল, 'আজ্ঞে, নদী ফুলেছে।'

'নদী ফুলেছে! তার মানে?'

'আজ্ঞে, নদীতে ঢল নেমেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল কিনা।'

'তাই না কি? চল তো দেখি।'

সকলে এগিয়ে চলল। গ্রাম পার হতে না হতেই কানে এল কল্-কল্ শব্দ। সামনে নদীর খাত। বেশি চওড়া নয়, বড় জোর চল্লিশ গজ। তার কানায় কানায় জল ভরে উঠেছে, ঘোলা জল পাগলের মত ছুটে চলেছে। জিঞ্জি যাবার রাস্তাটা খাতের কিনারা পর্যন্ত এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে, আবার খাতের ওপারে আরম্ভ হয়েছে। মাঝখানে দুরন্ত নদী।

তিন ঘোড়সওয়ার খাতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল; গ্রামবাসীরাও তাদের দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। হায়দর মিঞা কিছুক্ষণ ছুটন্ত জলের পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'জল কত?'

একজন বলল, 'তিন মানুষ।'

শোভান মিঞা আর হায়দর মিঞা মুখ তাকাতাকি করল, 'তাহলে?'

'এ নদী পার হওয়া যাবে না। যতদিন না জল কমে ততদিন এখানেই থাকতে হবে।'

'কতদিনে জল কমবে ঠিক কি?'

গ্রামবাসী বলল, 'জনাব, আর যদি পাহাড়ে বৃষ্টি না হয়, রাতারাতি জল কমে যাবে। কাল সকালে দেখবেন আবার হাঁটু-জল।'

'তাহলে আজ রাত্তিরটা গ্রামেই থাকা যাক।'

সদাশিবের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। এই সুযোগ। শিবাজী বলেছিলেন সিন্ধুঘোটক তিন মণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কৃষ্ণা গোদাবরী পার হতে পারে। মিঞারা পড়ে থাকুক, সে আজই নদী পার হয়ে জিঞ্জি পৌঁছবে।

সদাশিব বলল, 'আমাকে আজই যেতে হবে। না গেলে মামা মারবে।'

শোভান মিঞা বলল, 'বলিস কিরে ছোঁড়া! এই নদী পার হবি কি করে?'

'পার হতে না পারি ডুবে মরব'—এই বলে সদাশিব ঘোড়াসুদ্ধ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মিঞারা হতভম্ব। গ্রামের লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল। গেল! গেল! এবার ছোঁড়া ডুবে মল!

সিন্ধুঘোটকের কিন্তু ডোবার নামটি নেই, সে অম্লানবদনে সাঁতার কেটে চলেছে; তার জালার মত পেট তাকে ভাসিয়ে রখেছে। অবশ্য সব ঘোড়াই অল্পবিস্তর সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু এই স্রোতে ঐরাবতও ভেসে যায়, ঘোড়া তো দূরের কথা। সিন্ধুঘোটকও সোজা-সুজি নদী পার হতে পারল না, তেরছাভাবে খানিক দূর ভেসে গেল, তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ওপারে উঠল।

সদাশিব মনে মনে বলল, 'জয় ভবানী।'

মিঞারা জুল্ জুল্ করে চেয়ে রইল! সিন্ধুঘোটকের পেট নিয়ে তারা কত ঠাট্টা তামাশা করেছে, সেই সিন্ধুঘোটকের যে এত কেরামতি তা কে জানত! সিন্ধুঘোটকের কাছে তাদের তেজী আরবী ঘোড়ার মাথা হেঁট হয়ে গেল। ধন্য সিন্ধুঘোটক।

সিন্ধুঘোটক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলল।

মিঞাদের সামনা-সামনি এসে সদাশিব ওপার থেকে হাঁক দিয়ে বলল, 'আমি চললাম। আদাব মিঞাসাহেব।' এই বলে সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আট

পাহাড়ের মাথার ওপর মুকুটের মত জিঞ্জি দুর্গ। দুর্গ তো নয়, যেন মেঘের বুকে অমরাবতী। তাকে ঘিরে আছে স্তরে স্তরে সাতটি প্রাকার। সব চেয়ে নিচে যে প্রাকার তার বেড় দুই ক্রোশ। তার ভিতরে আবার প্রাকার, তার ভিতর আবার। এমনি সাতটি প্রাকার ডিঙিয়ে তবে দুর্গের মণিকোঠায় পৌঁছনো যায়।

বিজাপুরের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তার সৈন্যদল নিয়ে জিঞ্জি দুর্গ ঘিরে বসেছেন; কিন্তু ছয় মাসেও দুর্গের প্রথম প্রাকার ভেদ করতে পারেননি। তিনি প্রাকারের বাইরে থানা দিয়ে বসে আছেন; তাঁর অধীনস্থ মনসবদারেরাও তাঁদের সৈন্য সিপাহী নিয়ে বসে আছেন। শাহজী এই সব মনসবদাবের একজন। সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, সিপাহীরাও সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু দুর্গ জয়ের কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

ভোরের আলোয় প্রাকারের বাইরে বিজাপুরী সৈন্যদের ছাউনি দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের কোলে মেঘ লেগে আছে; শিবিরের পর শিবির। কিন্তু শিবির চক্র নিস্তব্ধ, এখনও সৈন্যদল জেগে ওঠেনি।

শাহজীর তাঁবু নিজের সৈন্যদলের মাঝখানে। তিনি সেদিন সকালে নিজের তাঁবুতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। শাহজী একদিকে

যেমন খুব বীর ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শৌখিন বিলাসী ছিলেন। নাচগানের প্রতি তাঁর ভারি অনুরাগ ছিল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত নাচ গান আমোদ প্রমোদে কাটিয়ে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। ভোর হতে না হতেই তাঁবুর বাইরে কথা কাটাকাটির আওয়াজ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

বিরক্তভাবে বিছানায় উঠে বসে তিনি শুনতে পেলেন তাঁবুর দ্বাররক্ষী কাকে যেন বলছে, 'তুই কে রে, সাত-সকালে মনসবদারের দেখা চাস! এখন দেখা হবে না, মনসবদার ঘুমোচ্ছেন। যা, দু'ঘড়ি পরে আসিস।'

একটি তরুণ মারাঠী কণ্ঠ মিনতি করে বলছে, 'বড় জরুরী কাজ, দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মনসবদারের ছেলে শিবাজী ভোঁস্‌লে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

দ্বাররক্ষী বলছে, 'শিবাজীর কাছ থেকে আসছিস তার নিশান আছে?'

'আছে, কিন্তু সে তুমি চিনতে পারবে না। তুমি একবারটি মনসবদারের কাছে এত্তালা দাও—'

এই সময় শাহজী ভিতর থেকে হাঁক দিলেন, 'ওরে, কে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়।'

তখন দ্বাররক্ষী সদাশিবকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে গেল। শিবিরের দেয়াল মখমল দিয়ে মোড়া, ছাদ কিংখাবের, মেঝেয় পুরু পারসী গালিচা। শাহজী খাটের ওপর মল্‌মলের চাদর-ঢাকা বিছানায় বসে আছেন; চোখ দুটি লাল, মুখে বিরক্তির ভাব। অসময়ে কে তাঁর ঘুম ভাঙাল?

সদাশিবকে দেখে তিনি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'কে তুই? কোথা থেকে এসেছিস?

সদাশিব বলল, 'আমার নাম সদাশিব। শিবাজী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তোর্ণা দুর্গ থেকে আসছি।'

শাহজী বললেন, 'বটে! নিশান দেখি।'

'এই যে নিশান।' সদাশিব কাছে গিয়ে হাতে বাঁধা তামার কবচ দেখাল—'মা জিজাবাঈ বলেছেন এই তাবিজ দেখলে তুমি চিনতে পারবে।'

শাহজী তাবিজ দেখলেন; তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। দ্বাররক্ষীকে হাত নেড়ে বিদায় করে তিনি সদাশিবকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'জিজা তোকে পাঠিয়েছে! শিব্বা পাঠিয়েছে! বোস তুই আমার কাছে।'

সদাশিব খাটের কিনারায় বসল। শাহজী ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'কেমন আছে রে তারা? কতদিন যে তাদের দেখিনি!'

সদাশিব বলল, 'সবাই ভাল আছেন। শিবাজী একটা জরুরী খবর দিতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'জরুরী খবর! কী খবর?'

সদাশিব তখন এক নিশ্বাসে সমস্ত খবর বলল। শাহজী তার মুখের ওপর চোখ রেখে শুনলেন। বলা শেষ হলে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষে তিনি ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'শিব্বা! জিজা! আমি ওদের কোনো দিন খবর নিইনি। কিন্তু ওরা আমাকে এত ভালবাসে! আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত দূরে খবর পাঠিয়েছে!' এই বলে তিনি সদাশিবের গলা জড়িয়ে ধরে আরও জোরে কাঁদতে লাগলেন।

সদাশিব বলল, 'আর কিন্তু বেশি সময় নেই। সুলতানের পরোয়ানা নিয়ে এখনি লোক এসে পৌঁছবে।'

শাহজী চোখ মুছে বললেন, 'আসুক, আমি পরোয়া করি না। আমার যা হবার হবে, তুই শিব্বার কাছে ফিরে যা। তাকে বলিস, আমার জন্যে যেন সে বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ না করে। মারাঠা দেশে বিজাপুরের যত দুর্গ আছে সব শিব্বা কেড়ে নিক, দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করুক। আমার গোলামি করে জীবন কেটে গেল, শিব্বা যেন কারো গোলাম না হয়।'

সদাশিব বলল, 'কিন্তু সুলতান যদি তোমাকে কোতল করে?'

শাহজী বললেন, 'শাহজী ভোঁস্‌লেকে কোতল করা অত সহজ নয়; এখনো পাঁচ হাজার সিপাহী আমার রুটি খায়। কিন্তু সে যাক। শিব্বাকে বলিস আমার কথা যেন না ভাবে। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবব। তবে শিব্বা যেন আমাকে একেবারে ভুলে না যায়।' শাহজীর চোখে আবার জল এসে পড়ল।

আবার কান্নাকাটি শুরু হচ্ছে দেখে সদাশিব উঠে পড়ল, বলল, 'আমি তাহলে এবার যাই। তোমার সব কথা শিব্বা রাজাকে বলব।'

শাহজী তার হাত ধরে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইলেন। বললেন, 'কী ছেলে রে তুই! এতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি, এত সাহস! একলা এই শত্রুপুরীতে এসেছিস!' তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন. 'সাবাস! এই তো চাই। যার বুদ্ধি আর সাহস আছে সে পৃথিবী জয় করতে পারে। তোরাও পারবি।'

তিনি বালিশের তলা থেকে এক মুঠি মোহর নিয়ে সদাশিবকে দিলেন, 'এই নে তোর রাস্তার খরচ। আর এই নে আংটি; এটা

জিজাকে দিস। তার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, এই আমার শেষ উপহার।'

হীরের আংটি নিজের আঙুল থেকে খুলে শাহজী সদাশিবকে দিলেন; কাঁইবিচির মত হীরেটা ঝক্‌মক করে উঠল।

সদাশিব আংটি আর মোহর কোমরে গুঁজল তারপর শাহজীকে প্রণাম করে বাইরে এল। শাহজী জল-ভরা চোখে তার পানে চেয়ে রইলেন।

নয়

সদাশিব ফিরে চলেছে। তার বুকে কার্যসিদ্ধির আনন্দ, ট্যাঁকে মোহর আর আংটি। সে যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে।

মুস্তাফা খাঁ'র ছাউনি পার হয়ে সে একবার পিছন ফিরে তাকালো। ছাউনির সিপাহীরা জেগে উঠেছে। তাদের মাথার ওপর জিঞ্জি দুর্গের বিরাট আয়তন আকাশ ভেদ করে উঠেছে, সকালবেলার কাঁচা রৌদ্রে ঝলমল্ করছে।—

জিঞ্জি দুর্গ পিছনে রেখে সদাশিব এগিয়ে চলল। ঘরের দিকে তার মন টানছে, শিবাজীর দিকে মন টানছে। সিন্ধুঘোটকও বোধহয় বুঝতে পেরেছে, সে মোটা পেট নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে।

সদাশিব ভাবতে ভাবতে চলেছে। শিবাজী রাজাকে দেখবার জন্য তার মন আন্‌চান্ করছে, মা জিজাবাঈয়ের আঙুলে আংটি পরিয়ে দেবার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। কিন্তু তোর্ণা দুর্গে ফিরে যেতে বারো চৌদ্দ দিন লাগবে। সেবন্তী বহিন বলেছিল নগর থেকে কিছু-মিছু আনতে। নগর অর্থাৎ বিজাপুর শহর দেখা হয়নি; ফেরার পথে বিজাপুরে গেলে কেমন হয়? সদাশিব কখনও বড় শহর দেখেনি। বিজাপুর নাকি দাক্ষিণাত্যের সেরা শহর। মন্দ কি, শহর দেখাও হবে, সেবন্তীর জন্যে কিছু-মিছু কেনাও হবে। সেজন্যে যদি দু'ঘড়ি দেরি হয়, ক্ষতি কি? আসল কাজ তো হয়ে গেছে।

সেবন্তীর জন্যে কী কিনবে সে? খুব দামী জিনিস কিনবে। রাঙা টকটকে চুন্‌রী শাড়ি; রুপোর বালা, রুপোর হাঁসুলি। সদাশিবের তো আর পয়সার অভাব নেই। ট্যাঁকে করকরে মোহর।

সেবন্তীকে মনে পড়লে কুঙ্কুর কথাও মনে পড়ে। কুঙ্কু গ্রামে আছে, সে জানেও না সদাশিব কোথায়। কুঙ্কুর জন্যে কিছু কিনবে না? অবশ্য কিনলেও কুঙ্কুকে দেওয়া হবে না, আবার কবে কুঙ্কুর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! তবু কুঙ্কুর জন্যে সে কিছু কিনবে, কিনে

নিজের কাছে রেখে দেবে। তারপর যখন দেখা হবে—

কুঙ্কুর জন্যে কী কিনবে? শাড়ি? উঁহু। গয়না? ..একটা আংটি কিনলে কেমন হয়? সোনার আংটি! শাহজী জিজাবাঈকে যেমন আংটি দিয়েছেন, সেও তেমনি কুঙ্কুকে আংটি দেবে—

সামনে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে সদাশিবের চমক ভাঙল। সে চোখ তুলে দেখল, ঐ রেঁ. শোভান মিঞা আর হায়দর মিঞা আসছে। এতক্ষণে তারা নদী পার হয়েছে।

সদাশিব চট্ করে বুদ্ধি স্থির করে নিল। সামনা-সামনি হতেই মিঞারা রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। হায়দর মিঞা কট্মট্ করে তাকিয়ে বলল, 'কি রে, তুই এখুনি ফিরে যাচ্ছিস যে?'

সদাশিব কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমার মামা মরে গেছে। লড়াই করতে করতে মরে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি মামীকে খবর দিতে যাচ্ছি।—নদীর জল কি কমে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে আদাব।'

সদাশিব ঘোড়া চালিয়ে দিল, আর পিছন ফিরে চাইল না। মিঞারা কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর সামনের দিকে ঘোড়া চালাল। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ'র কাছে সুলতানের পরোয়ানা আগে দাখিল করা দরকার।

দশ

যেদিন সদাশিব তোর্ণা দুর্গ থেকে বেরিয়েছিল, ঠিক তার এক মাস পরে সে ফিরে এল। ফেরার পথে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কিন্তু সদাশিব বিজাপুর শহর না দেখে ছাড়েনি। কী শহর! চারিদিকে রঙবেরঙের মীনার গম্বুজ, দোতলা তিনতলা বাড়ি; রাস্তায় হাতী ঘোড়া, ওমরাদের তাঞ্জাম। বাজারে ঢুকলে চোখ ঝলসে যায়, কোথাও ফল ফুলের দোকান, কোথাও সারি সারি কাপড়ের পট্টি, কোথাও হীরা জহরতের মন্ডী। সদাশিব সেবন্তীর জন্যে লাল চুন্‌রী শাড়ি কিনল, রুপোর বালা রুপোর হাঁসুলি কিনল। আর কুঙ্কুর জন্যে চুপিচুপি কিনল একটি সোনার আংটি। আংটি সে লুকিয়ে রেখে দিল, কেউ দেখতে না পায়।

বিজাপুরের এক মুসাফিরখানায় রাত কাটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এবার বাড়ির রাস্তা। যেতে যেতে সে লক্ষ্য করল, গ্রামগুলিতে লোক ফিরে এসেছে। বিজাপুরী সৈন্য যে এ পথ দিয়ে ফিরবে না তা সকলে জানতে পেরেছে।

একদিন বিকেলবেলা সদাশিব এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, শুনতে পেল পাশের দিক থেকে মিহি মেয়েলী গলায় কে তাকে ডাকছে—'সদাশিব ভাই!'

সেবন্তী! সেবন্তী রাস্তার ধারের গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রোজ তার প্রতীক্ষা করে, আজ তাকে দেখেই চিৎকার করে ডাকল, 'সদাশিব ভাই, তুমি এত দেরি করলে, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলে না।'

সদাশিব বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাব, তা কি হয় সেবন্তি বহিন? যেতে যেতে ভাবছিলাম এইখানেই কোথাও তোমার গ্রামটা আছে কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছিলাম না। ভাগ্যিস তুমি ডাকলে!'

গ্রামের লোক গ্রামে ফিরে এসেছিল। সেবন্তী সদাশিবকে নিয়ে গ্রামে গেল। সকলে তার আদর যত্ন করল। চুনরী শাড়ি আর গয়না পেয়ে সেবন্তী আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

রাত্রে সদাশিব গ্রামেই রইল। পরদিন ভোরে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। এবার সিধা তোর্ণা দুর্গ! শিবাজী রাজা! মা জিজাবাঈ!

দু'দিন পরে সদাশিব যখন তোর্ণা দুর্গের সামনে এসে দাঁড়াল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তোরণ খুলে শিবাজী বেরিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে দুর্গের সমস্ত লোক। সদাশিব লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। শিবাজী তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কাম ফতে?'

সদাশিব বলল, 'ফতে।'

শিবাজী সদাশিবকে বুকে জড়িয়ে নিলেন, বললেন, 'সাবাস! আজ থেকে তুমি সর্দার সদাশিব।'

সকলে মিলে দুর্গে ফিরে গেলেন। ছাদের ওপর সভা বসল; সকলে চমৎকৃত হয়ে সদাশিবের ভ্রমণ কাহিনী শুনলেন। শাহজী ছেলেকে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন শুনে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। মা জিজাবাঈ-এর চোখে আনন্দের জ্যোতি ফুটল।

সদাশিব হীরের আংটি বের করে জিজাবাঈকে দিয়ে বলল, 'এই নাও মা, এই আংটি মনসবদার তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন।'

আংটি হাতে নিয়ে জিজাবাঈ চিনতে পারলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি সদাশিবের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন, চোখ মুছে বললেন, 'সদাশিবকে এবার তোরা ছেড়ে দে। সব তো শুনলি, আর যদি কিছু শুনতে চাস, কাল শুনিস। এক মাস না খেয়ে খেয়ে ওর মুখ এতটুকু হয়ে গেছে।—আয় সদাশিব।'

জিজাবাঈ সদাশিবের হাত ধরে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলেন।

সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড

সদাশিব সেই যে একদিন গ্রাম থেকে বিঠ্‌ঠল পাটিলের ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিল, তারপর এক বছর কেটে গেছে। এই এক বছরে কত না ব্যাপার ঘটেছে! বিজাপুরী পল্টনকে বারুদ জ্বালিয়ে পোড়ানো, সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে জিঞ্জিতে গিয়ে শিবাজীর বাবা শাহজীর সঙ্গে দেখা করা। তাছাড়া দু' একটা ছোটখাটো যুদ্ধও সদাশিব লড়েছে। যুদ্ধবিদ্যায় তার হাতেখড়ি হয়েছে। সে এখন একজন পাকা বারগীর, শিবাজীর খাস দেহরক্ষী সিপাহীদের একজন। কিন্তু তার মনে একটা দুঃখ আছে; এখনো তার ভাল করে গোঁফ বেরুল না।

এদিকে গ্রীষ্মকাল ফুরিয়ে এল, বর্ষা নামতে আর দেরি নেই। শিবাজী নানা কাজে ব্যস্ত। তিনি বেশীর ভাগ সময় তোর্ণা দুর্গে থাকেন; তোর্ণা দুর্গের পাশেই নতুন দুর্গ রাজগড় তৈরি হচ্ছে, শিবাজী নিজে দাঁড়িয়ে দুর্গ গড়ার কাজ তদারক করছেন। তাছাড়া তাঁকে মাঝে মাঝে পুণায় যেতে হয়। অন্যান্য বারগীর সিপাহীদের সঙ্গে সদাশিবও তাঁর সঙ্গে থাকে। পুণায় নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র গোলা-

বারুদ সাঁজোয়া তলোয়ার তৈরি হচ্ছে, বড় বড় কামারশালায় হাজার লোক কাজ করছে। শিবাজী নিজের চোখে সব কাজ দেখেন, তারপর আবার ফিরে আসেন তোর্ণা দুর্গে। মা জিজাবাঈ অবশ্য তোর্ণা দুর্গেই আছেন।

সদাশিব তোর্ণা দুর্গে জিজাবাঈ-এর মহলের এক পাশে একটা ছোট কুঠুরির মধ্যে থাকত। পাথরের মেঝেয় বিছানা পাতা, পাশে দেয়ালে অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। জিজাবাঈ মাঝে মাঝে এসে তার ঘর দোর পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন। সদাশিবের ওপর মায়ের বড় স্নেহ। তাই দেখে শিবাজী ঠাট্টা করে বলতেন--'সদাশিব মায়ের কোলের ছেলে।'

সদাশিব লজ্জা পেত, মা শুধু হাসতেন।

একদিন সকালবেলা তোর্ণা দুর্গে খুব হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। শিবাজী আজ রাতে পুণায় যাবেন সঙ্গে পঞ্চাশজন বারগীর থাকবে। সকলেই কাজে ব্যস্ত। কেউ নিজের ঘোড়া ডলাই-মলাই করছে, কেউ তলোয়ারে শান দিচ্ছে কেউ বা জামা কাপড় পাগড়ী ক্ষার দিয়ে কেচে শুকিয়ে নিচ্ছে। পুণায় কতদিন থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। হয়তো রাস্তায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, লড়াই বাধবে। হর হর মহাদেও।

সদাশিব শিবাজীর সঙ্গে যাবে। সে ভোরে উঠেই নিজের ঢাল তলোয়ার পরিষ্কার করেছে, তারপর ঘোড়ার পরিচর্যা করবার জন্যে ঘোড়াশালায় গিয়েছে। তার ঘোড়াটি, অর্থাৎ সেই হাড়-জিরজিরে মড়াখেকো ঘোড়াটি, যার পিঠে চড়ে সে গ্রাম থেকে এসেছিল, এই এক বছর খাওয়া দাওয়া করে বেশ তেজী হয়ে উঠেছে। তাকে এখন আর সেই ঘোড়া বলে চেনা যায় না। সদাশিব তার নাম রেখেছে—পক্ষিরাজ।

ওদিকে মা জিজাবাঈ সকালবেলা পুজো অর্চনা সেরে শিবাজীর ঘরে গিয়েছিলেন, দেখলেন শিবাজীর ঘর খালি। শিবাজী তখন তোশাখানায় গিয়ে সবনিসের সঙ্গে টাকাকড়ি সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন, পুণায় অনেক টাকা নিয়ে যেতে হবে তারই হিসেব নিকেশ দেখছেন। জিজাবাঈ ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাঁট দিলেন, বিছানা ঝেড়ে গুটিয়ে রাখলেন। তারপর সদাশিবের ঘরে গেলেন।

সদাশিবের ঘরও খালি। ঘরের একপাশে বিছানা এলোমেলো ভাবে গুটানো রয়েছে। জিজাবাঈ প্রথমে ঝাড়ু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করলেন, তারপর বিছানা ঝাড়তে গেলেন। বিছানা ঝেড়ে গোল করে রাখতে রাখতে কী একটা চকচকে ছোট্ট জিনিস ঠুং করে মেঝেতে পড়ল, তারপর চাকতির মতন গড়িয়ে গেল। জিজাবাঈ গিয়ে জিনিসটি কুড়িয়ে নিলেন। দেখলেন একটি আংটি। সোনার আংটি। তিনি

আংটিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। তিনি আংটি আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিজের মহলে ফিরে এলেন।

সদাশিব পক্ষিরাজকে দানাপানি দিয়ে ঘোড়াশাল থেকে বেরিয়েছে, এমন সময় তার মনে পড়ে গেল—ঐ যা! আংটিটা তো বালিশের তলা থেকে সরানো হয়নি! মা ঘর পরিষ্কার করতে আসবেন, যদি আংটি দেখতে পান—!

এ সেই আংটি যা সদাশিব বিজাপুরের বাজার থেকে কুঙ্কুর জন্যে কিনেছিল। নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, কাউকে আংটির কথা বলেনি।

সদাশিব এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। যা ভেবেছিল তাই। মা ঘর-দোর পরিষ্কার করে বিছানা গুটিয়ে রেখে গেছেন। সে তাড়াতাড়ি বিছানা খুলে দেখল—আংটি নেই। কি সর্বনাশ! তবে কি মা—?

এই সময় দোরের কাছ থেকে একজন দাসী ডাকল, 'সদাশিব ভাই, জিজা-মা তোমাকে ডাকছেন।'

সদাশিব ভিজে বেড়ালের মতন দাসীর পিছু-পিছু জিজাবাঈ-এর মহলে গেল। জিজাবাঈ খাবারের থালা সাজিয়ে বসে ছিলেন, বললেন, 'তোরা আজ রাত্তিরে পুণায় চলে যাবি; কবে ফিরবি ঠিক নেই। তাই তোদের জন্যে মোতিচুরের লাড়ু করেছি। আয়, খেতে বোস্।'

সদাশিব খেতে বসল। মা আংটির কথা তুললেন না। দু'চারটে অন্য কথার পর বললেন, 'হ্যাঁরে সদাশিব, এক বছর হল গাঁ থেকে এসেছিস, তোর কি গাঁয়ে গিয়ে আপন জনের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসতে ইচ্ছে করে না?'

সদাশিব করুণ সুরে বলল, 'গাঁয়ে আমার আপন জন কে আছে মা?'

'কেন, তোর মামা মামী আছে।'

'মামা মামী আমাকে ভালবাসে না, সবাই মিলে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'গাঁয়ের কেউ তোকে ভালবাসে না?'

'কেউ না'—বলে সদাশিব গভীর নিশ্বাস ফেলল।

জিজাবাঈ তখন আঁচল থেকে আংটি খুলে তাকে দেখালেন, বললেন, 'এ আংটি তবে কার জন্যে কিনেছিস?'

সদাশিবের মুখে কথা নেই, সে ঘাড় গুঁজে বসে রইল। মা আবার বললেন, 'জিঞ্জি থেকে ফেরবার পথে তুই বিজাপুরে গিয়েছিলি, সেখানে আংটি কিনেছিলি। কেমন?'

সদাশিব ঘাড় নাড়ল। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কার জন্যে

কিনেছিলি?'

আর সকলের কাছে মিথ্যে কথা বলা যায়, মা'র কাছে মিথ্যে কথা বলা যায় না। সদাশিব চিঁ-চিঁ সুরে বলল, 'কুঙ্কুর জন্যে।'

মা হাসলেন, 'কুঙ্কু কে, গাঁয়ের মেয়ে?'

সদাশিব বলল, 'হ্যাঁ। বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ে।'

মা বললেন, 'হুঁ। কেমন দেখতে, কেমন স্বভাব, কত বয়স, সব আমায় বল।'

কুঙ্কুর কথা বলতে সদাশিবের খুবই সংকোচ হল, কিন্তু মায়ের হুকুম তো অমান্য করা যায় না। সে আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলতে আরম্ভ করল। বলতে বলতে কিন্তু তার সংকোচ কেটে গেল। কুঙ্কু কত ভাল মেয়ে, তার কত বুদ্ধি, সে লুকিয়ে সদাশিবকে নিজের খাবারের ভাগ দিত, এই সব কথা বলতে বলতে সদাশিব ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। শেষকালে বলল, 'মা, গাঁয়ের মাতব্বরেরা যখন আমাকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বলল, তখন কুঙ্কুই আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিল শিব্বারাও-এর দলে যোগ দিতে। বলেছিল—'তুমি শিবাজীর কাছে যাও। শিবাজী ডাকাত নয়, তিনি একদিন দেশের রাজা হবেন'।'

সব শুনে জিজাবাঈ মনে মনে খুশী হলেন। বললেন, 'কুঙ্কু ভাল মেয়ে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুই তার জন্য আংটি কিনেছিস, বেশ করেছিস। কিন্তু দিবি কবে? গাঁয়ে যা, আংটি তাকে দিয়ে আয়।'

সদাশিব বলল, 'কি করে যাব মা, কত কাজ রয়েছে। আজ শিব্বারাও-এর সঙ্গে পুণা যেতে হবে। যতদিন না বর্ষা নামছে ততদিন কাজের ছুটি নেই। আর বর্ষা নামলে চারদিক জলে ভরে যাবে, তখন কি যেতে পারব?'

জিজাবাঈ বললেন, 'আচ্ছা, আমি শিব্বাকে বলব।'

সদাশিব ব্যগ্র হয়ে বলল, 'না মা, তুমি শিব্বারাওকে কিছু বোল না। তিনি নিজে থেকে যখন ছুটি দেবেন তখন যাব।'

জিজাবাঈ হেসে বললেন, 'আচ্ছা, সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই এখন যা, লাড্ডু যে সব পড়ে রইল।'

রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে যাবার পর শিবাজী পঞ্চাশজন বারগীর নিয়ে ঘোড়ার পিঠে দুর্গ থেকে বেরুলেন। দু'দণ্ড পরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠবে, তখন পথ চিনে যাবার কোনো অসুবিধা হবে না। লড়াই দাঙ্গার সময়, বেশী সৈন্য সঙ্গে না থাকলে দিনের বেলা পথ চলা নিরাপদ নয়। তাই কোথাও যাবার দরকার হলে শিবাজী রাত্রিকালেই যাতায়াত করতেন।

অন্ধকারে শিবাজীর দল চলেছে। আগে আগে শিবাজী, পিছনে পঞ্চাশজন সওয়ার। ক্রমে চাঁদ উঠল। ভাঙা চাঁদের আবছা আলোতে

পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে শিবাজী চলেছেন। যেন একটা পাহাড়ী ময়াল সাপ এ'কে বে'কে বিবরের সন্ধানে চলেছে।

পুণা পোঁছুতে ভোর হয়ে গেল।

পুণা তখন একটা বড় গোছের গ্রাম ছিল, শহর হয়ে দাঁড়ায়নি। বেশীর ভাগ ঘর-বাড়ির চাল খড়ের, কিছু পাকা বাড়ি আছে। মাঝখানে শিবাজীর বাবা শাহজীর সাবেক মহল, প্রকাণ্ড চক-মিলানো ইমারত। পুণা শাহজীর জাগীর ছিল। শাহজী এখানে স্ত্রীপুত্রকে দাদোজী কোণ্ডদেব নামে এক ব্রাহ্মণের জিম্মায় রেখে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করতে চলে গিয়েছিলেন, তারপব আর ফিরে আসেননি। দাদোজী কোণ্ডদেব শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন, তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন, শিবাজী স্বাধীন হয়ে সমস্ত মারাঠা দেশ নিজের কব্জায় আনবার চেষ্টা করছেন। পুণা তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

পুণায় শিবাজীর প্রায় দু'হাজার সিল্লাদার সৈন্য আছে। তারা স্থায়ী সৈন্য নয়, বর্ষা নামলে যুদ্ধ থেমে যায়, তখন তাবা যে-যার ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে চলে যায়। আবার বর্ষা কেটে গেলে দশহরার দিন এসে হাজির হয়।

শিবাজী সদলবলে এসে নিজের পৈতৃক মহলে উঠলেন। বিরাট মহলে অনেক জায়গা, অসংখ্য ঘর, পঞ্চাশজন বারগীর রক্ষী মহলের মধ্যে রইল। যে দু'হাজার সিল্লাদার সিপাহী আগে থাকতে ছিল, তারা মহলের চার পাশে ছাউনি ফেলে থাকত। যতদিন শিবাজী এখানে ছিলেন না, ততদিন তাদের কোনো কাজ ছিল না, জোয়ার-বাজরির রুটি খেত আর হৈ-হল্লা করে বেড়াত। এখন শিবাজী আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চনকে গেল, যে যার অস্ত্রশস্ত্র ঘষামাজা করতে লাগল। শিবাজী এসেছেন, হুকুম হলেই যুদ্ধে বেরুতে হবে।

শিবাজীর কিন্তু যুদ্ধে বেরুবার কোনো চেষ্টা নেই। তিনি কখনো কামারশালায়, কখনো বারুদের কারখানায় ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম তদারক করে বেড়াচ্ছেন; বাকি সময় দপ্তরখানায় বসে সবনিস চিটনিস সুবাদার থানাদারদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। ভিতরে ভিতরে একটা উদ্যোগ চলছে, কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ নেই।

সদাশিব সর্বদা শিবাজীর কাছে কাছে ঘোরে, কিন্তু শিবাজী নিজের কাজে এমন মগ্ন হয়ে আছেন যে সদাশিবকে লক্ষ্যই করেন না। সদাশিব ভাবে মা জিজাবাঈ বোধ হয় তাঁকে সদাশিবের গাঁয়ে যাবার কথা বলতে ভুলে গেছেন।

কয়েকদিন কেটে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা শিবাজী সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন। দপ্তরখানার দিওয়ানের ওপর বসে শিবাজী একজন মুহুরীকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছেন; তিনি মুখে বলছেন আর

মুহুরী লিখে নিচ্ছে। সদাশিব দিওয়ানের পাশে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়াল।

চিঠি লেখা শেষ হলে মুহুরী গালা দিয়ে চিঠি মোহর করল, তারপর শিবাজীর হাতে দিল। শিবাজী হাত নেড়ে তাকে ইশারা করলেন, সে চলে গেল।

শিবাজী তখন সদাশিবের দিকে ফিরে একটু হাসলেন, বললেন, 'কি রে সদাশিব, মা'র মুখে শুনলাম তুই নাকি গাঁয়ে যেতে চাস?'

মা তাহলে বলেছেন! সদাশিব বলল, 'তুমি যদি ছুটি দাও রাজা, তাহলে যেতে পারি।'

শিবাজী বললেন, 'তুই তো ডোঙ্গরপুরের ছেলে? ডোঙ্গরপুর পুণা থেকে কতদূর?'

'পঁচিশ কোশ উত্তরে।'

'তা বেশ, যা। কতদিনে ফিরবি?'

'তিন চার দিনের মধ্যে ফিরতে পারব।—কবে যাব?'

'আজই বেরিয়ে পড় না। যত শীগ্‌গির যাবি তত শীগ্‌গির ফিরতে পারবি।'

'আচ্ছা' বলে সদাশিব পিছু ফিরছিল, শিবাজী ডাকলেন, 'আর শোন তুই চাকন দুর্গ চিনিস?'

সদাশিব বলল, 'নাম শুনেছি। পুণার উত্তরে।'

'হ্যাঁ। বেশী দূর নয়, এখন যদি বেরিয়ে পড়িস সন্ধ্যের আগে পৌঁছুতে পারবি। তোর গাঁয়ে যাবার রাস্তা থেকে একটু পশ্চিম দিকে বেঁকে যেতে হবে। আমি তোকে রাস্তা বাতলে দেব।'

'চাকন দুর্গে কিছু দরকার আছে?'

'আছে। এই চিঠিখানা চাকন দুর্গের সর্‌-ই-নৌবৎ ফিরঙ্গজি নরসালাকে দিতে হবে। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। ভারি গোপনীয় চিঠি, এ চিঠি যদি ফিরঙ্গজি ছাড়া আর কারুর হাতে পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুই চাকন দুর্গে গিয়ে খুব সাবধানে ফিরঙ্গজির খোঁজ-খবর নিবি, যদি দেখা পাস, ইশারায় তাকে জানাবি তুই শিবাজীর লোক। সে যদি জুন্নরগড়ের নাম করে তখন তার হাতে চিঠি দিবি। জুন্নরগড়! মনে থাকবে তো?'

সদাশিব বলল, 'মনে থাকবে রাজা। জিজা-মা'র মুখে শুনেছি জুন্নরগড় দুর্গের কাছে শিউনেরি গ্রামে তুমি জন্মেছিলে।'

শিবাজী হাসলেন, 'হ্যাঁ। তারপর শোন। ফিরঙ্গজিকে চিঠি দিয়ে তুই নিজের গাঁয়ে চলে যাবি। তারপর ফেরার সময় আবার চাকন দুর্গ হয়ে আসবি। কেমন?'

সদাশিব পাখি-পড়ার মতন বলল, 'চাকন দুর্গে যাব, ইশারায়

জানাব আমি শিবাজীর দূত, যে লোক জুন্নরগড়ের নাম বলবে তাকে চিঠি দেব. আর কাউকে দেব না। চিঠি দিয়ে গ্রামে চলে যাব. ফেরবার সময় আবার চাকন দুর্গে যাব। এই তো?'

'হ্যাঁ, এই।' বলে শিবাজী সদাশিবকে চাকন দুর্গে যাবার রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন।

সদাশিব চিঠিখানা সযত্নে কোমরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়াতে ফিরে এসে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল।

শিবাজী বললেন, 'কি রে?'

সদাশিব বলল, 'রাজা. আমার একটা আর্জি আছে। তোমার একটা ঘোড়া আমায় দাও।'

শিবাজী প্রশ্ন করলেন, 'কেন, তোর নিজের ঘোড়া কী হল? অসুখ করেছে নাকি?'

সদাশিব ঘাড় চুলকোতে লাগল, 'না, আমার ঘোড়া ভালই আছে, কিন্তু—'

'কিন্তু কী? নিজের ঘোড়া চড়ে যাবি না কেন? কি ব্যাপার বল দেখি?'

সদাশিব চুপ করে রইল। শিবাজী তখন হেসে উঠলেন, 'বুঝেছি। গাঁ থেকে কার ঘোড়া চুরি করে পালিয়েছিলি?'

'বিঠ্ঠল পাটিলের ঘোড়া। চুরি আমি করিনি, ঘোড়াটা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছিল—'

শিবাজী আরো খানিকক্ষণ হাসলেন, তারপর বললেন, 'আমাব ঘোড়াশালায় যা, যে ঘোড়াটা তোর পছন্দ সেটা নে। আর, গাঁয়ের পাটিল যদি গণ্ডগোল করে তাকে ঘোড়ার দাম দিয়ে দিস।'

দু'দণ্ডের মধ্যে সাজসজ্জা করে কোমরে তলোয়ার বেঁধে সদাশিব ঘোড়ার পিঠে চড়ল। শিবাজীর ঘোড়াশাল থেকে সে যে ঘোড়াটি বেছে নিয়েছে, তার রঙ্ কালো, ছিপছিপে গড়ন, হাওয়ার মতন ছুটতে পারে। ঘোড়ায় চড়ে সদাশিব উত্তর মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চাকন দুর্গ পুণা থেকে ন' দশ ক্রোশ দূরে, সূর্যাস্তের আগেই সেখানে পৌঁছুতে পারবে।

পুণার পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে যত পাহাড় পর্বত, উত্তর দিকে তত নয়। দু'চারটে নদী নালা আছে, তাও গ্রীষ্মের শেষে শুকিয়ে এসেছে, হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। সদাশিব মনের আনন্দে চলেছে। গ্রামের সকলে তার শত্রু, কিন্তু কুঙ্কু তার বন্ধু. কুঙ্কুকে সে আংটি দেবে। আংটিটা সুতোয় বেঁধে সে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে, আঙরাখার তলায় বুকের কাছে আংটি লুকোনো আছে। কুঙ্কু এতদিনে নিশ্চয় বড়সড় হয়েছে. সদাশিবকে দেখে খুব খুশী হবে। কিন্তু কুঙ্কুর বাবা

বিঠ্ঠল পাটিল তাকে দেখে খুশী হবে কি?

যাক, গ্রামের কথা পরে ভাবলেই চলবে, আগে চাকন দুর্গ। সদাশিব চাকন দুর্গ আগে দেখেনি। মহারাষ্ট্র দেশে অসংখ্য দুর্গ আছে, তার মধ্যে কোন দুর্গ মুসলমানদের অধীন, কোন দুর্গ স্বাধীন। চাকন দুর্গ একদিন শাহজীর জাগীরের মধ্যে ছিল, এখন স্বাধীন। শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশের দুর্গগুলি একে একে নিজের হাতে আনবার চেষ্টা করছেন। হয়তো চাকন দুর্গও তিনি জয় করতে চান। চিঠিখানা ফিরঙ্গজি নরসালার হাতে পৌঁছে দেওয়া বোধ হয় খুব শক্ত হবে না। সদাশিব মনে মনে নানা রকম মতলব আঁটতে আঁটতে চলল।

ক্রমে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল, সামনে অসমতল প্রান্তরের শেষে চাকন দুর্গ দেখা গেল।

পাহাড়ের ডগায় নয়, চৌরস জমির ওপর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চাকন দুর্গ। দুর্গের বাইরে খানিক দূরে একটি গ্রাম। পড়ন্ত রোদ্দুরে গ্রামের খড়-ছাওয়া কুটিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

সদাশিব যখন দুর্গ-তোরণে গিয়ে পৌঁছুলো তখন সূর্য পাটে বসেছে। পাঁচজন পাহারাদার সিপাহী তোরণের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে বল্লম, কোমরে তলোয়ার। সদাশিব কাছে আসতেই তাদের মধ্যে একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'খবরদার!'

সদাশিব ঘোড়া দাঁড় করালো। বলল, 'হর হর মহাদেও।' সে একে একে সকলের মুখ দেখল; সকলের মুখেই সন্দেহ আর বিদ্বেষ, 'হর হর মহাদেও' কথার ইঙ্গিত কেউ বুঝতে পারেনি। প্রহরীদের সর্দার কড়া সুরে বলল, 'কি চাও?'

সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে বিনীতভাবে বলল, 'আমি একজন হিন্দু সিপাহী, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিল্লাদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কোথা থেকে আসছ?'

'অনেক ঘুরে ঘুরে আসছি। বিজাপুরীদের দলে ছিলাম; তা বর্ষা আসছে, ওরা রাখল না। শিবাজীর কাছে পুণায় গিয়েছিলাম, শিবাজীও বিদেয় করে দিল, বলল বর্ষার পরে এস। তাই এখানে এসেছি। দুর্গে কি সিপাহীর দরকার নেই?'

'না, দরকার নেই।'

সদাশিব নিরাশভাবে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রাত্তির হয়ে এল, এখন কোথায় যাব। তোমরা আজ রাত্তিরে আমাকে দুর্গে থাকতে দেবে? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

'না, অচেনা লোককে দুর্গে থাকতে দেবার হুকুম নেই।'

পাঁচজন রক্ষী পিছু হটে দুর্গে প্রবেশ করল, তারপর কড়কড়

শব্দে তোরণ-দ্বার বন্ধ করে দিল।

সদাশিব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘোড়ার রাশ ধরে ফিরে চলল। কার্যসিদ্ধি হল না, আজ বোধ হয় গাছতলায় রাত কাটাতে হবে।

দুর্গ এবং গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাতা-ঝরা গাছ, সদাশিব তার শুকনো ডালে ঘোড়া বেঁধে একটা পাথরের চ্যাঙড়ের ওপর ক্লান্তভাবে বসল। ভাবতে লাগল, এখন কি কর্তব্য। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখতে পেয়েছে কিন্তু কেউ তার কাছে আসছে না; সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সবাই গরু বাছুর রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত; অজানা সিপাহী সম্বন্ধে তাদের কোন কৌতূহল নেই। সারা জন্ম ধরে তারা সিপাহী দেখছে, যেখানে সিপাহী সেখানেই গণ্ডগোল।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সদাশিব চোখ তুলে দেখল চাকন দুর্গের নিস্তব্ধ ধূসর মূর্তি শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গে যেন জনমানব নেই, একটি প্রদীপ জ্বলছে না; কেবল প্রাকারের ওপর টহলদার প্রহরী নিশাচর পাখির মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সদাশিবের মাথায় আস্তে আস্তে একটি বুদ্ধি গজাতে লাগল। দুর্গের লোকেরা ভারি সন্দিগ্ধ, ভারি সতর্ক; সিধা পথে তারা ফিরঙ্গজির সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। শিবাজী বলেছিলেন কোন উপায়ে ফিরঙ্গজিকে জানিয়ে দিতে হবে যে শিবাজীর দূত তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে...কথা বলার সুযোগ যদি না হয়, অন্য উপায়ে সংকেত পাঠানো কি যায় না? ফিরঙ্গজি দুর্গের সর্-ই-নৌবৎ, সে নিশ্চয় রাত্রে উঠে তদারক করে প্রহরীরা প্রাকারে ভালভাবে পাহারা দিচ্ছে কিনা। প্রহরীরা অনেক সময় প্রাকারে ঠেস দিয়ে বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নেয়, তাই কিল্লাদারকে সাবধান থাকতে হয়...

হঠাৎ বোকাটে ধরনের হাসির শব্দে সদাশিবের চমক ভাঙল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একটা লোক নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বয়স বেশী নয়, সদাশিবের চেয়ে কিছু বড় হবে। রোগা হাড়-বের-করা মুখ, মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ আছে, মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জট পাকানো; চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সদাশিব তার পানে চোখ ফেরাতেই সে বড় বড় দাঁত বের করে বলল, 'আমার নাম সহস্রবুদ্ধি।'

সদাশিব বলল, 'তাই নাকি! তোমার তো অনেক বুদ্ধি। এই গ্রামে থাকো বুঝি?'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'হ্যাঁ। গাঁয়ের লোক আমাকে পাগলা বলে, আমি কিন্তু পাগলা নই। আমার ভীষণ বুদ্ধি, আমি স-ব জানি।'

সদাশিবের বুঝতে বাকি রইল না যে সহস্রবুদ্ধির মাথায় কিছু নেই। সব গাঁয়েই একটা আধটা পাগলাটে ধরনের লোক থাকে, এ গাঁয়ের পাগলাটে লোক সহস্রবুদ্ধি। সদাশিব হেসে বলল, 'তবে তো তুমি আমার বন্ধু। এস, বোসো। আমার বুদ্ধি একটু কম, দ্যাখো না ঘোড়ায় চড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

সহস্রবুদ্ধি খুশী হয়ে সদাশিবের পাশে এসে বসল, বলল, 'তুমি তো সিপাহী। তোমার তলোয়ার আছে, ঘোড়া আছে। দুর্গে ঢুকতে দিল না বুঝি?'

সদাশিব বলল, 'না। তুমি জানলে কি করে?'

সহস্রবুদ্ধি মাথাটি ডাইনে বাঁয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি সব জানি। দুর্গের কথা জানি, গাঁয়ের কথা জানি। গাঁয়ের বুড়ো মহাজন বাপুরাও বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।'

'তাই নাকি? কেন?'

'আবার বিয়ে করবে বলে। দুটো বৌ পুষতে খরচ বেশী, তাই পুরনো বৌকে মেরে নতুন বৌ বিয়ে করবে।'

'বাঃ! ভারি বুদ্ধি তো মহাজনের। তোমাদের গ্রামে দেখছি সবাই বুদ্ধিমান।'

'কিন্তু আমার মতন বুদ্ধি কারু নেই। আমি সহস্রবুদ্ধি।'

'তা বটে, তা বটে। আচ্ছা ভাই সহস্রবুদ্ধি, চাকন দুর্গের মালিক কে বল দেখি?'

'তা জান না? চাকন দুর্গের তিনজন মালিক। হাব্‌লাদার আছে, সর্‌-ই-নৌবৎ আছে, আর সব্‌নিস আছে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না, খালি কামড়া-কামড়ি করে।'

'তাই নাকি? কামড়া-কামড়ি করে তুমি জানলে কি করে? দুর্গে গিয়েছ নাকি?'

'না, দুর্গে কাউকে ঢুকতে দেয় না। গাঁয়ের মাতব্বরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে তাই শুনেছি। আমি সব জানি।'

সদাশিব আন্দাজে দুর্গের ব্যাপার বুঝে নিল। দুর্গের তিনজন মালিকের মধ্যে কেবল একজনের সঙ্গে শিবাজীর লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লেখালেখি চলছে, অন্য দু'জনে কিছু জানে না; কিন্তু তারা ফিরঙ্গজিকে সন্দেহ করে। এ অবস্থায় শিবাজীর চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু দিতেই হবে, যেমন করে হোক চিঠি পৌঁছে দিতেই হবে।

এদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। সহস্রবুদ্ধির মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, কেবল তার সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। সদাশিব বলল, 'ভাই সহস্রবুদ্ধি, তুমি ভারি বুদ্ধিমান, আমার জন্য একটা কাজ

করবে?'

গাঁয়ের সবাই তাকে পাগলা বলে খেপায়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু সদাশিব তার বুদ্ধির কদর বুঝেছে। সহস্রবুদ্ধি আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, 'তুমি যা বলবে তাই করব, আমি সব কাজ করতে পারি।'

সদাশিব বলল, 'আমার বড় খিদে পেয়েছে। ঘোড়াটিও সারা দিন খায়নি। তুমি গাঁ থেকে জোয়ারের আটা আনতে পারবে? আর কয়লা? আমি পয়সা দেব।'

সহস্রবুদ্ধি লাফিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয় আনতে পারি। চিন্তামন মুদির দোকানে আছে। দাও পয়সা।'

সদাশিব তাকে কয়েকটা পয়সা দিয়ে বলল, 'আর শোনো, বেশী করে কয়লা এনো, ঘোড়ার জন্যেও ভাকড়ি তৈরি করতে হবে। তাছাড়া নুন চাই, জল চাই—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব আনব, তুমি কিছু ভেব না।' সহস্রবুদ্ধি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সদাশিব গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। গাঁয়ে দু'চারটে পিদিম জ্বলছে। দেবমন্দিরে ঠুং ঠুং করে ঘণ্টি বাজল। আর কিছুক্ষণ বাদেই গাঁয়ের লোক খেয়ে-দেয়ে পিদিম নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। সদাশিবের দুর্ভাবনা হতে লাগল। সহস্রবুদ্ধি যদি ফিরে না আসে! পাগল-ছাগল মনিষ্যি, যদি ভুলে গিয়ে থাকে? একরাত্রি না খেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু কয়লা যে নিতান্তই দরকার। কয়লা না পেলে—

ওই কে আসছে না! প্রকাণ্ড হাতীর মতন একটা জন্তু সদাশিবের দিকে এগিয়ে আসছে, হাঁস ফাঁস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না। সদাশিব তলোয়ারের মুঠে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর সে জোর গলায় হেসে উঠল। হাতী নয়, সহস্রবুদ্ধি আসছে। তার মাথায় প্রকাণ্ড ঝাঁকায় কাঠ-কয়লা, পিঠে জোয়ার-বাজরির বস্তা, কাঁধে জলের ঘড়া। একে একে সব বোঝা নামিয়ে নিয়ে সদাশিব বলল, 'তোমাকে আমি হাতী ভেবেছিলাম। তুমি কিন্তু আজ আমার সঙ্গে খাবে। কেমন?'

সহস্রবুদ্ধি এক গাল হেসে বলল, 'খাব। দাঁড়াও, নুন লঙ্কা আর চাটনি নিয়ে আসি। মুদির বৌ দেবে বলেছে।'

'আর, একটা মাটির গামলা এনো।'

'আচ্ছা।'

সহস্রবুদ্ধি ছুটে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই গামলা ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এল।

সদাশিব প্রথমে গামলায় জল ঢেলে ঘোড়াকে জল খাওয়ালো। তারপর আগুন জ্বালতে বসল। এক আঁজলা কয়লা মাটিতে রেখে

চকমকি ঠুকে আগুন ধরালো। কয়লার আগুনে ঘুটঘুটে অন্ধকার খানিকটা হালকা হল।

সদাশিব বলল, 'ভাই সহস্রবুদ্ধি, তুমি রুটি গড়তে জান?'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'বাঃ, তা আর জানি না!'

'তাহলে তুমি রুটি গড়ো, আমি ততক্ষণ একটা মজা করি।'

'কী মজা করবে?'

'দ্যাখোই না।'

সহস্রবুদ্ধি আটা মেখে রুটি গড়তে বসল, সদাশিব দু'হাতে কয়লা নিয়ে মাটির ওপর লম্বালম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখতে লাগল। একটা লম্বা রেখা, তার দু'দিকে দুটো ডাল বেরিয়েছে। সাজানো হয়ে গেলে সদাশিব তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে মাটির ওপর আগুনের একটি ত্রিশূল জ্বলতে লাগল।

সহস্রবুদ্ধি রুটি গড়তে গড়তে দেখছিল, বলল, 'অ্যাঁ, এ যে একটা ত্রিশূল!'

সদাশিব বলল, 'হ্যাঁ। আমি শিবভক্ত কিনা, তাই শিবের ত্রিশূল গড়েছি।'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'বাঃ, বেশ মজা তো!'

সদাশিব দুর্গের দিকে একবার তাকালো। প্রাকারের ওপর থেকে আগুনের ত্রিশূল নিশ্চয় দেখা যাবে। কেউ দেখবে কি? দেখলেও বুঝতে পারবে কি?

ক্রমে রাত্রি বাড়ছে। ঘোড়াটা ছটফট করছে। রুটি সেঁকা হলে সদাশিব প্রথমে ঘোড়াটিকে পেটভরে খাওয়ালো, তারপর সহস্রবুদ্ধিকে নিয়ে নিজে খেতে বসল। খাবার জিনিস শুধু মোটা মোটা রুটি, নুন, আর তেঁতুল দিয়ে কয়েৎবেলের চাটনি। তাই দু'জনে খুব তৃপ্তি করে খেল।

তারপর শোয়ার পালা। সদাশিব ঘোড়ার পিঠ থেকে কম্বল খুলে এনে মাটিতে পাতলো। সহস্রবুদ্ধি বলল, 'আমিও তাহলে আজ এখানেই শুই।'

সদাশিব একটু থমকে গিয়ে বলল, 'তা—শোও।'

দু'জনে পাশাপাশি শুলো। সদাশিব ভাবতে লাগল, রাত্রে যদি দুর্গ থেকে কেউ আসে, মুশকিল হবে। সহস্রবুদ্ধি জানতে পাববে. হয়তো গ্রামে গল্প করবে। কী করা যায়? সহস্রবুদ্ধিকে সরানো দরকার।

শুয়ে শুয়ে কথা হতে লাগল। আব শ-ভরা তারার পানে চেয়ে চেয়ে সদাশিব বলল, 'ভাই সহস্রবুদ্ধি. তোমার ঘরে কে কে আছে?'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'খালি ঠাকুরমা বুড়ী আছে। সে মরে গেলে

আর কেউ থাকবে না।'

'তুমি রাত্রে ঘরে না গেলে তোমার ঠাকুরমা হয়তো ভাববে।'

'আইবুড়ীর ভাবনা-চিন্তে নেই। সন্ধ্যে হলেই আফিম খেয়ে ঘুমোয়।'

এদিকে সুবিধা হল না দেখে সদাশিব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বলল, 'সহস্রবুদ্ধি, তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'ভূত!' সহস্রবুদ্ধি উঠে বসল—'গাঁয়ের বুড়োরা ভূতের গল্প করে শুনেছি, কিন্তু আমি কখনো দেখিনি।'

সদাশিব বলল, 'যারা রাত্রে ঘরে শোয় তারা বড় একটা ভূত দেখতে পায় না। কিন্তু মাঠে শুলে প্রায়ই দেখা যায়।'

'সত্যি! তুমি দেখেছ নাকি?'

'কতবার দেখেছি। আমি সিপাহী, যুদ্ধের সময় মাঠে শুতে হয়। একবার গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি একটা ভূত হুমড়ি খেয়ে আমার মুখ দেখছে।'

'ওরে বাবা! তুমি তখন কি করলে?'

'কি আর করব, রামনাম করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ রামনাম করবার পর ভূতটা চলে গেল।'

সহস্রবুদ্ধি সদাশিবের কাছে একটু সরে বসল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর সহস্রবুদ্ধি বুকে সাহস এনে বলল, 'আমাদের গাঁয়ের আশেপাশে ভূত নেই। ভূত থাকলে আমি দেখতে পেতাম না?'

সদাশিব বলল, 'অপঘাত মৃত্যু হলে মানুষ ভূত হয়। তুমি বলছিলে বাপুরাও মহাজন বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। বৌ নিশ্চয় পেত্নী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

সহস্রবুদ্ধির এবার হি-হি-কম্প আরম্ভ হয়ে গেল। সে সদাশিবকে খামচে ধরে বলল, 'ওরে বাবা রে! আমি এখন কি করি! যাই, ঘরের মধ্যে আইবুড়ীর কাছে শুয়ে থাকি গিয়ে। কিন্তু একলা যাব কি করে?'

সদাশিব বলল, 'রামনাম জপ করতে করতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই। কাল সকালে আবার এস।'

সহস্রবুদ্ধি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, জোরসে রামনাম বলতে বলতে গাঁয়ের দিকে লম্বা দৌড় মারল।

সদাশিব তখন উঠে আগুনের ত্রিশূলে আরো খানিকটা কয়লা দিল, ত্রিশূল আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সদাশিব তখন ফিরে এসে শুলো। আকাশের তারাগুলি আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে...সহস্রবুদ্ধি নিশ্চয় তার আইবুড়ীর কাছে গিয়ে শুয়েছে...ভূত কি সত্যি আছে? সদাশিব কখনো ভুত দেখেনি, তবে গল্প শুনেছে অনেক...

সদাশিব ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বলা যায় না, স্বপ্ন দেখল একটা ভূত হুমড়ি খেয়ে তার মুখ দেখছে—

সদাশিব চোখ চেয়ে বলল, 'কে তুমি?'

আগুনের ত্রিশূল ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অন্ধকারে কেবল একটা মাথা দেখা যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে নিঃশ্বাসের শব্দ। মাথাটা সদাশিবের মুখের সামনে থেকে সরে গেল, চাপা গলায় আওয়াজ হল, 'আমি জুন্নরগড়ের লোক।'

সদাশিব উঠে বলল, 'ফিরঙ্গজি নরসালা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। আমি শিবাজীর দূত। কি করে তুমি জানলে আমি এসেছি? তোরণ-রক্ষীরা খবর দিয়েছিল?'

'না। ওরা কেবল বলেছিল একজন সিপাহী কাজের খোঁজে এসেছে। অমন দু'চারটে সিপাহী রোজই আসে, বর্ষার সময় দুর্গে কাজ চায়, তাই আমার সন্দেহ হয়নি। তারপর একপ্রহর রাত্রে প্রাকারে উঠেছিলাম, দেখলাম আগুনের ত্রিশূল জ্বলছে। তখন বুঝতে পারলাম, শিবের ত্রিশূল, মানে শিবাজী।'

সদাশিবের মন আনন্দে ভরে উঠল। ফন্দিটা খেটেছে তাহলে! সে জিগ্যেস করল, 'তুমি দুর্গ থেকে বেরুলে কি করে?'

'আমার ঘরের জানলা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে এসেছি। আমার ঘর দুর্গের অপর দিকে, প্রাকারের গায়ে, সেখান থেকে তোমার ত্রিশূল দেখা যায় না: দুর্গ-প্রাকারে উঠেছিলাম তাই দেখতে পেলাম। ..আমি দুর্গের সর্-ই-নৌবৎ, কিন্তু আমার দু'জন সহকারী আমাকে নজর-বন্দী করে রেখেছে। ওরা যদি জানতে পারে শিবাজীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে মেরে ফেলবে। এ দুর্গ ধর্মতঃ শিবাজীর, আমি শিবাজীকে দুর্গ ফিরিয়ে দিতে চাই, কিন্তু ওরা দেবে না। তাই চুপি চুপি সব কাজ করতে হচ্ছে।' এই পর্যন্ত বলে ফিরঙ্গজি থামল, তারপর বলল, 'যাক ওসব কথা, আমাকে এখনি ফিরতে হবে। শিবাজী কী খবর পাঠিয়েছেন?'

'চিঠি দিয়েছেন। এই নাও।'

কেউ কাউকে দেখতে পেল না, অন্ধকারে হাত ঠেকাঠেকি হল। ফিরঙ্গজি চিঠি নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি যাই। কাল কি তুমি এখানে থাকবে?'

সদাশিব বলল, 'শিবাজীর হুকুম নেই। কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ নেই। সদাশিব খাটো গলায় ডাকল—

'ফিরঙ্গজি!'

উত্তর এল না। ফিরঙ্গজি নিঃশব্দে চলে গেছে।

সদাশিব কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। যাক, শিবাজী যে কাজ দিয়েছিলেন সে-কাজ সারা হয়েছে। কাল সকালে সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের গ্রামের দিকে যাত্রা করতে পারবে।

২

ভোরবেলা ঢোল শিঙা কাঁসি বাঁশির আওয়াজে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল। তখনও সূর্য ওঠেনি, কিন্তু গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বাজনার আওয়াজ গাঁয়ের দিক থেকেই আসছে। সদাশিব চোখ রগড়ে উঠে বসল, দেখল সহস্রবুদ্ধি ছুটতে ছুটতে আসছে।

সহস্রবুদ্ধি এসে সদাশিবের পাশে বসে পড়ল, ব্যগ্রভাবে বলল, 'কাল রাত্রিতে ভূত এসেছিল?'

সদাশিব বলল, 'এসেছিল। গাঁয়ে এত বাজনা-বাদ্য কিসের?'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'ও কিছু নয়, বাপুরাও মহাজন বিয়ে করতে যাচ্ছে।—ভূত এসেছিল! তুমি কি করলে?'

'শিবের নাম বললাম, ভূত চলে গেল।'

'শিবের নাম! কিন্তু ভূত তাড়াতে হলে তো রামনাম করতে হয়।'

'শিবের নামেও ভূত পালায়, এমন কি মামদো ভূত পর্যন্ত।—মহাজন কোথায় বিয়ে করতে যাচ্ছে?'

'সে অনেক দূর। ডোঙ্গরপুর নামে একটা গ্রাম আছে সেইখানে।'

সদাশিব চমকে উঠল। ডোঙ্গরপুর! সেখানে কাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে বাপুরাও মহাজন! সে বলল, 'ডোঙ্গরপুরে কার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে?'

'তা কে জানে। বাপুরাও মহাজন ভারি চালাক, কাউকে কিছু বলে না।'

'হুঁ। কিন্তু কাছে-পিঠে এত গ্রাম থাকতে অত দূরে বিয়ে করতে যাচ্ছে কেন?'

'কাছে-পিঠের গ্রামে সবাই জানতে পেরেছে মহাজন বৌকে বিষ খাইয়েছে, কেউ ওকে মেয়ে দিতে চায় না।'

'ও—তাই।'

সদাশিব উঠে পড়ল। আর দেরি নয়, মহাজন কার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে ডোঙ্গরপুর যাচ্ছে জানা দরকার। ইতিমধ্যে বরযাত্রীর দল গ্রাম থেকে বেরিয়েছে; মাঝখানে বর চলেছে ঘোড়ায় চড়ে, আর

তার দু'পাশে পায়ে হেঁটে বরযাত্রীর দল। তারাই বাজনা বাজাচ্ছে। গ্রামের এলাকা পার হয়ে তারা উত্তর দিকে চলল। তাদের কাঁসি বাঁশি আর ঢোলের আওয়াজ দূরে চলে যেতে লাগল।

সদাশিব ঘোড়ার পিঠে কম্বল বাঁধল, কাল রাত্রের অবশিষ্ট খাবার সঙ্গে নিল, সহস্রবুদ্ধির পিঠে হাত রেখে বলল, 'ভাই সহস্রবুদ্ধি, এবার আমি যাই।'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'অনেক দূর। কিন্তু আবার আমি এই পথে ফিরে আসব। আবার দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

সদাশিব এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, তারপর উত্তর মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বরযাত্রীর দল বেশ খানিকটা এগিয়েছে, তাদের বাজনা-বাদ্যি থেমে এসেছে, এমন সময় সদাশিব পিছন থেকে তাদের কাছে হাজির হল। পাঁচ-ছয়জন বরযাত্রী, সবাই বয়স্থ লোক, দেখে মনে হয় ওরা মহাজনের খাতক। সদাশিবের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে তারা পাশে সরে দাঁড়াল। সদাশিব ঘোড়ার রাশ টেনে হেসে বলল, 'দাঁড়ালে কেন? চল না খানিক দূর একসঙ্গে যাই।'

বাপুরাও মহাজন বসে ছিল রোগা-পটকা একটা ঘোড়ার পিঠে; মর্কটের মতন চেহারা, মাথায় লাল পাগড়ী, কোমর থেকে মরচে-ধরা একটা তলোয়ার ঝুলছে। সে সন্দেহ-ভরা চোখে সদাশিবের পানে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সিপাহী, কাল রাত্রে গ্রামের বাইরে মাঠে ছিলে?'

সদাশিব বলল, 'হ্যাঁ। কাজের সন্ধানে এসেছিলাম। চাকন দুর্গে হল না, তাই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জুন্নরগড়ে যাচ্ছি। দেখি সেখানে যদি কাজ পাই?'

বরযাত্রীর দল আবার চলতে আরম্ভ করল, সদাশিবও তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলল। কিছুদূর চলবার পর সে মহাজনের দিকে মুচকি হেসে বলল, 'শেঠ, তোমার সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। ঠিক কিনা?'

মহাজন উত্তর দিল না, সন্দিগ্ধ চোখে সদাশিবের পানে চাইল। একজন বরযাত্রী বলল, 'সিপাহীকে বলতে দোষ কি? ও তো আর গাঁয়ের পাজি লোক নয় যে ভাংচি দেবে। হ্যাঁ সিপাহী, শেঠজির স্ত্রী মারা গেছে, তাই নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছে!'

সদাশিব বলল, 'বেশ বেশ। শেঠ দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ। কথায় বলে, অভাগার ঘোড়া মরে ভাগ্যবানের বৌ মরে। তা কোথায় বিয়ে?'

বরযাত্রী বলল, 'সে অনেক দূর। আজ সারাদিন কাটবে, কাল বিকেলে গিয়ে পেঁছুব। ডোঙ্গরপুর গ্রামের নাম শুনেছ?'

সদাশিব বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি। দু'একজন লোকের নামও জানি। বিঠ্ঠল পাটিল—'

বরযাত্রী হেসে বলল, 'ওই বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে।'

সদাশিব একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার মনের কোণে একটু আশঙ্কা ছিল, এখন আর সন্দেহ রইল না। বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ে মানেই কুঙ্কু, বিঠ্ঠল পাটিলের তো অন্য মেয়ে নেই। সদাশিব মহাজনের পানে তাকাল; এই বুড়ো মর্কটটা কুঙ্কুকে বিয়ে করতে চলেছে। হতভাগা নচ্ছার বুড়ো। একটা বৌকে খুন করে এবার কুঙ্কুকে বিয়ে করবে! সদাশিবের রক্ত গরম হয়ে উঠল, ইচ্ছে হল তলোয়ার বার করে বুড়োর মাথাটা কচাং করে কেটে নেয়।

কিন্তু না, মাথা গরম করলে চলবে না, ঠাণ্ডা ভাবে ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। রাস্তায় মারামারি কাটাকাটি শিবাজী পছন্দ করেন না; তাছাড়া ওরা ছ'জন, সদাশিব একা; ওদের সঙ্গেও লাঠি বল্লম তলোয়ার আছে। আর, কেবল কুঙ্কুকে বিয়ে করতে যাচ্ছে এই অপরাধে একটা লোককে মেরে ফেলা উচিত নয়।

সদাশিব ঠিক করল, সে বরযাত্রীদের আগে গিয়ে গ্রামে পেঁছুবে আর বিয়ে ভণ্ডুল করে দেবে। বিঠ্ঠল পাটিল নিশ্চয় টাকার লোভে বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সে যখন জানতে পারবে মহাজন একটা বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে—

মুখে হাসি এনে সদাশিব বলল, 'বাঃ বাঃ, বেশ। আচ্ছা শেঠ, আমি চললাম। তাড়াতাড়ি না গেলে বেলা থাকতে জুন্নরগড়ে পেঁছুতে পারব না।'

সদাশিব ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বরযাত্রীর দল পিছনে পড়ে রইল।

এক বছর আগে সদাশিব প্রথম গ্রাম থেকে বেরিয়ে পুণায় যাবার যে-রাস্তা ধরেছিল এ রাস্তা সে-রাস্তা নয়; সে-রাস্তা ছিল পাহাড় পর্বতে ভরা। সদাশিব সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল জমি, কিন্তু পূব দিকে নীচু পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। তার গ্রাম ওই দিকে। সে পূব দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

এদিকে গ্রীষ্মের বেলা বেড়ে চলেছে। সদাশিব যখন পাহাড়ের এলাকায় পেঁছুল তখন সূর্য মাথার ওপর। সামনে বাঁয়ে ডাইনে পাহাড়ের গায়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। এখানে জোরে ঘোড়া চালাবার উপায় নেই; আস্তে আস্তে এঁকে বেঁকে চলতে হয়, উঁচু

পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। সদাশিব চারদিকে চাইতে চাইতে সাবধানে ঘোড়া চালাল।

দূরে ওই পাহাড়ের চূড়াটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এক বছর আগে ওটা সে দেখেছিল; মাথার ওপরটা সমতল, দু'পাশে শিং-এর মতন উঁচু হয়ে আছে। সদাশিব সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে লাগল। সেই ছোট্ট উপত্যকায় নদীর পাশে প্রকাণ্ড জংলি জামগাছটা যদি একবার দেখতে পায় তাহলে গ্রামের পথ চিনে নিতে কষ্ট হবে না।

কোথাও মানুষ নেই, গ্রাম নেই, গরু ভেড়া নেই। একটা উপত্যকায় নেমে শুকনো ঝরণার কোলে একটু জল দেখে সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল। দু'জনে জল খেল, কালকের বাসি রুটি একটু ছিল, তাই ভাগ করে খেল। তারপর আবার চলল। ডোঙ্গরপুর গ্রাম কোথায় কতদূরে কিছুই পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

দুপুর পেরিয়ে সূর্য পশ্চিম দিকে একটু ঢলেছে, সদাশিব দেখতে পেল দু'টো পাহাড়ের খাঁজে সরু এক ফালি উপত্যকা, পাহাড়ী নদীর খাত তার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে, খাতের পাশে কয়েকটি কুঁড়েঘর। সদাশিব উল্লসিত হয়ে উঠল। যাক, এতক্ষণে একটা গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলেই ডোঙ্গরপুরের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

পাহাড়ের পিঠ থেকে সোজাসুজি নামা যায় না, তেরছাভাবে নামতে হয়। সদাশিবের ঘোড়া আঁকাবাঁকা ঢালু রাস্তা খুঁজে খুঁজে নামতে লাগল।

একটা গুহার মতন গর্তের সামনে খানিকটা নাবাল জায়গা। এই নাবাল জায়গা পার হয়ে আবার উতরাই আরম্ভ হয়েছে। সদাশিব গুহার সামনে দিয়ে ঘোড়া চালিয়েছে, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার হল।

গুহার ভিতর থেকে হঠাৎ হা রে রে রে বলে পাঁচটা লোক বেরিয়ে এল, হাতের বল্লম উঁচিয়ে সদাশিবের ঘোড়াকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন কড়া সুরে বলল 'ব্যস, খবরদার! এক পা এগিয়েছ কি মরবে।'

ঘোড়াটা আপনিই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সদাশিব চোখ গোল করে দেখল, পাঁচটা লোকের মুখ-ভরা দাড়িগোঁফ, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। বুঝতে বাকি রইল না এরা ডাকাত। এদের গায়ে মোগল সৈন্যদের পোশাক; কিন্তু পোশাকের জেল্লা নেই, ছেঁড়াফাড়া অবস্থা। সে-সময় সৈন্যদল থেকে পালিয়ে বজ্জাত সিপাহীরা ডাকাতি করে বেড়াত, অরক্ষিত গ্রাম লুটপাট করত; এরা বোধ হয় সেই রকম একটা ডাকাতের দল।

ডাকাতের হাতে ধরা পড়েও কিন্তু সদাশিবের ভয় হল না। সে

বুঝল আজ জীবন সংশয়; গায়ের জোরে সে পাঁচজনের সঙ্গে পারবে না, বুদ্ধির জোরে ওদের কাবু করতে হবে। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'একি! তোমরা কারা?'

একজন ডাকাত তার কোমর থেকে তলোয়ার কেড়ে নিল, দলের সর্দার ঘোড়ার রাশ ধরে বলল, 'ঘোড়া থেকে নামো।'

নিরুপায় হয়ে সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল। অমনি একজন ডাকাত ঘোড়ার রাশ খুলে তার পায়ে ছাঁদন-দড়ি বেঁধে দিল। তারপর সবাই মিলে সদাশিবকে গুহার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

গুহাটা বেশ বড়, আট দশজন লোক থাকতে পারে। মেঝে এবড়ো-খেবড়ো, ছাদ বেশী উঁচু নয়; পিছনের দেয়ালের ফাটল থেকে ঝির-ঝির করে জল ঝরে পড়ছে।

ডাকাতেরা সদাশিবকে মেঝেয় বসিয়ে চারদিকে ঘিরে বসল। সর্দার বাঙা রাঙা চোখ মেলে খানিকক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'তোমার বয়স বেশী নয়, কিন্তু তুমি দেখছি সিপাহী। কাদের দলের সিপাহী?'

সদাশিব বলল, 'আমি আগে বিজাপুরের দলে ছিলাম; এখন কোনো দলে নেই, দল খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা কাদের দল?'

একজন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'আমরা ডাকাতের দল।'

সদাশিব যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে বলে উঠল, 'অ্যাঁ! ডাকাতের দল! আমার কাছে কিন্তু কিছু নেই, দু'চারটে পয়সা আছে, তাই নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।'

সর্দার বলল, 'তোমার ঘোড়া আছে, অস্ত্র-শস্ত্র আছে; সেসব কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু তার দরকার নেই। তুমি আমাদের দলে যোগ দিতে পার। আমরা এখন পাঁচজন, ছ'জন হলে আমাদের জোর আরো বাড়বে।'

অন্য একজন বলল, 'আমরা দশজন ছিলাম, এখন পাঁচজনে দাঁড়িয়েছি। দলে নতুন লোক দরকার।'

সদাশিব বলল, 'আর পাঁচজন কোথায় গেল?'

সে বলল, 'কেউ ধরা পড়েছে, কেউ লুটপাট করতে গিয়ে মারা গেছে।'

তৃতীয় ডাকাত বলল, 'ডাকাতের জীবন আর সিপাহীর জীবনে কোনো তফাত নেই। আজ ফকির কাল রাজা। আমরাও মোগল সৈন্য-দলে ছিলাম—'

সদাশিব বলল, 'তোমরা মোগল সৈন্যদলে ছিলে! তবে ছেড়ে দিলে কেন?'

একজন হেসে বলল, 'ছেড়েছি কি আর সাধে; প্রাণের দায়ে

ছেড়েছি। জানোই তো, বড় বড় সৈন্যদলে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ছোরা-ছুরি চলে। আমরাও চালিয়েছিলাম, চারটে লোককে মেরেছিলাম। ব্যস, শাহজাদার কানে খবর উঠল, তিনি আমাদের কোতলের হুকুম দিলেন। তখন আর উপায় কি, দল ছেড়ে পালাতে হল। তারপর থেকে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি। মনের সুখে আছি আমরা। কারুর হুকুম মানি না, যা লুটপাট করি নিজেদের মধ্যে সমান ভাগ করে নিই।'

ডাকাতের সর্দার এতক্ষণ একদৃষ্টে সদাশিবের পানে তাকিয়ে ছিল, এখন বলল, 'আসবে আমাদের দলে? লুটের ভাগ পাবে।'

সদাশিব দেখল সোজাসুজি 'না' বললে ওরা হয়তো তাকে কেটেই ফেলবে। সে করুণ সুরে বলল, 'আমার তো খুবই লোভ হচ্ছে তোমাদের দলে যোগ দিই। কিন্তু আমি যে গ্রামে যাচ্ছি। আমার মা'র ভারি অসুখ, বোধ হয় বাঁচবে না। তাই মা'কে দেখতে যাচ্ছি। একবার দেখেই গ্রাম থেকে ফিরব। তখন তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। কেমন? তোমরা এখানেই থাকবে তো?'

ডাকাতেরা গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়; কিন্তু সর্দার ভারি হুঁশিয়ার লোক, তার লাল চোখ ধূর্তামিতে ভরা। সে বলল, 'তোমার বয়স কম হলেও বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু ও বুদ্ধিতে হবে না। আমাদের কথা না শুনলে আমরা তোমার ঘোড়া কেড়ে নিতে পারি, তোমাকে কেটে ফেলতেও পারি। কিন্তু তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমরা পাঁচজন, একটা ঘোড়া আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো। একটা শর্তে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। ঘোড়া অস্ত্র সব ফেরত পাবে।'

ক্ষীণস্বরে সদাশিব বলল, 'কী শর্ত?'

সর্দার বলল, 'আমরা কাল থেকে কিছু খাইনি। তোমাকে আমাদের খাবার যোগাড় করে দিতে হবে।'

'খাবার! কোথা থেকে?'

'ওই গ্রাম থেকে।' বলে সর্দার উপত্যকার দিকে আঙুল দেখাল।

সদাশিব অবাক হয়ে চেয়ে রইল, 'কিন্তু—কিন্তু—তোমরা তো ডাকাত। গ্রাম থেকে খাবার লুট করে আনো না কেন?'

সর্দার একটু হাসল, 'চেষ্টা কি করিনি? কিন্তু সুবিধে হল না। মাস খানেক আগে ওই গ্রামে ডাকাতি করেছিলাম; সেই থেকে ওরা সাবধান হয়েছে, কোদাল কুড়ুল নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, আমরা গেলেই কুপিয়ে মারবে। আমরা পাঁচজন, ওরা পঞ্চাশজন।'

'তাহলে—?'

সর্দার বলল, 'শোনো। তুমি হিন্দু, তার উপর মারাঠী। তুমি

যদি গ্রামে গিয়ে খাবার কিনতে চাও ওরা তোমাকে খাবার বিক্রি করবে। তোমার কাছে পয়সা আছে তো?'

সদাশিব কোমর থেকে এক মুঠি পয়সা বের করে বলল. 'এই আছে। আর কিছু নেই।' তার আঙরাখার তলায় সুতো দিয়ে বাঁধা সোনার আংটি ঝুলছে. সে-কথা আর ডাকাতদের বলল না।

সর্দার বলল. 'তুমি গ্রামে গিয়ে একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে এস।'

অন্য একজন ডাকাত বলল. 'হ্যাঁ. বেশ পুরুষ্টু নধর একটি পাঁঠা। কতদিন যে গোস্ত খাইনি, কেবল শুকনো ছোলা আর ভুট্টা চিবিয়েছি।'

সর্দার বলল, 'এখন তাও ফুরিয়ে গেছে।—তুমি যাও। চট্ করে পাঁঠা নিয়ে ফিরে এস। মনে থাকে যেন, তোমার ঘোড়া আর হাতিয়ার আমাদের কাছে জামিন রইল। যদি ফিরে না আসো—'

সদাশিব বলল, 'ফিরে আসব।'

সূর্য তখন পশ্চিম দিকের পাহাড়ের মাথায় বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। সদাশিব গুহা থেকে বেরিয়ে উপত্যকার দিকে নামতে আরম্ভ করল। ঘোড়াটা একবার নাকের মধ্যে শব্দ করল, কিন্তু তার পায়ে ছাঁদন-দড়ি বাঁধা, সে নড়ল না।

পাহাড় থেকে নেমে সদাশিব গ্রামের দিকে কিছুদূর এগিয়েছে, দেখল গ্রাম থেকে পিল্ পিল্ করে লোক বেরিয়ে আসছে। চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক, তাদের সকলের হাতে অস্ত্র—লাঠি সড়কি কুড়ুল কাস্তে। তারা সদাশিবকে দেখতে পেয়েছে, তাই ছুটে এসে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছে।

সদাশিব যখন তাদের কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ কদম দূরে তখন একটা ষণ্ডা গোছের লোক মোটা গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও! কে তুমি? কী চাও?'

সদাশিব দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত তুলে বলল, 'ভয় নেই, আমি নিরস্ত্র; আমি হিন্দু মারাঠী। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ষণ্ডা লোকটা বলল, 'আগে বলো তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?'

সদাশিব বলল, 'আমার নাম সদাশিব। আমি চাকন দুর্গ থেকে ডোঙ্গরপুর যাচ্ছিলাম, এখানে পাহাড়ের ওপর মোগল ডাকাতেরা আমার ঘোড়া কেড়ে নিয়েছে, অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।'

ষণ্ডা লোকটা তখন বলল, 'আচ্ছা, তুমি কাছে আসতে পার।'

সদাশিব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, গ্রামবাসীরা সবাই তাকে ঘিরে ধরল। উত্তেজিত ভাবে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ষণ্ডা চেহারার লোকটি গ্রামের কামার, তার নাম মারুতি। সে বোধ হয় গাঁয়ের একজন মোড়ল; সে সকলকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে বলল,

'তোমরা সব চুপ কর। যা জিগ্যেস করবার আমি জিগ্যেস করছি।—তুমি হিন্দু। ডাকাতগুলো তোমাকে ছেড়ে দিল যে বড়?'

সদাশিব তখন সরলভাবে সব কথা বলল। শুনে মারুতি বলল, 'ওরা মাত্র পাঁচজন! একমাস আগে যখন হঠাৎ আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেছিল তখন আরো বেশী ছিল। আগড় থেকে গরু ছাগল চুরি করেছিল, মহাজনের গদি লুট করেছিল। তারপর থেকে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমরাও হুঁশিয়ার আছি, ফের যদি আসে কচুকাটা করব।'

সদাশিব বলল, 'ওরাও হুঁশিয়ার হয়েছে; সহজে আসবে না। কিন্তু পেটের জ্বালায় মরছে। তাই আমাকে পাঠিয়েছে।'

মারুতি বলল, 'হুঁ। আচ্ছা, আমরা যদি গাঁয়ের লোক একজোট হয়ে ওদের গুহায় আক্রমণ করি তাহলে কেমন হয়?'

সদাশিব বলল, 'ওরা মোটে পাঁচজন, তোমরা গাঁসুদ্ধ লোক আসছ দেখলে ওরা গুহা ছেড়ে পালিয়ে যাবে, ওদের মারতে পারবে না।'

মারুতি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু মারা দরকার। কতদিন আমরা ওদের ভয়ে রাত জেগে পাহারা দেব? এখন তাড়িয়ে দিলে দু'দিন পরে ফিরে আসবে, নয়তো অন্য গ্রামে গিয়ে উৎপাত করবে। দেশের শত্রু ওরা, একেবারে শেষ করে ফেলা দরকার।'

সদাশিব একটু ভেবে বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে—'

'কি বুদ্ধি? কি বুদ্ধি?'

'তোমাদের গাঁয়ে পোস্তর আঠা আছে?'

'পোস্তর আঠা, মানে আফিম? আছে বৈ কি। বুড়োরা সবাই আফিম খায়।'

'তাহলে এক কাজ কর। আমাকে একটা ছাগল দাও। ছাগলটাকে খানিকটা আফিম খাইয়ে দাও, আমি ছাগল নিয়ে ওদের কাছে ফিরে যাই। ওরা ক্ষিদেয় জ্বালায় পাগল হয়ে আছে, তক্ষুনি ছাগল কেটে খেয়ে ফেলবে। তারপর—'

মারুতি মহা উৎসাহে বলল, 'বুঝেছি। তোমার তো ভারি বুদ্ধি! এস আমার সঙ্গে, আগড় থেকে একটা ছাগল তোমাকে দেব। ওরে বেঙ্কট, দৌড়ে যা, তোর ঠাকুর্দার কাছ থেকে দু'রতি আফিম নিয়ে আয়।' সকলে আগড়ের দিকে চলল।

যেতে যেতে সদাশিব বলল, 'আর আমাকে দু'মুঠো ছোলা দিও। আমার খাবার সব ফুরিয়ে গেছে।'

দু'দণ্ড পরে সদাশিব ছাগলের দড়ি হাতে ধরে গ্রাম থেকে বেরুল। ছাগলটা লাফাতে লাফাতে চলেছে। আফিম খেলে প্রথমটা খুব উৎসাহ বেড়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে ঢুলুনি আসে।

ছাগলের দিকে তাকিয়ে সদাশিবের ভারি দুঃখ হল; আহা, বেচারা কিছুই জানে না, এখনি ডাকাতগুলো ওকে কেটে খেয়ে ফেলবে।

সদাশিব যখন ছাগল নিয়ে পাহাড়ের ওপর গুহার সামনে পোঁছুল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ডাকাতেরা হৈ হৈ করে ছুটে এল। একজন তলোয়ার বের করে কচ্ করে ছাগলটার গলা কেটে কোরবানি করে ফেলল। তারপর চারজন ডাকাত মিলে তার ছাল ছাড়াতে আরম্ভ করল; সর্দার দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল।

সদাশিব সর্দারের কাছে গিয়ে বিনীত সুরে বলল, 'সর্দার, তোমার কাজ তো করে দিয়েছি, এবার আমি যাই?'

সর্দার সদাশিবের কাঁধে হাত রেখে বাঁকা সুরে বলল, 'এখনি যাবি কোথায়? দেখছিস না রাত হয়ে আসছে? আজ রাত্তিরটা এখানেই থাক। কাল সকালে দেখা যাবে।'

সদাশিব বুঝল সর্দার তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। সে আর কিছু বলল না। সর্দার যদি তাকে ছেড়ে দিত তাহলে সে মারুতিদের গ্রামে গিয়ে রাত কাটাত, তারপর সকালবেলা নিজের গ্রামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু তা যখন হল না তখন সে গুহার মুখের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে রইল, আর ডাকাতদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগল।

অন্ধকার হয়ে আসছে। ডাকাতেরা কাঠ-কুটো এনে আগুন জ্বালল, পাঁঠার বড় বড় টুকরো বল্লমে গেঁথে আগুনে ঝলসাতে লাগল; কিন্তু এই সব কাজকর্মের মধ্যেও তারা সদাশিবের ওপর নজর রেখেছে, সে যে চুপি চুপি ঘোড়া নিয়ে পালাবে তার উপায় নেই।

সদাশিব শুকনো ছোলার দানা চিবোতে চিবোতে দেখতে লাগল। ডাকাতেরা মাংস পুড়িয়ে খেয়ে ফেলল; পাঁচজনে একটা আস্ত রাম-ছাগল সাবাড় করে দিল। তারপর তারা গুরুগম্ভীর ঢেকুর তুলে আগুনের পাশে জুয়া খেলতে বসল। কড়ি দিয়ে জুয়া খেলা। সদাশিব কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ শোনবার পর সে বুঝতে পারল, ওরা ঘোড়াটাকে বাজি রেখে জুয়া খেলছে। অর্থাৎ ঘোড়াটা এখন ওদেরই সম্পত্তি, কেবল পাঁচজনের মধ্যে কে ঘোড়া পাবে এই নিয়ে জুয়া খেলা হচ্ছে।

সদাশিবের প্রাণ তুকতুক করতে লাগল। ডাকাতেরা পাঁঠা খেয়েছে বটে, কিন্তু যদি ওষুধ না লাগে? অত বড় পাঁঠার পেটে দু'রতি আফিম, পাঁঠার রক্ত-মাংসে কতটুকুই বা মিশেছে! দৈত্যের মতন পাঁচটা ডাকাতের পেটে কতটুকুই বা গিয়েছে! যদি কাজ না হয়?

রাত বাড়ছে, চারিদিক অন্ধকার। ডাকাতের দল আগুনের পাশে বসে এক মনে জুয়া খেলছে। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথুরে মাটিতে পা ঠুকছে। দূরে একদল কোল্‌হা হুক্কাহুয়া করে ডেকে উঠল,

তারপর আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

ডাকাতের সর্দার দুই হাত মাথার ওপর তুলে বিরাট হাই তুলল জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমি জিতেছি, আমার ঘোড়া।'

অন্য ডাকাতেরাও হাই তুলল, তারপর যে যেখানে বসেছিল সবাই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সদাশিবের কথা বোধহয় তারা ভুলে গেছে।

খানিক বাদে পাঁচজন ডাকাতের একসঙ্গে নাক ডাকতে শুরু করল। ওরে ব্বাস্‌রে, সে কী নাক ডাকা! মনে হয় যেন পাঁচটা বাঘ একসঙ্গে গলার মধ্যে গর গর শব্দ করছে।

সদাশিব বুঝল আফিমের নেশা ধরেছে। তার ইচ্ছে হল এই সুযোগে ঘোড়া নিয়ে পালায়। কিন্তু পালাবে কি করে? চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। এ সময় ঘোড়া নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে গেলে পা ফস্‌কে খাদে পড়ে যাবে, হাত পা ভাঙা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব। সদাশিব চুপি চুপি উঠে গিয়ে গুহা থেকে নিজের অস্ত্রশস্ত্র গুলো নিয়ে এল। তৈরি থাকা ভাল। তারপর ঘোড়াটাকে এক মুঠো ছোলা খাইয়ে আবার এসে বসল।

আকাশের তারাগুলো আস্তে আস্তে পুব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। আগুন নিভে গেছে। ডাকাতদের নাক ডাকা ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

গুহার গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে সদাশিবের চোখ ধীরে ধীরে বুজে এল।

তারপর হঠাৎ যখন সে চোখ চাইল তখন পুবের আকাশে আলো ঝিলমিল করছে। ডাকাতদের নড়াচড়া নেই, তারা অজ্ঞান অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছে।

সদাশিব খাপ থেকে তলোয়ার খুলে পা টিপে টিপে ডাকাতদের কাছে গেল। ডাকাতেরা হাত পা ছড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে পড়ে আছে, যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মৃতদেহ। কেবল ভোঁস ভোঁস শব্দ করে নিশ্বাস ফেলছে। তাদের ঘুম সহজ ঘুম নয়, নেশার ঘুম, যদি ভাঙে তবে সেই দুপুরবেলা ভাঙবে।

সদাশিব তখন ঘোড়ার পায়ের বাঁধন খুলে লাগাম লাগাল, ঘোড়ার পিঠে কম্বল বেঁধে উঠে বসল। আর ভয় নেই। মস্ত বড় বিপদ কেটে গেছে। জয় ভবানী!

পাহাড় থেকে নেমে সদাশিব যখন গ্রামে পৌঁছুল তখন বেশ আলো ফুটেছে, সূর্য উঠব-উঠব করছে। মারুতি আর গাঁয়ের যত মরদ সদাশিবকে ঘিরে ধরল, 'কি খবর! কি খবর?'

সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'খবর ভাল। ডাকাতেরা ঘুমুচ্ছে, মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। যদি তাদের শেষ করতে চাও এই

সুযোগ।'

সকলে হৈ হৈ করে উঠল—'হর হর মহাদেও!' মারুতি বলল, 'কোথায়? দস্যুগুলো কোথায়?'

সদাশিব আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই পাহাড়ের গুহায়। গুহার মধ্যে ঝরণা আছে।'

'আর বলতে হবে না—ঝরণা-গুহা। ভাই সব, চল, আজ ডাকাতদের বংশ লোপ করব।' মারুতি আর দশ-বারোজন গ্রামবাসী কোদাল কুড়ুল কাটারি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাকি গ্রামের লোকেরা সদাশিবের আদর যত্ন করল; পেট ভরে খাওয়ালো, ঘোড়াকে খেতে দিল। সদাশিব তাদের জিগ্যেস করল, 'ডোঙ্গরপুর গ্রাম কোন্ দিকে তোমরা কেউ জানো?'

একজন আধবয়সী লোক বলল, 'জানি। তুমি কি ডোঙ্গরপুরে যাবে? অনেক দূর; ঘোড়ার পিঠে পৌঁছুতেও বেলা তিন প্রহর হবে।' এই বলে সে রাস্তা বাতলে দিল।

সদাশিব তখন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল।

ওদিকে ঝরণা-গুহার কাছে মারুতির দল তখন ডাকাতদের শেষ করেছে।

৩

সারা দিন আগুনের হলকার মতন রোদ্দুরের ভিতর দিয়ে উল্কার মতন সদাশিবের ঘোড়া ছুটে চলল। দিন থাকতে থাকতে ডোঙ্গরপুরে পৌঁছুতে হবে; আজ রাত্তিরে কুঙ্কুর বিয়ে, যেমন করে হোক বিয়ে বন্ধ করতে হবে।

তারপর বেলা দুই প্রহর কখন শেষ হয়ে গেছে। তিন প্রহরও ফুরিয়ে এল, এখনো গ্রামের দেখা নেই। একবার সদাশিব রাস্তা ভুল করে ফেলেছিল; ফিরে এসে ঠিক রাস্তা ধরতে হয়েছিল, তাইতে দেরি হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর তো পাকা সড়ক নেই, চিহ্ন দেখে দেখে চলতে হয়।

রোদ্দুরের রঙ হলদে হয়ে এসেছে এমন সময় সদাশিব দেখতে পেল—সামনে একটা শুকনো নদীর খাত। দেখেই সে চিনতে পারল, আরে, এই তো আমাদের গ্রামের নদী! ওই যে প্রকাণ্ড পিপুল গাছটা! সদাশিব ছেলেবেলায় কতবার খেলা করতে এসেছে এখানে। গ্রাম থেকে বেশী দূর নয়, মাত্র দু'কোশ!

সদাশিব নদীর খাতের পাশ দিয়ে উজানে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কিন্তু বেশী দূর তাকে যেতে হল না, খানিক দূর গিয়েই সে রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করালো। সামনে থেকে কাঁসি বাঁশি ঢোলের আওয়াজ আসছে। বরযাত্রীর দল! হতভাগারা এসে পড়েছে। ওই যে সামনে বাঁকের মাথায় বাপুরাও মহাজন ঘোড়ার পিঠে টিক টিক করে চলেছে। ওরা অবশ্য আস্তে আস্তে যাচ্ছে, কিন্তু দু'দণ্ডের মধ্যেই গ্রামে পৌঁছুবে।

সদাশিব দাঁড়িয়ে একটু ভাবল। বরযাত্রীদলের সঙ্গে আব্যর দেখা না হওয়াই ভাল। ওদের পাশ কাটিয়ে পনস বনের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে যাবে; একটু ঘুর হবে বটে, কিন্তু জোরে ঘোড়া চালালে ওরা পৌঁছুবার অনেক আগেই সে পৌঁছে যাবে।

বাঁ দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সদাশিব পনস বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গ্রাম এক বছর আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি আছে, একটুও বদলায়নি। প্রকাণ্ড মাঠের মতন অঙ্গন ঘিরে ছোট ছোট কুটিরগুলি। অঙ্গনের মাঝখানে বটগাছ, তার পাশেই গ্রামের একমাত্র পাকা ঘর: মিরাসদারের রসদখানা। এই পাকা ঘরে মিরাসদারের প্রাপ্য শস্য জমা থাকে; ক্ষেত থেকে শস্য উঠলে মিরাসদারের লোক এসে নিয়ে যায়। মিরাসদার হল স্থানীয় জমিদার, সে নিজের এলাকার প্রত্যেক গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে, আর রাজার হালে থাকে। অনেক বছর পরে শিবাজী এই সব রক্তচোষা জমিদারদের উচ্ছেদ করেছিলেন।

সদাশিবের ঘোড়া অঙ্গন পার হয়ে বিঠ্‌ঠল পাটিলের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল। দোরের দু'পাশে কলার থাম, মাথার ওপর আম-পাতার মালা ঝুলছে। কিন্তু লোকজন বাজনা-বাদ্য কিছু নেই।

সদাশিব ডাকল, 'বিঠ্‌ঠল রাও! ও বিঠ্‌ঠল পাটিল!'

দোর খুলে বিঠ্‌ঠল পাটিল বেরিয়ে এল, সদাশিবকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিপাহীর সাজ-পোশাক পরা ঘোড়সওয়ারকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেনি, তারপর চিনতে পেরে তার চোখ আগুনের মতন জ্বলে উঠল। সে সদাশিবের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে চীৎ-কার করে বলল, 'কে রে তুই? সদাশিব না? তুই আবার গ্রামে এসেছিস?'

পাটিলের চীৎকার শুনে গাঁয়ের লোকেরা যে-যার ঘর থেকে বেরিয়ে সেইদিকে ছুটে আসতে লাগল। পাটিলের পিছনে দোরের আড়াল থেকে কুঙ্কুর শঙ্কিত মুখ সদাশিব একবার দেখতে পেল। সে ব্যগ্র হয়ে বলল, 'বিঠ্‌ঠল রাও, আগে আমার কথা শোনো।'

বিঠ্‌ঠল পাটিল আরো চীৎকার করে বলল, 'তোর কথা শুনব কেন রে হতভাগা ঘোড়াচোর! সিপাহী সেজে আমাকে কথা শোনাতে

এসেছিস?'

ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা সদাশিবের ঘোড়া ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, পাটিল তাদের বলল, 'দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো। চিনতে পারছ না? আমার ঘোড়া চুরি করে যে ছোঁড়া পালিয়েছিল সেই সদাশিব। আবার কার ঘোড়া চুরি করে এখানে ফিরে এসেছে।'

সদাশিব মরীয়া হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সদাশিব। কিন্তু আমার কথাটা একবার শোনো। চাকন গ্রামের বুড়ো মহাজন বাপুরাও-এর সঙ্গে তুমি কুঙ্কুর বিয়ে দিচ্ছ। বুড়োটা ভারি শয়তান, পুরনো বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে! ওর সঙ্গে যদি কুঙ্কুর বিয়ে দাও, কুঙ্কুকেও বিষ খাইয়ে মারবে।'

বিঠ্‌ঠল পাটিল ক্ষণকালের জন্য একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর বাবুদের মতন ফেটে পড়ল, 'তবে রে হতভাগা নচ্ছার! তুই আমার ঘোড়া চুরি করে পালিয়েছিলি, এখন আবার আমার মেয়ের বিয়েতে বাগড়া দিবি বলে ফিরে এসেছিস! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা।'

গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে সদাশিবের মামা সখারামও এসে দাঁড়িয়েছিল, পাটিল তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো সখারাম, তোমার ভাগনের কান্ড দ্যাখো। আমি বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি, তাই তোমাদের সহ্য হচ্ছে না।'

সখারাম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাকে কেন বলছ পাটিল! সদাশিব আমার ভাগনে বটে কিন্তু ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি ওকে শাস্তি দিতে চাও স্বচ্ছন্দে দিতে পার।' এই বলে সখারাম সেখান থেকে চলে গেল।

পাটিল বলল, 'দেবই তো শাস্তি। তোমরা ধরো ওকে সবাই। আজ রাত্তিরে রসদখানায় বন্ধ করে রাখব, কাল সকালে মিরাসদারের দরবারে নিয়ে যাব। চুরির শাস্তি হস্তচ্ছেদ। মিরাসদার ওর হাত কেটে নেবে। ধরো ধরো ওকে, নইলে এখনি পালাবে।'

সদাশিব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এ কী কান্ড! কোথায় সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটে এসেছে কুঙ্কুকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, আর কুঙ্কুর বাপ কিনা তার হাত কেটে নিতে চায়! হায় ভগবান, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

গাঁয়ের লোকেরা কেউ সদাশিবের ওপর খুশী ছিল না, তারা তাকে জোর করে ঘোড়া থেকে নামালো। সদাশিবের মুখ থেকে একটা কথাও বেরুল না। বিঠ্‌ঠল পাটিল বলল, 'ওর হাত শক্ত করে বাঁধ। আমি তালা নিয়ে আসছি।'

গ্রামবাসীরা গামছা দিয়ে সদাশিবের হাত বাঁধল। পাটিল নিজের

ঘর থেকে ইয়া বড় এক তালা নিয়ে এসে বলল, 'চল এবার রসদখানায়। আজ রাত্তিরে কুংকুর বিয়েটা হয়ে যাক, কাল সকালেই ছোঁড়াকে নিয়ে মিরাসদারের কাছে যাব।'

সকলে সদাশিবকে রসদখানার দিকে টেনে নিয়ে চলল। সদাশিব একটি কথাও বলল না। কী হবে কথা বলে? বিঠ্‌ঠল পাটিল যে রকম রেগে আছে, কোনো কথা শুনবে না। সদাশিব একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কুংকু দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাকুল চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

রসদখানার দরজা খুব মজবুত, তাতে বড় বড় দু'টো লোহার কড়া লাগানো। ঘরটা খালি পড়ে আছে, এ সময়ে শস্য কিছু নেই। সদাশিবকে ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে বিঠ্‌ঠল পাটিল দরজায় তালা লাগালো।

দরজায় সবেমাত্র তালা লাগিয়ে বিঠ্‌ঠল পাটিল প্রকাণ্ড চাবিটা তালার মধ্যে ঘুরিয়ে বের করতে যাবে এমন সময় দূরে প্যাঁ প্যাঁ বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল, তার সংগে ঢোল আর কাঁসি বাজছে।

'বর আসছে! বর আসছে!'—সবাই ছুটে চলে গেল। বিঠ্‌ঠল পাটিলও চলল। বর আসছে, তাকে খাতির করে গ্রামের বাইরে থেকে আনতে হবে। তারপর বিয়ে। সব কাজ পড়ে আছে। বিঠ্‌ঠল পাটিল হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। চাবিটা তালার মধ্যেই লাগানো রইল।

রসদখানার মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা তো নেই; কেবল একটি মাত্র দরজা, তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সদাশিব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মন স্থির করে নিল, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। সে বাঁধা হাতে দোরে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, 'দোর খুলে দাও। আমি শিবাজী মহারাজের সিপাহী, আমাকে বন্ধ করলে বিপদে পড়বে।'

দরজা কিন্তু খুলল না, দরজার ওপার থেকে সাড়া শব্দও এল না। সদাশিব বাজনা বাদ্যির আওয়াজ শুনতে পায়নি; সবাই যে চলে গেছে তাও জানতে পারেনি। সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দাঁত দিয়ে হাতের বন্ধন খুলে ফেলল। মেঝেয় বসে ভাবতে লাগল—এবার কি করা যায়! আমি এখানে সারারাত বন্ধ থাকব, আর ওই বৌ খেকো বুড়োটা কুংকুকে বিয়ে করবে! না না, কিছুতেই না—

সদাশিব আর বসে থাকতে পারল না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে বাতাসের চলাচল নেই, তার সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার ওপর কুংকুর ভাবনা। কী করবে সে এখন? বন্ধ ঘরে হাওয়া যদি ফুরিয়ে যায়?

খুট খুট খুট। সদাশিব চমকে উঠল। কে যেন খুব সন্তর্পণে তালা খুলছে। সে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা আস্তে আস্তে একটু ফাঁক হল—

বাইরে তখন দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আবছায়া আলোতে সদাশিব দেখল কুঙ্কু দাঁড়িয়ে আছে।

কুঙ্কু!

সদাশিব ছুটে বেরিয়ে এসে কুঙ্কুর হাত ধরল। কুঙ্কু দেখতে ঠিক তেমনি আছে, একটুও বদলায়নি, কিন্তু তার কাপড়-চোপড় এলোমেলো, চুল উস্কখুস্ক। সে চাপা গলায় বলল, 'শীগ্‌গির শীগ্‌গির। কথা বলবার সময় নেই। তোমার ঘোড়া এনেছি, শীগ্‌গির ওর পিঠে উঠে বসো।'

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘোড়াটা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিব বলল, 'কুঙ্কু, তোর বাবা একটা বুড়োর সঙ্গে—'

কুঙ্কু বলল, 'কথা বলবার সময় নেই, আগে ঘোড়ার পিঠে চড়ো।'

সদাশিব বলল, 'আর তুই ?'

কুঙ্কু বলল, 'আমিও চড়বো। তুমি আগে চড়ো।'

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে চেয়ে রইল, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুই—তুই আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবি ?'

কুঙ্কু বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু আর দেরি কোরো না। আমি কাউকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। বাবা জানতে পারলেই দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরুবে।'

সদাশিবের ইচ্ছে হল চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে অট্টহাসি হাসে। কিন্তু সে হাসল না, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে কুঙ্কুকে নিজের পিঠের কাছে তুলে বসালো।

ওদিকে গ্রামের অন্য প্রান্তে তখন প্যাঁ প্যাঁ বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; বাপুরাও মহাজন মাথায় টোপর পরে গ্রামে পৌঁছে গেছে।

সদাশিব বলল, 'কোন্ দিকে যাব ?'

কুঙ্কু বলল, 'নদীর খাত দিয়ে চল, তাহলে হঠাৎ কারু নজরে পড়বে না। তারপর রাত্তির হয়ে গেলে আর ভাবনা নেই।'

সদাশিব ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কুঙ্কু পিছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল।

নদীর শুকনো খাতের ভিতর নুড়ি বিছানো, তার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে ঘোড়া চলেছে। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছে, তারই ক্ষীণ আলোয় আশেপাশে একটু দেখা যায়। নদীর ধারের প্রকান্ড অশত্থ গাছটা পিছনে পড়ে রইল। আরো কোশ খানেক যাবার পর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল, ঘাড় তুলে নাক ঝাড়ার মতন আওয়াজ করল।

সদাশিব বলল, 'বোধহয় কাছাকাছি কোথাও জল আছে। বেচারার তেষ্টা পেয়েছে।'

লাগামে একটু নাড়া দিতেই ঘোড়াটা পাশের দিকে চলল। পাড়ের কোলে নাবাল জায়গায় একটু জল জমেছিল, ঘোড়াটা গলা নীচু করে জল খেতে লাগল। সদাশিব ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, কুঙ্কুকে নামালো। দু'জনে আঁজলা ভরে জল খেল। তারপর মাটির ওপর মুখোমুখি বসল। ঘোড়াটা একটু জিরিয়ে নিক, তারপর আবার চলবে। তারার আলোয় দু'জনে দু'জনকে অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছে।

সদাশিব বলল, 'কুঙ্কু, বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে রে। জল খেলে কি পেট ভরে? তোর ক্ষিধে পায়নি?'

কুঙ্কু বলল, 'পেয়েছে। সারাদিন যে কিছু খাইনি।'

সদাশিব বলল, 'ওহো, বিয়ের জন্য উপোস করেছিলি। বেচারি! এমন বিয়েটা ফস্‌কে গেল। তা দুঃখু করিসনি, পুণায় গিয়ে মা জিজাবাঈ এর হাতে তোকে সঁপে দেব তিনি দেখে শুনে তোর খুব ভাল বিয়ে দেবেন।'

কুঙ্কু চুপ করে রইল। রাত্রি হবার পর একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সদাশিব বলল 'আরে, একটা কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। জানিস, কয়েক মাস আগে আমি বিজাপুরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

কুঙ্কু বলল, 'আমার কথা মনে ছিল তাহলে।'

সদাশিব অবাক্ হয়ে বলল, 'মনে থাকবে না কেন?'

কুঙ্কু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল 'কি জিনিস এনেছিলে!'

'একটা সোনার আংটি। এই যে আমার কাছেই আছে। আংটিটা তোকে দেব বলেই তো গ্রামে এসেছিলাম।'

আঙরাখার ভেতর থেকে আংটি বের করে সদাশিব কুঙ্কুর হাতে দিল। কুঙ্কু আংটি আঙুলে পরল।

'আঙুলে ঠিক হয়েছে?'

'হয়েছে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। আবার ঘোড়াটা নাকের মধ্যে শব্দ করল। সদাশিব বলে উঠল, 'কুঙ্কু, গন্ধ পাচ্ছিস?'

কুঙ্কু বলল, 'পাচ্ছি। পাকা কাঁঠালের গন্ধ।'

নদীর পাড়ের ওপর বড় বড় গাছের বন, সেই দিক থেকে পাকা কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে এসেছে।

সদাশিব লাফিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয় কাছে পিঠে কাঁঠাল পেকেছে। চল চল খুঁজে বার করি। জয় ভবানী!'

দু'জনে পাড়ে উঠল, হাত ধরাধরি করে কাঁঠালের গন্ধ শুঁকতে

শুকতে বনের মধ্যে ঢুকল।

বেশী দূর যেতে হল না। একটি বেশ বড় পনস গাছ; তার গুঁড়িতে দুটি পুরুষ্টু কাঁঠাল ফলে আছে। ভর ভর গন্ধ।

দু'জনে মিলে একটা কাঁঠাল পাড়ল, তারপর ধরাধরি করে নিয়ে চলল। সদাশিব বলল, 'ভাগ্যিস শেয়ালে টের পায়নি, নইলে সব খেয়ে যেত।

নদীর খাতে নিয়ে গিয়ে দু'জনে কাঁঠাল ভাঙল। খাজা কাঁঠাল, বড় বড় কোয়া। দু'জনে পেট ভরে খেল; ঘোড়াকে ভূতুড়ি খেতে দিল। একটা কাঁঠাল খেয়ে তিনজনেরই পেট ভরে গেল।

তারপর সদাশিব উঠল। বলল, 'চল, আর এখানে নয়। গ্রাম থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই ভাল।'

কুঙ্কু বলল, 'চল। কিন্তু অন্য কাঁঠালটা সঙ্গে নিলে হত না?'

'ঠিক বলেছিস। কাল আবার খেতে হবে তো।'

দু'জনে গিয়ে অন্য কাঁঠালটা পেড়ে নিয়ে এল। এটা অত বড় নয়। পাগড়ীর কাপড়ে পুঁটুলির মত বেঁধে নিয়ে সদাশিব সেটাকে ঘোড়ার পিঠে থেকে ঝুলিয়ে দিল। তারপর দু'জনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। ঘোড়া আবার চলতে শুরু করল।

ঘোড়া অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছে, কুঙ্কু আর সদাশিব গল্প করছে। কত গল্প, গল্প আর ফুরোয় না। সদাশিব প্রথম গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে যা যা ঘটেছিল সব বলছে। শুনতে শুনতে কুঙ্কুর কখনো বুক দুরুদুরু করছে, কখনো মুখে হাসি ফুটছে। কুঙ্কু গ্রামের গল্প বলছে সামান্য কথা, কিন্তু সদাশিবের শুনতে খুব ভাল লাগছে।—

এইভাবে রাত কেটে গেল। দিনের আলোয় ওরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল; গ্রাম থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। এখানে আর ধরা পড়বার ভয় নেই। সদাশিব চারদিকের দৃশ্য ভাল করে দেখে রাস্তা ঠিক করে নিল; ঐ চূড়াটার পাশ দিয়ে উপত্যকা পেরিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে গেলে কাল দুপুরবেলা নাগাদ তারা চাকন দুর্গে পৌঁছুতে পারবে। শিবাজী হুকুম দিয়েছেন ফেরার সময় চাকন দুর্গ হয়ে আসতে; সঙ্গে যদিও কুঙ্কু আছে তবু হুকুম তামিল করতে হবে। প্রভুর আদেশ।

সে কুঙ্কুকে বলল, 'সকালবেলা যতক্ষণ রোদ চড়া না হয় ততক্ষণ চলব, দুপুরবেলা কোনো গুহা বা গাছতলায় আশ্রয় নেব; তারপর বিকেলবেলা আবার চলব, যতক্ষণ না অন্ধকার হয়ে যায়। কি বলিস?'

কুঙ্কু সায় দিল—'হ্যাঁ, সেই ভাল।'

ঘোড়া আবার চলল।

দুপুরবেলা পাহাড়ের একটা ঘোঁজের মধ্যে তারা একটা গুহা পেয়ে গেল। সেখানে কাঁঠাল খেয়ে সারা দুপুর খুব ঘুমোল। তারপর বিকেলবেলা রোদ্দুর কমলে আবার চলল।

সন্ধ্যে হল। আকাশে সরু এক ফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোতে কিছুক্ষণ চলবার পর তারা একটা উপত্যকায় পৌঁছুল। বড় কয়েকটা গাছ আছে; এখানেই রাত কাটাতে হবে।

ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তারা গাছে উঠল। গাছের ওপর কখনো জেগে, কখনো ঘুমিয়ে, কখনো ফিসফিস গল্প করে রাত কেটে গেল।

ভোরবেলা বেরিয়ে দুপুরের কিছু আগে তারা চাকন দুর্গের কাছে পৌঁছুল। সূর্যের আলোয় পাথরের দুর্গ ঝকঝক করছে, খোলা তোরণের সামনে প্রহরীরা বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের গ্রামে লোকজন কাজকর্ম করছে, হয়তো সহস্রবুদ্ধি আছে ওদের মধ্যে। সদাশিব একটি গাছের আড়ালে গিয়ে ঘোড়া দাঁড় করালো। কুঙকুকে বলল, 'কুঙকু, তুই এই গাছের পিছনে লুকিয়ে বসে থাক, আমি একবার দুর্গটা দেখে আসি। ভয় পাসনি, আমি যাব আর আসব।'

'আচ্ছা' বলে কুঙকু ঘোড়া থেকে নেমে গাছতলায় বসল। সদাশিব ঘোড়া চালাল।

দুর্গ তোরণে পাঁচজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেদিন যারা ছিল তারা নয়। সদাশিব তাদের সামনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে বলল, 'আমি কয়েকদিন আগে এসেছিলাম কাজের খোঁজে। তখন কিল্লাদারের সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা হবে কি?'

প্রহরীরা একসঙ্গে হেসে উঠল। তারপর শিবাজী বেরিয়ে এলেন দুর্গের ভিতর থেকে, হেসে বললেন, 'কি রে, তুই এরি মধ্যে ফিরে এলি!'

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে শিবাজীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'রাজা, তুমি এখানে!'

শিবাজী তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চাকন দুর্গ কাল রাত্রে দখল করেছি।'

'দখল করেছ! লড়াই হয়েছিল?'

'লড়াই দরকার হয়নি।'

'তবে কি করে দখল করলে রাজা?'

'খুব সহজে। তোর হাতে ফিরঙ্গজির নামে চিঠি দিয়েছিলাম; তুই ভারি চালাকি করে ফিরঙ্গজিকে চিঠি দিয়েছিলি। আগুনের ত্রিশূল! সব শুনেছি আমি ফিরঙ্গজির মুখে।' বলে শিবাজী সদাশিবের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

'তারপর?'

'চিঠিতে লেখা ছিল, ফিরঙ্গজি যেন রাত্তিরে ঘরের জানলা খুলে রাখে আর জানলা থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে রাখে। ফিরঙ্গজি তাই রেখেছিল। কাল দুপুর রাত্তিরে আমি পঞ্চাশজন মাওলা নিয়ে দড়ি বেয়ে একে একে ফিরঙ্গজির ঘরে ঢুকলাম। তারপর আর কি? ওরা যখন দেখল আমরা দুর্গে ঢুকে পড়েছি, তখন আর লড়াই করল না, আত্মসমর্পণ করল। এক ফোঁটা রক্তপাত হল না। দুর্গ দখল হয়ে গেল।'

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে চেয়ে রইল।

শিবাজী বললেন, 'এবার তোর খবর বল। গাঁয়ের পাটিল তোকে ধরেছিল?'

সদাশিব হেসে বলল, 'ধরেছিল। সে অনেক কথা।—রাজা, গ্রাম থেকে একটা জিনিস এনেছি, তুমি দেখবে?'

'কি জিনিস এনেছিস?'

'এক্ষুনি আনছি' বলে সদাশিব ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, অন্য হাতে কুঙ্কুর হাত ধরে শিবাজীর সামনে এসে দাঁড়াল।

শিবাজী অবাক্ হয়ে বললেন, 'একি রে! মেয়ে কোথায় পেলি?'

সদাশিব বলল, 'বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ে কুঙ্কু। ওর বাপ এক বুড়ো মহাজনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিচ্ছিল। তাই ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে।'

কুঙ্কু লজ্জায় চোখ নীচু করে রইল। শিবাজী হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তুই কী রে! আগের বারে পাটিলের ঘোড়া চুরি করে পালিয়েছিলি, এবার তার মেয়ে চুরি করে আনলি! এখন কী করবি ওকে নিয়ে। ও তো আর ঘোড়া নয় যে ঘোড়াশালে বেঁধে রাখবি!'

সদাশিব বলল, 'কুঙ্কুকে জিজা-মা'র কাছে রেখে দেব।'

শিবাজী বললেন, 'সে কথা মন্দ নয়।—মা'র কথায় মনে পড়ল, মা পুণায় এসেছেন। তুই তাহলে আর এখানে থেকে কি করবি, কুঙ্কুকে নিয়ে পুণায় চলে যা। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়, সন্ধ্যের আগেই পুণা পৌঁছে যাবি। আমি এখানকার সব ব্যবস্থা করে কাল ফিরব।'

সদাশিব বলল, 'এখানে যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না?'

শিবাজী হেসে বললেন, 'ভয় নেই, তোকে ছেড়ে আমি যুদ্ধে যাব না। এ বছর বর্ষার আগে আর যুদ্ধ হবে না। আয়, তোরা ভেতরে আয়।'

ওদের দুর্গের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শিবাজী একটি লোককে কাছে ডাকলেন, সদাশিবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'একে চিনতে পারো?'

লোকটির মজবুত চেহারা, গালে গালপাট্টা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। সে সদাশিবের পানে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'চিনি না।'

শিবাজী সদাশিবকে বললেন, 'তুই ওকে চিনতে পারিস?'

সদাশিব হেসে বলল, 'চেহারা দেখে চিনতে পারিনি, কিন্তু গলা শুনে চিনেছি—ফিরঙ্গজি নরসালা।'

শিবাজী বললেন, 'ফিরঙ্গজি, তুমি ওকে চিনতে পারলে না, ও সদাশিব—যে আগুনের ত্রিশূল জেবলেছিল।'

'অ্যাঁ!' ফিরঙ্গজি এসে সদাশিবকে জড়িয়ে ধরল—'এতটুকু ছেলে! সে-রাত্রে অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাইনি।'

সদাশিব বলল, 'আমিও পাইনি।'

শিবাজী বললেন, 'কিন্তু কাজ হয়ে গেছে।'

তারপর শিবাজী সদাশিবকে নিয়ে খেতে বসলেন। কুঙ্কুকে ফিরঙ্গজির স্ত্রী হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

সদাশিব খেতে খেতে শিবাজীকে নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলল। ডাকাতদের কথা শুনে শিবাজী বললেন, 'মহারাষ্ট্র দেশে অরাজকতা চলছে। সমস্ত দেশ নিজের কবলে না আনতে পারলে এ উৎপাত দূর হবে না।'

ফিরঙ্গজি বলল, 'সারা দেশ তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে, কবে তুমি রাজা হয়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।'

শিবাজী কিছুক্ষণ শূন্য পানে চেয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তার এখনো দেরি আছে ফিরঙ্গজি।'

দুপুর কেটে গেল। তখন সদাশিব একটা নতুন তাজা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, কুঙ্কুকে নিজের পিছনে বসালো। শিবাজী তাদের সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র সওয়ার দিলেন, তারা পুণা পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দুর্গের তোরণ দিয়ে বেরিয়ে সদাশিব দেখল সহস্রবুদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে, তার এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি। সে বলল, 'হি, হি, তুমি এসেছ আমি দেখেছি। তোমার সঙ্গে ও কে?'

সদাশিব বলল, 'ও আমার গ্রামের মেয়ে। তোমার গ্রামের খবর কি? মহাজন বিয়ে করেছে?'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'এখনো ফেরেনি। বৌ নিয়ে তবে তো ফিরবে।'

সদাশিব বলল, 'বৌ কোথায়? বৌ তো পালিয়েছে।'

'অ্যাঁ! কোথায় পালাল?'

'এই যে আমার সঙ্গে'—বলে সদাশিব হাসতে হাসতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সহস্রবুদ্ধি কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে

গ্রামের পানে ছুটল। এমন জবর খবর গ্রামের লোককে না দিয়ে কি থাকা যায়!

সেদিন সূর্যাস্তের সময় সদাশিব কুঙ্কুকে নিয়ে পুণায় পৌঁছল। মা জিজাবাঈ তখন মহলে ছিলেন, সদাশিবকে দেখে বললেন, 'এলি? চাকন দুর্গের খবর কিছু জানিস?'

সদাশিব বলল, 'জানি মা। আমি চাকন দুর্গ থেকেই আসছি। রাজা দুর্গ দখল করেছেন, এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি। কাল তিনি ফিরবেন।'

জিজাবাঈ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কুঙ্কুর দিকে চাইলেন। সদাশিব তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মা, গ্রাম থেকে তোমার জন্যে একটা চাকরানী এনেছি। ওর নাম কুঙ্কু, ওর কথা তোমাকে বলেছি। ভারি ভাল মেয়ে। ওর বাবা একটা বুড়ো মহাজনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিচ্ছিল। ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। ওকে তুমি নিজের কাছে রেখো মা; ও তোমার পা টিপে দেবে, পাকা চুল তুলবে, যা বলবে সব করবে।'

জিজাবাঈ কুঙ্কুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, তার মুখখানি ভাল করে দেখে বললেন, 'ভারি মিষ্টি মুখখানি। তুমি আমার কাছে থাকবে?'

কুঙ্কু ছলছল চোখে ঘাড় নেড়ে জানালে—'হ্যাঁ, থাকব।'

সদাশিব তখন আগ্রহভরে বলল, 'মা, ওর বিয়েটা তো ভেস্তে গেল, তা তুমি একটা দেখেশুনে ওর একটা ভাল বিয়ে দিও। যেন খু—ব ভাল বর হয়।'

জিজাবাঈ বললেন, 'তুই ভাবিসনি, খুব ভাল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব।' এই বলে তিনি ওদের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন।

সদাশিবের ঘোড়া-ঘোড়া কাণ্ড

সদাশিব কুঙকুকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং কুঙকুকে জিজাবাঈ-এর হাতে সঁপে দিয়েছিল, সে কাহিনী আগে বলেছি। সদাশিবের মাথায় বুদ্ধি ছিল অনেক, কিন্তু অহংকার এক ফোঁটা ছিল না: নিজের চেয়ে পরের কথাই সে বেশী ভাবত। তার নিজের যে কোনো যোগ্যতা আছে এ কথা তার মনেই আসত না। তাই শিবাজী থেকে আরম্ভ করে সবাই তাকে এত ভালবাসতেন।

ওদিকে শিবাজী চাকন দুর্গ দখল করেছেন বটে, কিন্তু সে কতটুকু? সারা মহারাষ্ট্র দেশে অসংখ্য দুর্গ আছে; প্রত্যেক দুর্গের মালিক স্বাধীনভাবে থাকেন। কেউ বা বিজাপুর রাজ্যের অধীনে থেকে দুর্গ রক্ষা করেন। শিবাজীর উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্র দেশে যত দুর্গ আছে সব নিজের দখলে এনে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করবেন; সমস্ত মারাঠা জাতি এক হবে, স্বাধীন হবে। বাইরের শত্রুর উপদ্রব থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু এ কাজ তো সোজা কাজ নয়, একদিনের কাজও নয়। শিবাজী কখনো ছল-চাতুরি দ্বারা, কখনো লড়াই করে একটির পর একটি দুর্গ

অধিকার করছেন। কিন্তু এখনো অনেক দুর্গ বাকি।

বলা বাহুল্য, সদাশিব সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। এতদিন সে একটু মনমরা হয়ে ছিল, কারণ তার গোঁফ ছিল না; যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে গিয়ে যদি গোঁফ না থাকে সে বড় লজ্জার কথা। কিন্তু এখন তার প্রাণে আর দুঃখ নেই, তার নাকের নীচে কুরকুরে এক জোড়া গোঁফ গজিয়েছে। কেউ আর তাকে ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা করে না, সে এখন জোয়ান মর্দ, জঙ্গী বাহাদুর।

কিন্তু সম্প্রতি মহারাষ্ট্র দেশে এক মহা দুর্যোগ উপস্থিত হয়েছে; ঘোড়ার মড়ক এসে দেশের প্রায় অর্ধেক ঘোড়া শেষ করে দিয়ে গেছে। অথচ ঘোড়া না হলে যুদ্ধ হয় না, পাহাড়ী দেশে এখান থেকে ওখানে যাওয়া যায় না। শিবাজী ভারি মুশকিলে পড়েছেন। তাঁর নিজের এবং অধীন সৈন্যদের মিলিয়ে আন্দাজ পাঁচ হাজার ঘোড়া ছিল, তার অধিকাংশ মড়কে মারা গেছে। এখন তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কী করে? ভরসা শুধু এই যে শত্রুদেরও ঘোড়া মরেছে; কেউ আর এগিয়ে এসে যুদ্ধ করতে পারছে না। সবাই প্রাণপণে ঘোড়া সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘোড়া কোথায়? বিদেশ থেকে যে-সব ঘোড়ার সওদাগর ঘোড়া বিক্রি করতে আসত তারা মড়কের ভয়ে আর আসে না।

সারা মহারাষ্ট্র দেশে কেবল একটি লোকের কাছে ঘোড়া আছে, তিনি হচ্ছেন চন্দ্রগড় দুর্গের অধিপতি বলবন্ত রাও। চন্দ্রগড় দুর্গ পুণা থেকে বেশী দূর নয়, ঘোড়ার পিঠে এক বেলার রাস্তা। কিন্তু পথ বড় দুর্গম, কৎরজ্ গিরিসঙ্কটের গোলকধাঁধার মধ্যে নিরালা দুর্গটি চুপচাপ বসে আছে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই বোধহয় চন্দ্রগড় দুর্গে ঘোড়া-মড়কের ছোঁয়াচ লাগেনি। বলবন্ত রাও-এর দু' হাজার ঘোড়া সব জ্যান্ত আছে।

বলবন্ত রাও-এর অনেক বয়স হয়েছে; লোকটি যেমন ধূর্ত তেমনি কৃপণ। তিনি দূর সম্পর্কে শিবাজীর মামা হন। শোনা যায়, ছ-সাত বছর আগে তিনি একবার ভগিনী জিজাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা করতে পুণায় এসেছিলেন। শিবাজীর তখন কিশোর বয়স, কিন্তু বলবন্ত রাও তাঁকে দেখেশুনে বুঝলেন, এ ছেলে সামান্য নয়; একদিন এ ছেলে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ নিজের কবলে আনবে। তিনি মধুর হেসে বললেন, 'বাবা শিব, তোমার কপালে রাজতিলক দেখতে পাচ্ছি। আশীর্বাদ করি তুমি দিগ্বিজয়ী হও।'

শিবাজী চুপ করে রইলেন। বলবন্ত রাও তখন তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বোন জিজার ছেলে, আমার পরমাত্মীয়। দেখো বাবা, তুমি যেন বড় হয়ে আমার দুর্গের পানে নজর দিও না।'

শিবাজী সবিনয়ে বললেন, 'না না, সে কী কথা!'

জিজাবাঈ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বলবন্ত রাও তাঁর পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'তাহলে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করো।'

শিবাজী নিরুপায় হয়ে মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করলেন যে তিনি কোনো দিন ছলে বলে কৌশলে চন্দ্রগড় দুর্গ দখল করবার চেষ্টা করবেন না। বলবন্ত রাও খুশী হয়ে নিজের দুর্গে ফিরে গেলেন।

এই তো গেল আগের কথা। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে বলবন্ত রাও নিজের দুর্গে দু' হাজার ঘোড়া নিয়ে বসে আছেন। তাঁর দুর্গে যত সৈন্য আছে ঘোড়া তার চারগুণ। বলবন্ত রাও মনের আনন্দে ঘোড়া বিক্রি করছেন; মড়কের পর তিনি ঘোড়ার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন —একটা ঘোড়ার দাম দশ আসরফি, ইচ্ছে হয় কেনো, না হয় কিনো না।

গরজ বড় বালাই। যাদের গরজ বেশী তারা দু-চারটে ঘোড়া কিনছে, কিন্তু এত দাম দিয়ে বেশী ঘোড়া কেনার ক্ষমতা ক'জনের আছে? শিবাজী একবার বলবন্ত রাও-এর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বলবন্ত রাও অটল। নিজের ভাগ্নের প্রতি তিনি তো আর পক্ষপাত দেখাতে পারেন না, লোকে বলবে কী! যে ঘোড়া কিনতে চায় তাকেই দশ আসরফি দিতে হবে, এক কানাকড়ি কম হবে না।

শিবাজী ভারি প্যাঁচে পড়ে গিয়েছেন। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করতে পারেন না। দুর্গটা ইচ্ছে করলেই তিনি জয় করতে পারেন, কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তাঁর চাই ঘোড়া। তিনি মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছেন, কী করে বলবন্ত রাও-এর ঘোড়াগুলো হস্তগত করা যায়, অথচ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ না হয়। বলবন্ত রাও কেবল নামেই শিবাজীর মামা, কাজের বেলা কেউ নয়। বুড়োকে জব্দ করতে না পারলে জীবনই বৃথা।

এই সব নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে শিবাজী একদিন বিকেলবেলা প্রাসাদের ছাদে উঠলেন। ছাদে কুঙ্কু আর জিজাবাঈ ছিলেন, কুঙ্কু জিজাবাঈ-এর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। শিবাজীকে দেখে জিজাবাঈ ভুরু তুলে চাইলেন—'কী রে?'

শিবাজী বললেন, 'কিছু নয় মা, ছাদে একটু বেড়াতে এলাম।'

জিজাবাঈ আর কিছু বললেন না; শিবাজী চিন্তিত মুখে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। ছাদের কিনারা থেকে পুণার ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, দূরে মুথা নদী দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে শিবাজীর দৃষ্টি নেই, তাঁর মন চিন্তায় মগ্ন।

ওদিকে জিজাবাঈ কুঙ্কুর সঙ্গে গল্প করছেন। দু-একটা কথা শিবাজীর কানে যাচ্ছে কিন্তু তাঁর মন অন্য দিকে; তিনি ভাবছেন কোন্ উপায়ে মামা বলবন্ত রাও-এর ঘোড়াগুলো হাত করা যায়।

ভাবতে ভাবতে তিনি এক সময় জিজাবাঈ-এর কয়েকটা কথা শুনতে পেলেন, শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজাবাঈ বলছেন,'.. সামনের পূর্ণিমা তিথিতে আমার ব্রত উদ্‌যাপন; ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের নেমন্তন্ন করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু পুণায় জ্ঞাতিগোষ্ঠী ক'জনই বা আছে ..'

শিবাজী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিঃশব্দে ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সিঁড়িব নিচে সদাশিব দাঁড়িয়ে ছিল, শিবাজী তাকে বললেন, 'দেখ্ তো, তানাজী কোথায়। তাকে ডেকে নিয়ে আয়, পরামর্শ আছে।'

শিবাজী গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন। ছোট ঘর, মেঝের ওপর জাজিম পাতা, কয়েকটা মোটা তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে। শিবাজী একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। চমৎকার বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে তানাজীকে নিয়ে সদাশিব এল। তখন তিনজনে মুখোমুখি বসে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। শিবাজী দু-চার কথায় তাঁর মতলব খুলে বললেন, 'আগামী পূর্ণিমার দিন মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন হবে। মায়েব ভারি দুঃখ জ্ঞাতিগোষ্ঠী পুণায় বেশী নেই; তা আমি ঠিক করেছি চন্দ্রগড় দুর্গে লোক পাঠিয়ে মামা বলবন্ত রাওকে নেমন্তন্ন করব, দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। তারা অন্তত তিন-চারশো লোক আসবে; ঘোড়ায় চড়ে আসবে। তার মানে তিন-চারশো ঘোড়া। বুঝেছ? ওরা দুপুরবেলা এসে পৌঁছুবে, সারা দিন খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা চলবে। সে-রাত্রে ওরা ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই রাত কাটাতে হবে। পরদিন সকালবেলা বলবন্ত রাও ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে।—কেমন?'

তানাজী মহানন্দে হাঁটু চাপড়ে বললেন, 'বাহবা। খাসা বুদ্ধি বার করেছ। যদি তিন-চারশো ঘোড়া পাওয়া যায় তাই বা মন্দ কী।—তা, কাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাচ্ছ?'

শিবাজী বললেন, 'সদাশিবকে। সঙ্গে পুরুতমশাই যাবেন।'

দুই

শিবাজী জিজাবাঈকে বললেন, 'মা, এবাব খুব ঘটা করে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হবে।'

মা খুশী হলেন, বললেন, 'বেশ তো, তুই যা করবি তাই হবে।'

শিবাজী বললেন, 'চন্দ্রগড় দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। হাজার

হোক বলবন্ত রাও তোমার দাদা। আমার মামা। তাঁকে এবং তাঁর দুর্গের লোকদের নেমন্তন্ন না করলে ভাল দেখায় না।'

জিজাবাঈ মনে মনে হাসলেন, বললেন 'তা ভাল। কিন্তু দাদার দুর্গের পানে যেন নজর দিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস।'

শিবাজী জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, সে কী কথা!'

দুপুর রাত্রে সদাশিব গোরুর গাড়িতে চড়ে যাত্রা করল। তার সঙ্গে বৃদ্ধ পুরোহিত রামদেও এবং এক বস্তা সুপুরি। কাউকে নেমন্তন্ন করার সময় তার হাতে সুপুরি দিতে হয়।

শুক্লা দশমীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ আছে। সদাশিব নিজেই গোরুর গাড়ি হাঁকিয়ে চলল। ঘোড়ায় না গিয়ে গোরুর গাড়িতে যাওয়ার কারণ, প্রথমত, সঙ্গে বৃদ্ধ রামদেও আছেন। মহারাষ্ট্র দেশে যদিও সকলেই ঘোড়ায় চড়তে জানে, তবু পুরোহিত মশায়ের বয়স হয়েছে। এতদূর রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে তাঁর কষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, মাত্র দু'জন লোকের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়; আজকাল চারিদিকে রাহাজানের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুবিধে পেলেই অসহায় পথিকের ঘোড়া কেড়ে নিচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশে ঘোড়া সবচেয়ে দুর্মূল্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা রাত সদাশিব উঁচুনীচু পাথুরে পথ দিয়ে গোরুর গাড়ি চালাল; রামদেও গাড়িতে শুয়ে নিদ্রা দিলেন। রাত্রি শেষ হবার আগেই চাঁদ অস্ত গেল। সদাশিব তখন গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলল।

তারা যখন চন্দ্রগড় দুর্গের সামনে উপস্থিত হল তখন বেলা প্রথম প্রহর পার হয়ে গেছে।

চন্দ্রগড় দুর্গটি খুব পুরনো, বোধ হয় তিন চার শো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। মস্ত বড় দুর্গ, বড় বড় পাথরের বিশ হাত উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা। বলবন্ত রাও দুর্গটিকে অটুট রেখেছেন, সর্বদা তার দেখাশোনা করেন, কোথাও প্রাকারের পাথর খসে গেলে তৎক্ষণাৎ মেরামত করান। তবু প্রাকারের পাথরের খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়েছে; প্রাচীনতার চিহ্ন দুর্গটির গায়ে ছাপ মারা রয়েছে। সদাশিব দেখেশুনে নিজের মনে মন্তব্য করল—'শিবাজীর পক্ষে এ দুর্গ দখল করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু রাজা যে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছেন—' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

দুর্গের তোরণ-দ্বার খোলা ছিল। সদাশিবের গোরুর গাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিন-চারজন লশকর বেরিয়ে এল, একজন জিগ্যেস করল, 'কী চাই?'

রামদেও গাড়ি থেকে নামলেন, সদাশিব সুপুরির বস্তা নিয়ে তাঁর

পাশে দাঁড়াল। রামদেও বললেন, 'আমরা পুণা থেকে আসছি। আমি শিবাজীর কুলপুরোহিত। কিল্লাদার বলবন্ত রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

শিবাজীর নাম এখন সকলেই জানে, লশকরদের চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। একজন বলল, 'একটু দাঁড়ান, রাওকে খবর দিচ্ছি।'

লশকর দুর্গের ভিতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

রামদেও এবং সদাশিবকে নিয়ে লশকরেরা দুর্গে প্রবেশ করল।

দুর্গের একটি চাতালের ওপর গদি পাতা, তার ওপর বলবন্ত রাও বসে আছেন। কয়েকজন অনুচর তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; একজন তালপাতার প্রকাণ্ড পাখা দিয়ে বাতাস করছে। বলবন্ত রাও-এর মুখখানি তাল-তোবড়া বেগুন-পোড়া গোছের; মাথার চুল কামানো। কিন্তু চোখ দুটি ভারি তীক্ষ্ম। তিনি সন্দেহ-ভরা চোখে রামদেও-এব পানে চাইলেন।

রামদেও হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন, তারপর সদা-শিবের ঝোলা থেকে পাঁচটি সুপুরি নিয়ে বলবন্ত রাও-এর সামনে রাখলেন, বললেন, 'আগামী পূর্ণিমা তিথিতে জিজাবাঈ-এর ব্রত উদ্‌যাপন হবে। আপনি তাঁর পরমাত্মীয়; তাই তিনি আপনাকে এবং আপনার দুর্গের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। পূর্ণিমার দিন আপনারা সকলে পুণায় গিয়ে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে অন্ন গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।'

বলবন্ত রাও-এর পাশে গদির ওপর তাঁর বাঁধা-পাগড়ী রাখা ছিল, তিনি সেটি মাথায় পরে নিয়ে সুপুরিগুলি তুলে নিলেন; মাথায় পাগড়ী না পরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিয়ম নয়। রামদেও-এর পানে একটু হেসে বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন।'

রামদেও গদির পাশে বসলেন। সদাশিব সুপুরির ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান, তাকে কেউ বসতে বলল না।

বলবন্ত রাও মুখে মেকি হাসি এবং চোখে সন্দেহ নিয়ে রাম-দেওকে নানা প্রশ্ন করলেন। প্রথমে কুশল প্রশ্ন, তারপর নানা কথা। কিসের ব্রত, কত দিনের ব্রত, অন্য কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছে, এই সব। রামদেও সরল ব্রাহ্মণ, ভিতরের কথা কিছু জানতেন না, তিনি সরল-ভাবে উত্তর দিলেন। শেষে বলবন্ত রাও বললেন, 'বেশ বেশ, শিবা মায়ের ব্রত উপলক্ষে খুব ঘটা করছে দেখছি।'

রামদেও বললেন, 'জানেন তো শিবাজী কী রকম মাতৃভক্ত ছেলে। মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনে সে ঘটা করবে না তো কে করবে!'

'তা বটে—তা বটে।' বলবন্ত রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম হয়েছে?'

রামদেও লম্বা ফিরিস্তি দিলেনঃ আম্বা মোর চালের ভাত, আমটি সম্বর কোশাম্বি, পুরণপুরী লাড্ডু পেঁড়া জিলিপি, দই দুধ-পাক দহি বড়া, আরো কত কী। বলবন্ত রাও কিপটে মানুষ, নিজের মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচজন ব্রাহ্মণ খাইয়েছিলেন, ফিরিস্তি শুনে তিনি প্রকাণ্ড হাঁ করলেন, 'এত খরচ করবে শিবাজী মায়ের ব্রত উদ্যাপনে! আমার দুর্গেই তো পাঁচশো জোয়ান আছে, সবাইকে এত খাওয়াবে?'

রামদেও হেসে বললেন, 'তা খাওয়াবে বৈকি। এ তো আর সামান্য ব্যাপার নয়, মায়ের ব্রত উদ্যাপন।'

ইতিমধ্যে দুর্গের অনেক লোক এসে চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল; ভোজের ফিরিস্তি শুনে তাদের জিভে জল এল। তারা সাধারণ সৈনিক, তাদের দৈনিক রসদ জোয়ারের রুটি আর ধনে পাতার চাটনি; এর বেশী তাদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। শিবাজী তাদের নেমন্তন্ন করেছেন এবং রকমারি অন্নব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন খাওয়াবেন জেনে তারা উল্লসিত হয়ে উঠল।

রামদেও বললেন, 'তাহলে আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করি?'

'করুন।' বলবন্ত রাও হাসিমুখে কথা বললেন বটে কিন্তু তাঁর মনটা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শিবাজী অবশ্য শপথ ভঙ্গ করবে না, কিন্তু তার মতলবটা কী? নিশ্চয় অন্য কোনো মতলব আছে। নইলে এত লোককে কেউ কখনো নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়!

রামদেও উঠলেন, চারদিকে ঘুরে ঘুরে সকলের হাতে সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন করলেন। দুর্গের ভিতরটা ছোটখাটো একটি শহরের মতন; রাস্তা আছে, বাজার আছে, পুকুর আছে। দুর্গের উত্তর দিকে ঘোড়াশালা,-তার পাশে গোশালা। রামদেও যেমন ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করছেন, সদাশিবও সুপুরির ঝোলা নিয়ে সঙ্গে আছে। সদাশিব বোকার মতন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন এমন দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। তার দিকে কারুর দৃষ্টি নেই, কিন্তু সে সবকিছু দেখে নিচ্ছে।

নিমন্ত্রণ সারা হতে বেলা দুপুর কেটে গেল। অপরাহ্ণে রামদেও বলবন্ত রাওকে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে আমি তাহলে বিদায় নিই। জিজাবাঈকে জানাব যে পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্নে আপনি সদলবলে পুণায় উপস্থিত হবেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।'

গোরুর গাড়ি চলে যাবার পর বলবন্ত রাও গদির ওপর বসে অনেকক্ষণ আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাজার হোক

তিনি শিবাজীর মামা, বাঁশের চেয়ে কি কঞ্চি দড় হয়? শিবাজীর মতলব তিনি বুঝে নিয়েছেন।

তিন

শুক্লা একাদশীর রাত্রি তিন প্রহরে, চাঁদ তখন অস্ত যাচ্ছে, সদাশিবের গোরুর গাড়ি পুণায় ফিরে এল। শিবাজী তাদের জন্যে রাত জেগে বসে ছিলেন, রামদেওকে বললেন, 'আপনি বুড়ো মানুষ, ক্লান্ত হয়েছেন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

তিনি চলে গেলেন। শিবাজী তখন সদাশিবকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন, প্রদীপের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'জয় ভবানী! লক্ষণ ভালই মনে হচ্ছে।—কিন্তু তুই দু-রাত্রি জেগে গোরুর গাড়ি চালিয়েছিস, যা, লম্বা এক-ঘুম ঘুমিয়ে নে। কাল থেকে ভোজের আয়োজন শুরু করতে হবে। মাঝে মাত্র তিনটি দিন বাকি।'

পরদিন সকাল থেকে কাজের ধুম পড়ে গেল। শিবাজী এবং তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুণায় যত গণ্যমান্য লোক আছেন সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। শিবাজীর প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহী পুণায় উপস্থিত আছে, তারাও খাবে; তাছাড়া চন্দ্রগড় দুর্গের পাঁচশো লোক। সব মিলিয়ে দশ হাজার আসবে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রকাণ্ড রসুইঘরে ভিয়েন বসে গেল। মা জিজাবাঈ-এর আনন্দের সীমা নেই, তিনি চারদিকে কাজকর্ম তদারক করে বেড়াচ্ছেন। কুঙ্কু সর্বদা তাঁর সঙ্গে আছে।

শিবাজীর মনে অন্য চিন্তাও রয়েছে। উৎসবের সময় শত্রুরা সুযোগ পায়; শিবাজীর শত্রুর অভাব নেই। তাই তিনি চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শিবাজীর বন্ধু যেসাজীর অধীনে কয়েক দল লশকর পুণার চারধারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তাছাড়া গুপ্তচরের দল চুপি চুপি সুলুকসন্ধান নিচ্ছে। শত্রু যে আচমকা আক্রমণ করবে তার উপায় নেই।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল, পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত। উদ্যোগ-আয়োজন সব শেষ হয়েছে, এখন অতিথিরা এলেই হয়। বিশেষত শিবাজীর মন পড়ে আছে চন্দ্রগড়ের অতিথিদের দিকে। তারা ঘোড়ায় চড়ে কখন আসবে!

বেলা প্রথম প্রহর পার হবার পর পুণার অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলেন। ন্যাড়া মাথায় বাঁধা-পাগড়ী-পরা ব্রাহ্মণ, কোমরে তলোয়ার-বাঁধা মারাঠা। সবাই সভামণ্ডপে গিয়ে বসলেন; আতর গোলাপ

মাখলেন। সভা গমগম করতে লাগল।

শিবাজী এবং তাঁর বন্ধুরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন, সকলের সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। শিবাজী সদাশিবকে ছাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যেদিক থেকে চন্দ্রগড়ের অতিথিরা আসবে সদাশিব সেইদিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের আসতে দেখলেই শিবাজীকে গিয়ে খবর দেবে। শিবাজীও একটু ফুরসত পেলে ছাদে গিয়ে দেখে আসছেন। কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের অতিথিদের এখনো দেখা নেই।

বেলা বাড়ছে। একদল ব্রাহ্মণ মহোদয় ভোজনে বসলেন। চর্ব্য-চুষ্য এত খেলেন যে নড়বার ক্ষমতা নেই, কোনো মতে আসন থেকে উঠে ঢেকুর তুলতে তুলতে দক্ষিণা নিয়ে প্রস্থান করলেন। তারপর অব্রাহ্মণের দল বসলেন। এ'রাও কম নন। প্রচণ্ড বেগে চর্ব্য-চুষ্য চলতে লাগল।

কিন্তু শিবাজীর মন ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বেলা দুপুর অতীত হয়ে গেছে, এখনো মামা আসে না কেন? সূর্যোদয়ের সময় ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে অনেক আগেই পৌঁছুনোর কথা। তবে কি মামা আসবে না? যদি না আসে তাহলে এত উদ্যোগ-আয়োজন সব মাটি।

আরো এক-ঘড়ি কেটে গেল। শিবাজী অতিথি-ভোজনের দেখা-শোনা করছেন আর মনে মনে ছটফট করছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন সদাশিব সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছে। দূর থেকে চোখা-চোখি হতেই সদাশিব দাঁড়িয়ে পড়ল। শিবাজী দেখলেন সদাশিবের চোখ গোল-গোল হয়ে আছে, মুখে হাসি নেই। তিনি ভুরু তুলে নীরবে প্রশ্ন করলেন, সদাশিব ঘাড় নেড়ে নীরবে উত্তর দিল; কিন্তু তার চোখ গোল হয়ে রইল, মুখে হাসি ফুটল না। শিবাজী তখন অতিথিদের এড়িয়ে তার কাছে গেলেন, খাটো গলায় বললেন, 'কী রে!'

সদাশিব চুপি চুপি বলল, 'ওরা আসছে, কিন্তু—'

'কিন্তু কী—?'

সদাশিব বলল, 'তুমি নিজের চোখে দেখবে এসো রাজা।'

শিবাজী সদাশিবের সঙ্গে ছাদে গেলেন। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে কংরজ্ ঘাটের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির। মামা বলবন্ত রাও দলবল নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে আসছেন বটে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে নয়। লম্বা এক সারি গোরুর গাড়ি আসছে, সবসুদ্ধ বোধ হয় একশোখানা গোরুর গাড়ি। তাইতে চেপে মামার দল নেমন্তন্ন খেতে আসছে।

শিবাজী হতাশ চোখে সদাশিবের পানে তাকালেন। সদাশিব বলল, 'রাজা, এখন উপায়?'

শিবাজী বললেন, 'উপায় কিছু নেই। সব ভেস্তে গেল!' তিনি ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সদাশিব একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। উঃ, কী সাংঘাতিক মামা! মতলব বুঝে নিয়েছে! কিন্তু—কোনো উপায় কি নেই? ঘোড়া যে আমাদের চাই! কোনো উপায় কি নেই?

প্রাসাদের সামনে গোরুর গাড়ির সারি এসে দাঁড়িয়েছে। শিবাজী মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম গাড়ি থেকে বলবন্ত রাও নামলেন; শিবাজী তাঁর পদবন্দনা করলেন। বলবন্ত রাও দাঁত ছিরকুটে হেসে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। উদ্যোগ-আয়োজন তো ভালই করেছ, অনেক লোক নেমন্তন্ন করেছ দেখছি!

শিবাজী বললেন, 'আজ্ঞে। আপনি সবাইকে এনেছেন তো?'

বলবন্ত রাও হাত উলটে বললেন, 'সবাইকে আনতে পারলাম কৈ। দুর্গ পাহারা দেবার জন্য একশো জোয়ানকে রেখে এসেছি।'

শিবাজী বললেন, 'দুর্গ পাহারার জন্যে এত লোক রেখে এলেন!'

বলবন্ত রাও বললেন, 'হেঁ হেঁ, তা রাখতে হয় বৈকি বাবাজী। তুমি না-হয় মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছ আমার দুর্গের পানে হাত বাড়াবে না, কিন্তু অন্য শত্রু তো আছে—হেঁ হেঁ হেঁ—'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শিবাজী হেসে বললেন, 'তা বটে।' তিনি মামাকে এবং তাঁর দলবলকে নিয়ে গিয়ে সভায় বসলেন; আদর আপ্যায়ন আতর গোলাপ চলতে লাগল। তারপর মামা অনুচরদের নিয়ে আহারে বসলেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং আরম্ভ হল। শিবাজীর মুখ দেখে কেউ ঘুণাক্ষরে তার মনের অবস্থা জানতে পারল না।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। চারদিকে হৈ হৈ চলেছে, কিন্তু সদাশিব সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে ভাবছে। কাজকর্মের দিকে তার মন নেই; আসল কাজই যখন হল না তখন আর বাজে কাজ করে লাভ কী।

চুপটি করে বসে ভাবতে ভাবতে সদাশিব একবার চিড়িক মেরে উঠল, যেন তার মাথার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সে শরীর শক্ত করে বসে রইল, তারপর পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল।

শিবাজীর সঙ্গে তার দেখা হল মহলের একটা নিরিবিলি অংশে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'রাজা, একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।'

শিবাজী চকিতে তার পানে চাইলেন, তারপর তার হাত ধরে আবার ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদ নির্জন। সদাশিব শিবাজীকে তার মতলবের কথা বলল। শুনে শিবাজীর দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করে উঠল। তিনি উত্তেজনা দমন করে বললেন, 'দুর্গে কিন্তু একশো রক্ষী আছে।'

সদাশিব বলল, 'রাজা, তুমি আমাকে বাছা বাছা পঞ্চাশটি মাওলা দাও, আমি পারব।'

শিবাজী সদাশিবের দুই কাঁধে হাত রেখে কম্পিত স্বরে বললেন, 'যদি পারিস সদাশিব, তাহলে—তাহলে কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

চার

সূর্যাস্ত হতে দেরি নেই। বলবন্ত রাও এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এমন খাওয়া খেয়েছেন যে, হাত-পা ঢিলে হয়ে গেছে, আজই গোরুর গাড়ি চড়ে দুর্গে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বলবন্ত রাও ঠিক করলেন আজ রাত্রিটা পুণায় বিশ্রাম করে কাল ভোরে দুর্গে ফিরে যাবেন।

ওদিকে মহলের পিছন দিকে চুপিচুপি যে ব্যাপার ঘটছিল তা কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। সদাশিব ঘোড়ায় চড়ে রসুইঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল, শিবাজী দুটি খাবার-ভরা ছালা ঘোড়ার পিঠের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। সদাশিব কদম চালে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল, যেন তার কোনই তাড়া নেই।

সদাশিব চলে যাবার পর আর একজন ঘোড়সওয়ার এল, শিবাজী তার ঘোড়ার পিঠেও দুটি খাবারের ছালা ঝুলিয়ে দিলেন, সে চলে গেল। তার পরে আর একজন এল। এইভাবে পঞ্চাশজন সওয়ার যখন খাবারের ছালা নিয়ে চলে গেল তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে।

শিবাজীর মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ যদি কৎরজ্ ঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকত তাহলে দেখতে পেত অশ্বারোহীরা একে একে সেই রাস্তা ধরেছে। তাদের গন্তব্য স্থান চন্দ্রগড় দুর্গ।

পূব দিকে পাহাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। তখন পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার 'জয় ভবানী' বলে এক সঙ্গে ঘোড়া চালাল। ঘোড়ার খুরের সমবেত খটাখট শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে লাগল।

দলের আগে আগে চলেছে সদাশিব। বয়স কম বটে, কিন্তু সে এই দলের নায়ক। যে কাজ তারা করতে চলেছে তাতে বিপদ আছে; সাহস এবং বুদ্ধি দরকার। সদাশিব কাজের কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে থেকে থেকে চমকে উঠছে শিবাজীর কথা—'কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

আশ্চর্য মানুষ শিবাজী। সত্যি কি মানুষ, না অন্তর্যামী দেবতা। নিজের মনের যে কথাটি সদাশিব নিজেই জানত না, তিনি কেমন করে জানলেন?

চন্দ্রগড় দুর্গ থেকে দুশো গজ দূরে একটা টিলার আড়ালে সদাশিবের দল এসে দাঁড়াল। চাঁদ তখন মাথার ওপর উঠেছে, জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝিমঝিম করছে। দুর্গ থেকে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুর্গটা নিষ্প্রাণ একটা স্তূপের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল, অন্য সকলেও নামল। সদাশিব কয়েকজনের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করল, তারপর হুকুম দিল, 'সব খাবারের ঝোলা দশটা ঘোড়ার পিঠে চাপাও।'

নিঃশব্দে কাজ হল; সদাশিব আর দশজন সওয়ার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, তারপর দুর্গ-তোরণের দিকে অগ্রসর হল; বাকি চল্লিশজন টিলার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

দুর্গের তোরণ-দ্বার বন্ধ। সদাশিবের দল তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব মুখ উঁচু করে হাঁক দিল, 'হো ফাটক্‌দার হো!'

কিছুক্ষণ পরে তোরণের ডগার ওপর থেকে কয়েকটি মুণ্ডু উঁকি মারল, একজন ভারী গলায় বলল, 'কে তোমরা?'

সদাশিব বলল, 'আমরা শিবাজীর লোক, পুণা থেকে আসছি।'

প্রশ্ন হল, 'কী চাও?'

সদাশিব বলল, 'বলবন্ত রাও পুণায় পৌঁছেছেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একশো জন পুণায় যায়নি, তাই শিবাজী তাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছেন। আমরা খাবার এনেছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তোরণ-শীর্ষ থেকে আবার প্রশ্ন হল, 'তোমরা ক'জন?'

'এগারোজন। ফাটক খুলে দাও।'

মুণ্ডুগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। তোরণরক্ষীরা বোধ হয় নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে। খানিক পরে আবার মুণ্ডুগুলি উঁকি মারল, আওয়াজ হল, 'তোরণ খোলবার হুকুম নেই। আমরা দড়ি ফেলছি, দড়িতে খাবার বেঁধে দাও।'

সদাশিব হেসে উঠল, 'এত ভয়! আচ্ছা, দড়ি ফেলো, খাবারের ছালা বেঁধে দিচ্ছি।'

কয়েকটি দড়ি তোরণের মাথা থেকে নেমে এল; সদাশিবের দল খাবারের ছালাগুলি দড়িতে বেঁধে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছালাগুলি দড়ির সাহায্যে দুর্গের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদাশিব বলল, 'আচ্ছা, তাহলে চললাম। তোমরা তো দুর্গে ঢুকতে দিলে না, পুণায় ফিরে যাই।'

ওপর থেকে সাড়াশব্দ এল না। সদাশিব তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল। দুর্গের রক্ষীরা শুনল অনেক দূরে গিয়ে খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল।

তারা জানতে পারল না যে সদাশিবের দল টিলার পিছনে গিয়ে বাকি চল্লিশজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

দলে ফিরে গিয়ে সদাশিব সকলকে নিজের কাছে ডাকল। সবাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সদাশিব তখন সকলকে আসল কথা বলল; কাকে কী করতে হবে, কী ভাবে কাজ করতে হবে, সব বুঝিয়ে দিল। চাঁদের আলোয় পঞ্চাশজন জোয়ানের চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠল। জয় ভবানী! এই তো জীবন।

তারপর আরম্ভ হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এখনো সময় হয়নি।

এক-ঘড়ি কেটে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, দুর্গ থেকে কোনো শব্দ আসছে না। কদাচিৎ নিশাচর পাখি মাথার ওপর দিয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করে উড়ে চলে যাচ্ছে। একবার একদল শেয়াল টিলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অনেকগুলো মানুষকে বসে থাকতে দেখে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করে ছুটে পালাল।

দু-ঘড়ি কেটে গেল। চাঁদ দুর্গের পরপারে ঢলে পড়ল; দুর্গের প্রকাণ্ড ছায়া সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর দুর্গের ছায়া যখন টিলার গায়ে এসে লাগল তখন সদাশিব উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করল। সবাই উঠে দাঁড়াল, ঘোড়ার পিঠ থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল, তলোয়ার আঁট করে বাঁধল। সদাশিব বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি, তোমরা একে একে আমার পিছনে এসো।'

একে একে তারা দুর্গের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল; কেবল ঘোড়াগুলো টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্গচ্ছায়ার অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না, প্রাকারের ওপর থেকে যদি কেউ এদিকে তাকায় কিছুই দেখতে পাবে না।

সদাশিব কিন্তু তোরণের দিকে গেল না। উল্টো দিকে চলল। সুপুরির বস্তা নিয়ে যেদিন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল সেদিন সে দুর্গের অন্দর-বাহির সব ভাল করে দেখে নিয়েছে, প্রাকারের গায়ে কোথায় কী আছে সে জানে।

দুর্গ-প্রাকারের গা ঘেঁষে তারা চলল। প্রাকার চাকার মতন গোল, বিশ-বাইশ হাত উঁচু। সদাশিব আগে আগে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দেখছে। এক জায়গায় এসে সে থামল।

পনরো-ষোলো হাত উঁচুতে প্রাকারের গায়ে গাছ গজিয়েছে। বেশী বড় নয়। কিন্তু পাথরের খাঁজে শিকড় গেড়ে শক্তভাবে প্রাকারকে আঁকড়ে আছে।

সদাশিবের ঠিক পিছনে যে লোকটি ছিল তার নাম গজানন। সদাশিব ফিসফিস করে তার সঙ্গে কথা বলল; গজানন নিজের কোমর

থেকে দড়ি খুলে সদাশিবকে দিল। সদাশিব দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল। দু-তিন বার ছোঁড়ার পর দড়ির আগা গাছের গায়ে আটকে গেল।

তখন ভবানীর নাম স্মরণ করে সদাশিব দড়ি ধরে ধরে ওপরে উঠে গেল। সে গাছের ওপর পোঁছতেই গজাননও দড়ি ধরে উঠে এল। প্রাকারের গায়ে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আর একবার চুপিচুপি পরামর্শ হল। এখান থেকে প্রাকারের মাথা বেশী দূর নয়, কিন্তু হাতের নাগালের বাইরে। গজানন লম্বা মানুষ, সে গাছের ডালে পা রেখে প্রাকারে ভর দিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব সাবধানে তার কাঁধে উঠল, উঁচু দিকে হাত বাড়াল; কিন্তু তবু প্রাকারের কিনারার নাগাল পেল না। আর একটু বাকি, আধ হাতেরও কম। সদাশিব তখন গজাননের মাথায় পা দিয়ে ডিঙি মেরে ওপর দিকে হাত বাড়াল। এবার প্রাকারের কিনারা তার নাগালের মধ্যে এসেছে।

দুই বাহুর বলে শরীরটাকে ওপর দিকে টেনে তুলে সদাশিব প্রাকারের ওপর উঠে বসল।

পাঁচ

প্রাকারের ওপরে বসে সদাশিব সন্তর্পণে চারিদিকে চাইল, কোথাও মানুষ নেই। কান খাড়া করে শুনল, আস্তাবলের দিক থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ আসছে। অন্য কোনো শব্দ নেই।

সদাশিব তখন নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করল; নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে নীচে ঝুলিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সদাশিবের অনুচরেরা একে একে দড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। দুর্গের কেউ জানতে পারল না।

পশ্চিম আকাশে চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে, চাঁদ অস্ত যেতে বেশী দেরি নেই। তবে একটা সুবিধা এই যে চাঁদ অস্ত যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হবে।

সদাশিব সঙ্গীদের বলল, 'এইবার আসল কাজ আরম্ভ। তোমরা এখানে বসে থাকো, আমি চট্ করে একবার দুর্গের হালচাল দেখে আসি।'

কোমর থেকে তলোয়ার বের করে সদাশিব হাতে নিল, তারপর ছায়ার মতন নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গীরা বসে রইল, নড়নচড়ন নেই। অস্তমান চাঁদের আবছায়া আলোয় তাদের দেখে বোঝা যায় না এতগুলো মানুষ পাশাপাশি বসে আছে, মনে হয় একসারি কলসী প্রাকারের আলসের ধারে সাজানো রয়েছে।

সে-রাত্রে দুর্গের লোকেরা যখন অনেক খাবার পেল তখন তাদের মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল; কী জানি শিবাজী যদি খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লোভ সামলাতে পারেনি। এত ভাল খাবার তারা অনেকদিন খায়নি। একটু একটু করে চাখতে চাখতে তারা শেষ বরাবর সমস্ত খাবার সাবাড় করে দিয়েছিল।

খাবারে অবশ্য বিষ-টিষ কিছু ছিল না। কিন্তু গুরুভোজন করলে শরীরে আলস্য আসে; ওরা পেট ভরে খেয়ে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে গাল-গল্প করেছিল, তারপর হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সদাশিব পরিদর্শন করে ফিরে এসে সঙ্গীদের বলল, 'সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ জেগে নেই। এখন কী করতে হবে শোনো।—বেশীর ভাগ লোক যে-যার কুঠুরিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে; আর দুর্গের মাঝখানে 'ওটা*'র ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে পঁচিশ-ত্রিশ জন। গজানন, তোমরা বিশজন ওটায় গিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকো, যদি কারুর ঘুম ভাঙে, দেখো যেন সে চীৎকার করতে না পারে।—টিকারাম, তুমি দশজন লোক নিয়ে যাও, কুঠুরিগুলোর বাইরে থেকে দোরের শিকল তুলে দাও, যারা ভেতরে আছে তারা যেন বেরুতে না পারে। আমি বাকি লোক নিয়ে যাচ্ছি দুর্গের তোরণ খুলে দিতে। হুঁশিয়ার, নিঃশব্দে কাজ হওয়া চাই।—সবাই তলোয়ার বার করো।'

তলোয়ার হাতে নিয়ে তিন দল তিন দিকে চলল। কারুর মুখে কথা নেই, কারুর পায়ে শব্দ নেই; যেন ছায়াবাজির খেলা।

সদাশিব তার দল নিয়ে তোরণে গিয়ে দেখল চারজন তোরণ-প্রহরী কপাটে ঠেস দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। তারা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিল; কিন্তু শিবাজীর দল পুণায় ফিরে গিয়েছে, অন্য কোনো শত্রুও কাছাকাছি নেই, সুতরাং জেগে থাকার কোনো মানে হয় না; তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মুহূর্তমধ্যে চারজন প্রহরীর মুখ এবং হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। তারা একটা কথাও বলতে পারল না, কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাদের এক পাশে শুইয়ে রেখে সদাশিবের দল দুর্গের কপাট খুলতে আরম্ভ করল। প্রকাণ্ড ভারী হুড়কো খুলে আস্তে আস্তে কপাট খুলতে হবে। বেশী শব্দ করা চলবে না, কপাট খোলার ঘড়ঘড় শব্দে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুলল। বেশী শব্দ হল না।

তবু, ওটায় যারা শুয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজনের ঘুম ভেঙে

---

* ওটা--উঠান

গিয়েছিল। সে চোখ রগড়ে উঠে বসল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে তলোয়ারের নখ বিঁধল, কানের কাছে শব্দ হল—'চুপ! কথা বলেছ কি মরেছ।' লোকটা কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

যন্ত্রের মতন কাজ হচ্ছে, শব্দহীন যন্ত্র। যারা কুঠুরিগুলো বন্ধ করতে গিয়েছিল তারা সমস্ত কুঠুরির দোরে শিকল তুলে দিয়েছে, ভিতরে যারা ছিল তারা জানতেও পারেনি। তাদের যখন ঘুম ভাঙবে, তারা যখন বাইরে আসতে চাইবে তখন দেখবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

তোরণ-দ্বার খুলে দিয়ে সদাশিব সেখানে পাঁচজন পাহারাদার দাঁড় করিয়ে বাকি লোকজন নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলল। এবার আসল কাজ, ঘোড়া পাচার করতে হবে।

ওদিক থেকে টিকারামের দল কাজ শেষ করে আস্তাবলে হাজির হয়েছে। কেবল গজাননের দল ওটার ওপর ঘুমন্ত লোকগুলোকে আগলে আছে।

প্রকান্ড ছাউনির মতন আস্তাবল। তাতে দু' হাজার ঘোড়া। ঘেরা জায়গায় ঘোড়াগুলো ছাড়া রয়েছে; কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ গলার মধ্যে মিহি সুরে চিঁহিঁহিঁ করল।

অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সদাশিব দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল, বাকি লোক প্রত্যেকে দুটো ঘোড়ার গলায় দড়ি পরিয়ে দুর্গের বাইরে রেখে ফিরে আসতে লাগল। এ কাজ অবশ্য নিঃশব্দে হয় না; ঘোড়ার খুরের শব্দ বন্ধ করা অসম্ভব। ওটায় যারা ঘুমোচ্ছিল তারা জেগে উঠল। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, তাদের ঘিরে খোলা তলোয়ার হাতে শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। যারা কুঠুরির মধ্যে বন্ধ হয়েছিল তারা দোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু বেরুবে কী করে?

দু' হাজার ঘোড়া চন্দ্রগড় দুর্গের বাইরে চালান দিয়ে সদাশিবের দল যখন দুর্গ থেকে বেরুল তখন পুবের আকাশ ফরসা হয়ে গেছে।

টিলার কাছে ফিরে গিয়ে তারা নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়ল, তারপর চোরাই ঘোড়াগুলোকে ঘিরে পুণার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সদাশিব বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে ভাবতে লাগল—শিবাজী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে; তাঁর শপথ ভঙ্গ হয়নি, এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি, অথচ কাজ হাসিল হয়েছে। জয় মা ভবানী! শিবাজী দু' হাজার ঘোড়া পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশী হবেন। আর কুঙ্কু—

কিছু দূর চলবার পর সূর্যোদয় হল। সদাশিব গজাননকে বলল

'মামা বলবন্ত রাও এতক্ষণে পুণা থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি এই পথেই ফিরবেন; তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয় নয়। এসো, আমরা অন্য রাস্তা ধরি—'

পুণায় যাবার সিধা রাস্তা ছেড়ে তারা বাঁ দিকে মোড় ঘুরল। এদিকে একটা সরু উপত্যকা আছে। সেদিক দিয়ে গেলে পুণায় পৌঁছুতে দেরি হবে বটে, কিন্তু মামার দলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। মামা সিধা পথেই দুর্গে ফিরবেন। তারপর তাঁর কী অবস্থা হবে তা না ভাবাই ভাল।

ছয়

পুণায় মহলের ছাদে উঠে শিবাজী একলা পায়চারি করছেন। তাঁর কপালে উদ্বেগের ভ্রূকুটি। দিন শেষ হয়ে এল, এখনো সদাশিবের দেখা নেই।

তানাজী এসে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিলেন। শিবাজীর মুখ দেখে বললেন, 'ভাবছ কেন? সদাশিব খলিফা ছেলে, সে কাজ ফতে না করে ফিরবে না।'

শিবাজী বললেন, 'তা তো জানি। আজ পর্যন্ত কোনো কাজে সে নিষ্ফল হয়নি। কিন্তু হাজার হোক ছেলেমানুষ তো—'

মা জিজাবাঈ ছাদে এলেন, সঙ্গে কুঙ্কু। জিজাবাঈ বললেন, 'কোথায় পাঠালি তুই ছেলেটাকে! বলেছিলি আজ বেলা দুপুরের আগেই ফিরবে। তা এখনো ফিরল না।'

শিবাজী বললেন, 'সূর্যাস্তের আগে যদি সদাশিব না ফেরে, আমাকে দলবল নিয়ে বেরুতে হবে।'

কৎরজ্ ঘাটের দিকে কারুর নজর ছিল না; এই সময় কুঙ্কু আঙুল তুলে সেই দিকে দেখাল। সে সকলের আগে দেখতে পেয়েছে।

সকলে একসঙ্গে সেই দিকে ফিরলেন। দেখলেন কৎরজ্ ঘাটের সঙ্কীর্ণ ঢালু সংকটপথে পিলপিল করে ঘোড়ার পাল নেমে আসছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একপাল ভেড়া।

তানাজী নাচতে শুরু করে দিলেন—'দু' হাজার ঘোড়া! দু' হাজার ঘোড়া! জয় ভবানী।'

শিবাজী দু' হাত তুলে লাফিয়ে উঠলেন—'পেরেছে—সদাশিব পেরেছে। মা, তোমার কোলের ছেলেটা সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।'

তানাজীর হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে শিবাজী ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মা, কুঙ্কুর জন্যে আমি পাত্র ঠিক করেছি। ওকে জিগ্যেস করো সদাশিবকে ওর পছন্দ কিনা।'

এই বলে একটু হেসে শিবাজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

ভূমিকম্পের পটভূমি

শহরসুদ্ধ লোক তাঁকে রণদা-মামা বলে ডাকত, কেবল আমরা ছেলে-ছোকরার দল আড়ালে তাঁকে বলতাম—রণ-দামামা। তাঁর আসল নাম ছিল রণদাপ্রসাদ কুণ্ডু। ছোটখাটো মানুষটি, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; কিন্তু বাপরে, কী গলার আওয়াজ! ঠিক যেন দামামা বাজছে।

সে কি আজকের কথা! তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা আমাদের ছোট্ট শহরে কেউ বা স্কুলের বেড়া পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি, কেউ বা ঢুকব ঢুকব করছি। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে সন্ধ্যের পর মাঠের মাঝখানেই গোল হয়ে বসে গল্প করতাম। আমাদের এই মেঠো আড্ডায় মাঝে মাঝে রণদামামা দর্শন দিতেন। দূর থেকে তাঁর হুংকার শুনতে পেতাম—'ওহে, তোমরা এখনো মাঠে বসে আছ!'

শহরে রণদামামার একটি ছোট্ট আবকারির দোকান ছিল; আফিম, গাঁজা, ভাঙ এই সব বিক্রি করতেন। সন্ধ্যের সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতেন। আমাদের সন্দেহ ছিল বাড়ি যাবার আগে রণদামামা এক কলকে গাঁজায় দম দিতেন। যেদিন মাত্রা বেশী হয়ে যেত সেদিন বাড়ি না গিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে বসতেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে গল্পের ফোয়ারা ছুটত। এমন সব আষাঢ়ে আজগবী গল্প ঝাড়তেন যে, আমরা চমৎকৃত হয়ে শুনতাম।

তাঁর সব গল্পই প্রায় ভুলে গেছি, এতদিন পরে মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একটা গল্প ভুলিনি। গল্পটার কতখানি গাঁজা এবং কতখানি সত্যি তা জানি না, কিন্তু বোধহয় আগাপাস্তলা গাঁজা নয়। যাহোক, গল্পটা যখন মনে আছে তখন লিখে রাখছি। রণদামামা বহুকাল গত হয়েছেন, মনে করা যাক এই গল্পটা তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ।

দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসছে; আমরা অর্ধচন্দ্রের আকারে ফুটবল খেলার মাঠের মাঝখানে বসেছি, আমাদের সামনে পদ্মাসনে বসেছেন রণদামামা। আজ তিনি কি রকম গল্প ঝাড়বেন কিছুই জানি না, কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি—

আকাশে ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ শোনা গেল। আমরা ঘাড় তুলে দেখলাম একটা এরোপ্লেন আসছে। সেকালে ভারতবর্ষে এরোপ্লেন এমন ন'কড়া ছ'কড়া ছিল না, কালেভদ্রে এক-আধটা দেখা যেত। আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলাম। প্লেনটা প্রায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

তার ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর আমাদের দলের প্রাণধন দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করল—'মামা, আপনি কখনো এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়েছেন?'

রণদামামা বললেন—'এরোপ্লেন কখনো চড়িনি কিন্তু আকাশে উড়েছি।'

পানু বলল—'অ্যাঁ! বেলুনে চড়েছেন নাকি?'

রণদামামা বললেন—'না, বেলুন নয়। আজ তবে সেই গল্পটাই বলি।'

তিনি গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যে পেরিয়ে ক্রমে রাত্রি হল, কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য নেই। অন্ধকারে বসে রণদামামার গমগম গলার আওয়াজ শুনতে লাগলাম—

তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। বউ মারা যাবার পর দেশে আর মন টিকল না। দেশে তখন ফিজি দ্বীপে যাবার হিড়িক লেগেছে; সেখানে গেলেই নাকি ভাল চাকরি পাওয়া যায়। ঠিক করলাম ফিজি দ্বীপেই যাব। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কেবল এক দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমা আছেন; দেশ ছাড়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি এক বোতল গঙ্গাজল আমার হাতে দিয়ে

বললেন—'বিদেশ-বিভূঁয়ে যাচ্ছিস, এই গঙ্গাজল সঙ্গে রাখ, মাঝে মাঝে দু'ফোঁটা মুখে দিস।'

জ্যাঠাইমাকে পেন্নাম করে গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে কলকাতায় গেলাম। তারপর একদিন ফিজিযাত্রী জাহাজে চড়ে বসলাম।

কাঠের জাহাজ; সেকালে লোহার জাহাজ তৈরি হত না। জাহাজটির বেশ বয়স হয়েছে; দুলে দুলে এঞ্জিনের ধমকে কাঁপতে কাঁপতে চলল। আমি আগে কখনো জাহাজে চড়িনি, ভাবলাম সব জাহাজই বুঝি এই রকম হয়। তখন কি জানি যে, ইংরেজ বাহাদুর কুলি চালান দেবার জন্যে এইসব ঘুণধরা হাড়-জিরজিরে জাহাজ রেখেছে! যদি ডোবে তো কতকগুলো দিশি কুলি ডুবে মরবে বই তো নয়।

যাহোক, জাহাজ তো ম্যালেরিয়া রোগীর মতন কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গা পেরিয়ে সাগরে পড়ল, সেখান থেকে পূবদিকে একটু বাঁক নিয়ে দক্ষিণ মুখে চলল। কত দিনে ফিজি পেঁছিব তার ঠিক নেই; রাস্তা তো আর একটুখানি নয়, চার হাজার মাইল।

কিন্তু জাহাজের জীবনযাত্রার কথা যদি আরম্ভ করি তাহলে গল্প শেষ করতে রাত কাবার হয়ে যাবে। জাহাজের কথা সাটে বলছি।

জাহাজে একরকম ভালই আছি। জাহাজের দোলানিতে আমার গা বমি-বমি করে না; খাই-দাই, ডেকে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে বোতল থেকে দু'ফোঁটা গঙ্গাজল হাতের তেলোয় নিয়ে মুখে দিই। সময়ের কোনো হিসেব নেই, দিনের পর দিন কাটছে। জাহাজ মাঝে মাঝে বন্দরে থামছে, আবার চলছে। বঙ্গোপসাগরের পর মলক্কা প্রণালী, তারপর ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ। জাহাজ তার মধ্য দিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ দিকে পড়ে রইল, আমরা পূব দিকে এগিয়ে চললাম।

প্রশান্ত মহাসাগর। বেশ শান্তশিষ্ট সমুদ্র; বেশী ঢেউ নেই। আমাদের দীর্ঘ যাত্রা শেষ হয়ে আসছে, আর দু'হপ্তার মধ্যে ফিজি পেঁছে যাব। জাহাজের একঘেয়ে জীবন এবার শেষ হবে ভেবে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

তারপর ফিজি দ্বীপপুঞ্জের এলাকায় পেঁছতে যখন আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে তখন হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এল ঝড়। যাকে বলে সাইক্লোন।

সমুদ্র জাহাজ এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল; কখনো দুটো প্রকাণ্ড ঢেউ-এর মাঝখানে তলিয়ে যাচ্ছে, কখনো ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসছে। সে যে কী ভয়ানক দৃশ্য, বর্ণনা করা যায় না।

জাহাজের খোলের মধ্যে দৃশ্য আরো মর্মভেদী। যাত্রীরা কেউ

বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। একজন খালাসী বলল—'বুড়ো জাহাজ সাইক্লোনে পড়েছে, টিকবে কিনা সন্দেহ। আল্লার নাম কর।'

আমি দেখলাম আজ আর রক্ষে নেই, যদি বাঁচি পুনর্জন্ম হবে। আমার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল ধুতির খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিলাম, আর গঙ্গাজলের বোতলটা দড়ি বেঁধে গলায় ঝোলালাম। যদি মরেই যাই গঙ্গালাভ হবে।

জাহাজ কিন্তু ঝড়ে ডুবল না। তার এঞ্জিন ভেঙে পড়ল, কম্পাস খারাপ হয়ে গেল, তবু সে ভেসে রইল; ঝড়ের মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসহায়ভাবে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল। তিন দিন তিন রাত এইভাবে চলল। তারপর ঝড় ঠান্ডা হল।

ঝড় ঠান্ডা হল বটে, কিন্তু সমুদ্র দুলতেই লাগল; জাহাজটা তার ওপর মোচার খোলার মতন ভেসে চলেছে। এঞ্জিন ভাঙা, কম্পাসও খারাপ হয়ে গেছে, কাজেই জাহাজকে ইচ্ছেমত চালানো যাচ্ছে না। আকাশে সূর্য উঠেছে, মেঘ কেটে গেছে; কিন্তু জাহাজের অবস্থা সঙ্গীন, কখন কি হয় বলা যায় না। আমি দুর্গানাম জপ করছি আর মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা গঙ্গাজল খাচ্ছি।

তারপর চতুর্থ দিন সূর্যাস্তের সময় সর্বনাশ হল। সমুদ্রের তলায় একটা পাহাড়ের ডগা উঁচু হয়ে ছিল, জাহাজটা ভাসতে ভাসতে তাইতে মারল ধাক্কা। ব্যস্, চক্ষের নিমেষে জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাসের বাড়ির মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ছিটকে জলে পড়লাম।

কিছুক্ষণের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। উথল-পাথার সমুদ্রের মাঝখানে আমি একা নাগরদোলায় ওঠানামা করছি। অবস্থাটা ভেবে দেখ। জাহাজে প্রায় দু'শো মানুষ ছিল, কেউ কোথাও নেই।

দিনের আলো নিবে এল। আর বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখলাম পাশ দিয়ে একটা তক্তা ভেসে যাচ্ছে; তক্তপোশের মতন একখন্ড তক্তা, বোধহয় জাহাজেরই ভাঙা একটা অংশ। আমি হাঁচোড়-পাঁচোড় করে তার ওপর উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত হল, আকাশে তারা ফুটে উঠল। আমি চিত হয়ে শুয়ে দোল খাচ্ছি। দোল খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে ঘুম ভাঙল যখন রোদ উঠেছে।

সেই আকাশ সেই সমুদ্র; বোধহয় ঢেউগুলো একটু ছোট হয়েছে। চারদিকে দিগন্তরেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বেশ ক্ষিদে

পেয়েছে। কিন্তু খাব কি? খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল গঙ্গাজল। এত ব্যাপারের মধ্যেও গঙ্গাজলের বোতলটা ভাঙেনি।

সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক গঙ্গাজল খেলাম। বেশী খাবার সাহস নেই, ফুরিয়ে গেলে আর পাব না।

এইভাবে চলল। অকূল সমুদ্রে ভেসে চলেছি তক্তপোশের মতন এক টুকরো কাঠের ওপর। খাবার নেই, গঙ্গাজলের বোতল শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর আর দেরি নেই।

তৃতীয় দিন সকালবেলা গঙ্গাজল ফুরিয়ে গেল। ভাগ্যিস জ্যাঠাইমা গঙ্গাজল দিয়েছিলেন নইলে আমার জীবন অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত। সমুদ্রের লোনা জল খেলে পাগল হয়ে মরতে হয়।

তৃতীয় দিন দুপুরবেলায় ক্ষিদেয় তেষ্টায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর সেই অবস্থায় ক'দিন কেটেছে জানি না। অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম ডাবের জল খাচ্ছি। তারপর চোখ মেলে দেখি সত্যিই ডাবের জল খাচ্ছি। একটা মেয়ে নারকেল-মালায় করে আমার মুখে ডাবের জল ঢেলে দিচ্ছে।

মেয়েটার গা কোমর পর্যন্ত মাথার চুল দিয়ে ঢাকা, শুধু মুখটি দেখা যাচ্ছে; কোমর থেকে নীচে লম্বা ঘাসের ঘাগরা। আমি চোখ খুলেছি দেখে সে কিচিরমিচির করে কী বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে আমাকে ডাবের জল খাইয়ে চলল।

মেয়েটা আমার পানে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে আর থেকে থেকে কিচিরমিচির করে কথা বলছে। তার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ডাঙায় এসে ঠেকেছি তাতে সন্দেহ নেই। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে কোন্ অজানা দেশে হাজির হয়েছি কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে গায়ে একটু বল পেয়েছি এমন সময় আমার নীচে ভিজে বালি টলমল করে নড়ে উঠল; ঠিক যেন ভূমিকম্প হল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেয়েটার মুখের পানে তাকালাম। মেয়েটা হাত উলটে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

মাটির কাঁপুনি থামলে আমি চারিদিকে তাকালাম। সামনে অপার সমুদ্র, আমি সমুদ্রের কিনারায় বালির ওপর বসে আছি, আমার পিছনে নারকেল গাছের জঙ্গল। শুধু পিছনে নয়, সামনেও সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে এখানে ওখানে নারকেল গাছের মাথা জেগে আছে। আমি জানতাম যে, সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছ জন্মায়, কিন্তু জলের মধ্যেও জন্মায় কখনো শুনিনি।

আমি উঠে বসেছি দেখে মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো; তার ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাকে সমুদ্রতীর থেকে

সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আমি তার হাত ধরে দু'পা এগিয়েছি এমন সময় যা দেখলাম তাতে আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

নারকেল গাছের জঙ্গল থেকে একটা জন্তু লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে; অনেকটা উট পাখির মতন দেখতে, কিন্তু উট পাখির চেয়ে দশগুণ বড়; দু'পাশে অর্ধেক পাখনা মেলে ছুটে আসছে। মনে কর একটা ছোটখাটো এরোপ্লেন।

আমার তো হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার থপ করে বসে পড়লাম। জন্তুটা যখন কাছাকাছি এসেছে তখন মেয়েটা একহাত তুলে চিৎকার করে উঠল—'খিট্টা!'

অমনি জন্তুটা দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা গলা বাড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। মেয়েটা তাকে আরো কী সব বলল। তখন সে আস্তে আস্তে পা ফেলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি কম্পিত কলেবরে বসে ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখতে লাগলাম। জন্তু বললাম বটে, কিন্তু চারপেয়ে জন্তু নয়, প্রকান্ড একটা পাখি। ঠোঁটের গড়ন হাঁসের মতন, পায়ের আঙুলগুলোও হাঁসের মতন চামড়া দিয়ে জোড়া। কিন্তু গায়ে পাখির মতন পালক নেই। বাদামী রঙের লোম।

পাখিটা গলা বাড়িয়ে গোল গোল চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে, মেয়েটা তাকে কি যেন হুকুম করল। অমনি পাখিটা উড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে বসল, জলের ওপর সাঁতার কেটে গলা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বোধহয় মাছ ধরতে লাগল।

আমার হৃৎকম্প থামলে আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম, মেয়েটা হাত ধরে আমাকে ভিতর দিকে নিয়ে চলল। আমি পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম পাখিটা পানকৌড়ির মতন সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে আর ভেসে উঠছে।

আমরা নারকেল বন পেরিয়ে এসে দেখলাম পাথুরে মাটি ক্রমে উঁচু দিকে উঠেছে। সবার ওপর শিরদাঁড়ার মতন একটানা পাহাড়। পাহাড় কিন্তু বেশী উঁচু নয়, বড়জোর সমুদ্র থেকে দু'শো ফুট; তার ঢালু গা বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় না।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে ওদিকের দৃশ্য দেখতে পেলাম। এদিকেও সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্রের কিনারায় গাছ নেই, কেবল তীরের জল থেকে অসংখ্য নারকেল গাছ মাথা জাগিয়ে আছে। এদিকেও জমি বেশ ঢালু, কিন্তু বালি নেই। মাঝে মাঝে লম্বা ঘাসের গোছা উঁচু হয়ে আছে। এই ঘাস দিয়ে ঘাগরা তৈরি করে মেয়েটা পরেছে।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে বুঝতে পারলাম এটা একটা দ্বীপ। সামনে পিছনে যেমন সমুদ্র, ডাইনে বাঁয়ে দূরের দিকে তাকালে তেমনি

সমুদ্র চোখে পড়ে। দ্বীপটা লম্বাটে ধরনের, বোধহয় দু'মাইল লম্বা হবে, আর চওড়া আধ-মাইল। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ দেখতে পেলাম না।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ফুটো। ফুটোগুলো প্রকৃতির তৈরি ফুটো নয়, প্রকৃতি অমন সার গেঁথে ফুটো তৈরি করে না; মনে হল, মানুষ পাহাড়ের গা খুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, এই ফুটোগুলো তার দোর।

কিন্তু এতগুলো ঘর যদি থাকে তাহলে মানুষও নিশ্চয় অনেক-গুলো আছে। আমি ফুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম--'ওগুলো কী?

মেয়েটা বলল—'কিচমিচ কিচমিচ।'

এর পর আর কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি ওর ভাষা বুঝি না, ও আমার ভাষা বোঝে না। মেয়েটা যেন ভারী মজা পেল, মুক্তোর মতন দাঁত বের করে হেসে আমার হাত ধরে ওই ফুটোগুলোর দিকে নিয়ে চলল।

কাছে গিয়ে দেখলাম আমি যা আন্দাজ করেছিলাম মিথ্যে নয়। ফুটোর ভেতরে ছোট ছোট কুঠরি; পাহাড়ের গা কেটে ঘর তৈরি করেছে। ফুটোগুলো হচ্ছে দরজা, ঘরগুলো লম্বায় আন্দাজ আট হাত, চওড়ায় পাঁচ হাত। দেয়াল এবড়োখেবড়ো, জানালা নেই, কেবল ওই দোরের ফুটোটি আছে।

মেয়েটা আমাকে একটি কুঠরির মধ্যে নিয়ে গেল। মেঝের ওপর নারকেল বালদো আর লম্বা ঘাসের বিছানা পাতা; দেয়াল ঘেঁষে একসারি নারকেল-মালার পাত্রে কি সব রয়েছে; অন্য দেয়ালের গায়ে খানিকটা ছাই আর কিছু জ্বালানি কাঠ। মনে হল মেয়েটা এই কুঠ-রিতেই থাকে, অন্য কুঠরিগুলোতে কেউ থাকে কিনা কে জানে।

আমাকে বিছানায় বসিয়ে মেয়েটা আমার সামনে বসল, আমার মুখের পানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। কথা বলার উপায় নেই। মেয়েটার চুলে-ঘেরা মুখখানা বেশ সপ্রতিভ। বয়স ঠিক বোঝা যায় না; আমাদের দেশের মেয়ে হলে বলতাম বয়স চোদ্দ কি পনেরো। আমি তার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, এরা আদিম জাতের মানুষ, এখনো সভ্যতার স্বাদ পায়নি; কাপড় পরতে জানে না, ঘাসের ঘাগরা পরে বেড়ায়। কী খায় কে জানে, হয়তো এই দ্বীপে নারকেল ছাড়া আর কোনো খাবার জিনিস নেই—

এই সময় বিরাট পাখিটা উড়ে এসে দোরের ফুটোর সামনে বসল। ঘরের ভেতর গলা বাড়িয়ে বলল—'প্যাঁক!'

তারপর আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েটা ছুটে গেল দোরের কাছে।

আমিও পিছু পিছু গেলাম। দেখি, মেয়েটা পাখির পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাছ বের করছে। আগে লক্ষ্য করিনি, পাখিটার পেটের ওপর একটা পকেট আছে। সামান্য পকেট নয়, চটের ছালার মতন প্রকাণ্ড পকেট। বুঝলাম পাখিটা সমুদ্রে মাছ ধরে তখনি-তখনি খায় না, পকেটে পুরে মেয়েটার কাছে নিয়ে আসে।

মেয়েটা পাখির পকেট থেকে গোটা পাঁচেক মাঝারি গোছের মাছ বের করে নিয়ে তাকে কি বলল। পাখিটা প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে একটু দূরে সরে গেল, পকেট থেকে ঠোঁট দিয়ে মাছ বের করে টপাটপ গিলতে লাগল। তার পকেটে আরো অনেক মাছ ছিল।

মেয়েটা বাকী মাছগুলো নিয়ে কুঠরির মধ্যে এল, আমার পানে চেয়ে খিলখিল করে হাসল। বুঝলাম, মেয়েটা শুধু নারকেল খায় না, মাছও খায়।

সেদিন পেট ভরে আগুনে ঝলসানো মাছ খেয়েছিলাম। আর জানতে পেরেছিলাম এই দ্বীপে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ নেই।

এর পর দু'মাসের কথা বাদ দিচ্ছি। এই দু'মাসে আমি আর মেয়েটা পরস্পরের ভাষা শিখে নিলাম; অর্থাৎ ওর ভাষা আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না, আর ও আমার ভাষা বলতে পারে না কিন্তু বুঝতে পারে।

মেয়েটার নাম তিতি। পাখির নাম খিট্টা।

ভাষা শেখার পর দ্বীপের ইতিহাস আস্তে আস্তে জানা গেল।

খিট্টার জাতের পাখিরাই এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী। অন্য কোনো পাখি নয়, কেবল খিট্টার জাতের অতিকায় পাখি। তারপর কে জানে কত হাজার বছর আগে কোথা থেকে একদল মানুষ ভেলায় ভাসতে ভাসতে এখানে উপস্থিত হল। পাখিগুলো দেখতে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু খুব নিরীহ, সহজে পোষ মানে। মানুষেরা তাদের পোষ মানাল; নারকেল আর মাছ খেয়ে দ্বীপে বাস করতে লাগল; পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে ঘর তৈরি করল। আমার বিশ্বাস মানুষগুলো প্রথম যখন এসেছিল তখন তাদের সঙ্গে লোহা কিংবা তামার যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল; সেসব বহুকাল আগে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। এখন আর দ্বীপে ধাতু নেই।

দ্বীপটা আগে আরো অনেক বড় ছিল, তার আশেপাশে দু'চার মাইলের মধ্যে আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ছিল। যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন অনেক গোষ্ঠী অন্য দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে লাগল।

খিট্টা জাতের পাখি সম্বন্ধে আসল কথাটাই এখনো বলিনি। পাখিগুলো আগে নিজেরাই সমুদ্রে মাছ ধরে খেত। মানুষেরা তাদের শেখালো মাছ ধরে পকেটে করে নিয়ে আসতে; সেই মাছ পকেট থেকে বের করে মানুষেরা খেত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না। গল্প শুনেছ নিশ্চয়, ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চেপে আকাশে উড়ে বেড়ান। এই দ্বীপের মানুষগুলোও তেমনি পাখিদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের পকেটের মধ্যে ঢুকে উড়ে বেড়াতে লাগল।

প্রথম যেদিন কথাটা শুনলাম, সেদিন দুপুরবেলা তিতি আর আমি সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করছিলাম; খিট্টা কিছু দূরে বালির ওপর পা গুটিয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল। খিট্টার চোখে দু'টো পর্দা, একটা স্বচ্ছ অন্যটা অস্বচ্ছ। সে যখন সমুদ্রে মাথা ডুবিয়ে মাছ ধরে তখন স্বচ্ছ পর্দাটা বন্ধ রাখে, আর যখন ঘুমোয় তখন দু'টো পর্দাই তার গোল গোল চোখের ওপর নেমে আসে।

তিতি মেয়েটা অসভ্য আদিম জাতের মেয়ে বটে, কিন্তু তার বেশ বুদ্ধি আছে; খুব চটপটে হাসিখুশি স্বভাব। ভাষা শেখার পর থেকে সে অনর্গল কথা বলে। আমাকে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেছে, একটা কথা কইবার লোক পেয়েছে।

সেদিন গল্প করতেঁ করতে টের পেলাম মাটি দুলে উঠল। এখন আমার ভূমিকম্প অভ্যেস হয়ে গেছে, প্রায়ই মাটি দোলে। রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, অনুভব করি দ্বীপ টলমল করে দুলছে; তারপর দোলা থামলে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ভবিষ্যতে যা হবার হবে, এখন ভেবে লাভ নেই।

তিতি হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, তোমাদের দেশে খিট্টা আছে?'

আমি বললাম—'খিট্টার মতন এত বড় পাখি নেই, ছোট ছোট পাখি আছে।'

সে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'তাহলে তোমরা উড়তে পার না?'

অবাক হয়ে বললাম—'উড়তে পারি না, তার মানে? তুমি উড়তে পার নাকি?'

তিতি ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ, উড়তে পারি। খিট্টার পকেটে ঢুকে কত উড়ে বেড়িয়েছি। তুমি আসার পর আর উড়িনি, তাই তুমি জান না। খিট্টা বুড়ো হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে বেশীদূর উড়তে পারে না।'

'অ্যাঁ! তুমি আকাশে উড়তে পার! এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। তুমি খিট্টার পকেটে ঢুকতে পার?'

'কেন পারব না। একজন মানুষ বেশ ঢুকতে পারে। দেখবে?

—খিট্টা! খিট্টা!

খিট্টার চোখ তখনি খুলে গেল. সে উঠে দাঁড়াল। তিতি তার কাছে গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বলল—'বসে থাক্, বসে থাক্, আমি তোর পেটে ঢুকে উড়ব।'

খিট্টা আবার হাঁটু মুড়লো। তিতি তখন তার পেটের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসল। তার মুখখানি কেবল পকেটের ওপর বেরিয়ে রইল। পকেটে বাচ্চা নিয়ে ক্যাঙারুর ছবি দেখেছ নিশ্চয়, ঠিক সেই রকম।

তারপর খিট্টা পাখা মেলে দিয়ে দু'চার বার পাখা নাড়ল, দু'চার পা সামনে হেঁটে গিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। খিট্টা চিলের মতন পাক খেয়ে খেয়ে উঁচুতে উঠতে লাগল। অনেক উঁচুতে উঠে আবার পাক খেয়ে খেয়ে নামতে আরম্ভ করল। তারপর পাখা গুটিয়ে আমার সামনে এসে বসল।

তিতি খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে এসে খিলখিল করে হাসল। বলল—'দেখলে উড়তে পারি কিনা! তুমি উড়বে?'

বললাম—'ও বাবা. খিট্টা যদি উঁচুতে তুলে নীচে ফেলে দেয়!'

তিতি বলল—'আচ্ছা, তবে থাক। খিট্টার সংগে তোমার আরো ভাব হোক. তারপর উড়ো।'

যাহোক, আকাশে ওড়ার কথাটা তোমাদের আগেই শুনিয়ে ছিলাম। এবার দ্বীপের ইতিহাসে ফিরে যাই।

দ্বীপপুঞ্জের মানুষগুলো বেশ মনের সুখে ছিল। যখন ইচ্ছে পাখিতে চড়ে উড়ে বেড়াত, এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপে যেত, নেচে গেয়ে সময় কাটাত। অবশ্য তাদের খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল নারকেল আর মাছ; কিন্তু আজন্ম তাতেই তারা অভ্যস্ত, তাই কষ্ট হত না। তাদের খাবার সংগ্রহের জন্যে তিলমাত্র কষ্ট স্বীকার করতে হত না; পাখিরা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে দেয়; নারকেল গাছে অজস্র নারকেল ফলে, পাড়ো আর খাও। চাষ করতে হয় না, জাল ফেলে মাছ ধরতে হয় না। বেপরোয়া সুখের জীবন।

এইভাবে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে কয়েকটি দ্বীপের ওপর একদল মানুষ মনের আনন্দে বাস করছিল, হঠাৎ বছর তিনেক আগে এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। দুপুর রাত্রে দ্বীপ দুলতে আরম্ভ করল। মানুষগুলো ভয় পেয়ে যে যার কোটর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দ্বীপ যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, চারিদিক থেকে মড়মড় ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। অন্ধকারে প্রলয়ংকর কাণ্ড।

এরা আগে কখনো ভূমিকম্প দেখেনি. কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে

পারল না। আধ ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের বেগ কমল, কেবল মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছে। তারপর যখন সকাল হল, দেখা গেল দ্বীপ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, সমুদ্রের কিনারে যত নাবাল জমি ছিল সব ডুবে গেছে, কেবল নারকেল গাছগুলোর মাথা জেগে আছে। শুধু তাই নয়, আশেপাশে যে সব দ্বীপ ছিল সেগুলো বেবাক সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে গেছে, সেখানকার মানুষগুলো ডুবে মরেছে। কেবল বিরাট পাখিগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর থেকে দ্বীপ মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। কিছুদিন পরে সকলে লক্ষ্য করল, যখনই দ্বীপ নড়েচড়ে ওঠে তখনি তার খানিকটা জলের নীচে তলিয়ে যায়। দ্বীপটা যেন ফুটো জাহাজের মতন টলমল করতে করতে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এইভাবে আরো কিছুদিন গেল; দ্বীপের মানুষগুলো বুঝল এ দ্বীপ আর বেশী দিন নয়, অন্য দ্বীপ-গুলোর মতন এও একদিন সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। তখন কী হবে? সকলকেই ডুবে মরতে হবে।

দ্বীপের মানুষগুলোর মধ্যে যারা প্রবীণ মাতব্বর লোক ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উপায় স্থির করল। কয়েকজন লোক পাখিতে চড়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল, দেখতে গেল বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে এমন কোনো দ্বীপ আছে কিনা যা ভূমিকম্পে মজে যাচ্ছে না।

একে একে সবাই ফিরে এল। কেউ দ্বীপ দেখতে পায়নি, কেবল যে-লোকটা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল সে বলল, উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে সে দূরে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ রঙের একটা আভা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার পাখি এদিক ওদিক উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই সে আর অত দূর যেতে সাহস করেনি, ফিরে এসেছে।

তখন তিন জন লোক নতুন পাখিতে চড়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলল। পাঁচ দিন তাদের দেখা নেই; তারপর তারা ফিরে এসে খবর দিল, পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মস্ত বড় দ্বীপ আছে, দ্বীপে নারকেল গাছ আছে। তারা তিন দিন সেখানে থেকে দেখেছে, ভূমিকম্প নেই, দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে না।

তখন এই দ্বীপ থেকে ওই দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু হল। সকলে নিজের নিজের পাখিতে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে দু'চার দিনের মধ্যে এই দ্বীপ খালি হয়ে গেল। রয়ে গেল কেবল তিতি।

তিতি দুনিয়ায় একা, মা-বাপ মরে গেছে; আছে শুধু ওই বুড়ো পাখি খিট্টা। সেও বেরিয়েছিল খিট্টায় চড়ে অন্য দ্বীপে যাবে বলে; কিন্তু খিট্টা চার-পাঁচ মাইল গিয়ে ফিরে এল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল অন্য দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তার আগেই সমুদ্রে

পড়ে গিয়ে তিতিকে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যাবে। তিতি আরো কয়েকবার চেষ্টা করল তাকে অন্য দ্বীপে নিয়ে যেতে, কিন্তু বুড়ো খিট্টা দু'চার মাইলের বেশী যায় না, ফিরে আসে। তিতিকে বয়ে নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ মাইল উড়ে যাবার সাধ্য তার নেই।

তিতি একা দ্বীপে পড়ে রইল, তার একমাত্র সঙ্গী খিট্টা। তারপর দিনের পর দিন কাটছে। খিট্টা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনে, নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়ে। তিতি জানে এ দ্বীপ থেকে তার বেরুবার উপায় নেই। দ্বীপ একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে; একদিন আসবে যেদিন দ্বীপ আর থাকবে না, তখন তিতিকে ডুবে মরতে হবে।

এইভাবে প্রায় দু'বছর কাটার পর একদিন জোয়ারের মুখে ভাসতে ভাসতে আমার তক্তপোশ এসে দ্বীপের চড়ায় ঠেকল। তিতি আমার অজ্ঞান দেহটা টেনে ডাঙায় তুলল। তক্তপোশটা ভাঁটার টানে ভেসে গেল। তারপর থেকে যা-যা ঘটেছে মোটামুটি তোমাদের বলেছি।

পরস্পরের ভাষা আয়ত্ত করার পর আমাদের জীবন অনেকটা সহজ হয়ে এল; রোজ মাছ-পোড়া আর ডাব-নারকেল খাওয়াও সহ্য হয়ে গেল। কেবল একটা দুঃখ কিছুতেই ঘুচল না; এ দ্বীপে মিঠে জল নেই, জলের বদলে ডাবের জল খেতে হয়। তাতে হয়তো শরীর ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু মন মানে না; মন চায় জলের স্বাদ। জলের খোঁজে দ্বীপময় ঘুরে বেড়াই, যদি কোথাও দেখতে পাই পাথরের ফাটল দিয়ে ঝির ঝির করে জলের ধারা ঝরে পড়ছে। কিন্তু কোথায় জল! জল থাকলে আদিম মানুষগুলো অনেক আগেই আবিষ্কার করত।

দ্বীপের আবহাওয়া ভারতবর্ষের মতন নয়। দিনের বেলা কড়া রোদ্দুরে দ্বীপের পাথর আর বালি গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করে; শেষ রাত্রে কনকনে ঠাণ্ডা।

তিতি সন্ধ্যের আগেই রান্না চড়াতো। অর্থাৎ চকমকি ঠুকে কোটরের মধ্যে আগুন জ্বালত; তারপর মাছের পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে পেটের মধ্যে কী সব শিকড়-বাকড় পুরে আগুনে ঝলসাতে আরম্ভ করত। এরা সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করতে জানত না, কিন্তু মাছ ঝলসানোর সময় তাতে লোনা জলের ছিটে দিয়ে তাকে নোনতা করে নিতে জানত। মাছ খেতে নেহাত মন্দ হত না। নুন আর শিকড়-বাকড়ের গন্ধ মিশিয়ে বেশ স্বাদ হত। এক পেট মাছ খেয়ে খানিকটা ডাবের শাঁস আর জল খেতাম।

খাওয়া শেষ হলে আগুনে আরো শুকনো বালদোঁ দিয়ে আমরা দু'জনে আগুনের দু'পাশে ঘাসের বিছানায় লম্বা হতাম। তিতি বলত—'গল্প বলো।'

তাকে আমাদের দেশের রকমারি গল্প শোনাতাম। শহর-বাজারের কথা শুনে চোখ গোল করে চেয়ে থাকত; বাঘ ভাল্লুকের গল্প শুনে বিশ্বাস করত না, এ রকম জন্তু যে থাকতে পারে তা তার ধারণার অতীত।

শেষে গল্প শুনতে শুনতে তিতি ঘুমিয়ে পড়ত। আমি উঠে নিবন্ত আগুনে আরো কাঠ দিতাম। একটা টাটি তৈরি করেছিলাম নারকেল গাছের পাতা দিয়ে, তাই দিয়ে দোর ঢাকা দিতাম, তারপর শুয়ে পড়তাম। কুঠরি শেষরাত্রি পর্যন্ত গরম থাকত।

এইভাবে রাত কাটে। রাত্রে যখন ঘুম আসে না তখন শুয়ে শুয়ে ভাবি, কোনো দিন কি এই দ্বীপ থেকে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব? কি করে ফিরে যাব? এদিকে জাহাজের যাতায়াত নেই, থাকলেও জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায় ছিল না। এই সব ভাবতে ভাবতে হয়তো মাটি দুলে উঠত; ভাবতাম, এমনিভাবে দ্বীপ একটু একটু করে সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সলিল-সমাধি হবে।

দিনের বেলা কোনো 'কাজ নেই। দ্বীপেব কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়াই। খিট্টার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে, সে হেঁটে হেঁটে আমার পিছনে আসে। সে এখন আমার কথা সব বুঝতে পারে, আমি কোনো হুকুম করলে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। আমি ঘুবে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে ঠেস দিয়ে বসি, খিট্টাকে হুকুম করি—'খিট্টা, একটা কচি ডাব পেড়ে নিয়ে আয়, তেষ্টা পেয়েছে।'

খিট্টা অমনি উড়ে গিয়ে নেয়াপাতি ডাব পেড়ে আনে। আমি বলি—'ফুটো করে দে।' খিট্টা ঠোঁটের এক ঠোকর মেরে ডাবে ফুটো কবে দেয়, আমি আরামসে ডাবের জল খাই।

খিট্টার সঙ্গে ভাব হবার পর তিতি প্রায়ই আমাকে বলত—'এবার একদিন খিট্টায় চড়ে আকাশে ওড়ো না!' আমার ভয় করত, বলতাম—'আমি তোমার চেয়ে ওজনে অনেক ভারী, খিট্টা যদি আমাকে নিয়ে উড়তে না পারে? যদি সমুদ্রে ফেলে দেয়?' তিতি হেসে বলত—'না না, কোনো ভয় নেই। উড়েই দেখ না!'

একদিন মরিয়া হয়ে খিট্টার পকেটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পকেটের মধ্যে আঁশটে গন্ধ। কিন্তু একজনের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা। খিট্টাকে ভয়ে ভয়ে হুকুম দিলাম—'ওড়্!' খিট্টা পাখা মেলে আকাশে উঠল। আমার বুক দুরদুর করছে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে ভয় কেটে গেল, হৃৎকম্পন থামল। খিট্টা অনেক উঁচুতে উঠে দ্বীপের কিনারা ঘিরে

চক্কর দিতে লাগল, সমস্ত দ্বীপটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। সে যে কী অপূর্ব অনুভূতি বলতে পারি না। আধ ঘণ্টা পরে খিট্টা নিজেই নেমে এল।

এই আমার প্রথম আকাশে ওড়া। তারপর আরো অনেকবার আকাশে উড়েছি, যখনই ইচ্ছে হয়েছে উড়েছি। সে আজ কত কালের কথা। এরোপ্লেন তখন কোথায়?

কিন্তু মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কোন্ দিন দ্বীপ হুস করে সমুদ্রে ডুব মারবে তার ঠিক নেই।

তবু দ্বীপের ওপর জীবনটা মন্দ কাটছে না। দ্বীপে থাকাকালে আমার সময়ের হিসেব ছিল না, কিন্তু সাত বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিলাম; মানে মোটামুটি সাত মাস সেখানে ছিলাম। শেষের দিকে কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে গিয়েছিল. তাই আমিও তিতির মতন ঘাসের ঘাগরা পরতাম।

একদিন আমি আর তিতি সমুদ্রের তীরে বসে ছিলাম. তিতি বলল—'তুমি নাচতে জানো?'

বললাম—'দূর, পুরুষেরা নাচে নাকি? আমাদের দেশে মেয়েরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে।'

তিতি বলল—'আমরা মেয়েরাও নাচি. পুরুষেরাও নাচে।'

প্রশ্ন করলাম—'তুই নাচতে জানিস?'

তিতি বলল—'হ্যাঁ জানি। দেখবে?'

তিতি উঠে দাঁড়াল, হাসি হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে নাচতে আরম্ভ করল। ধেই ধেই নাচ নয়. হাত পায়ের নানারকম ভঙ্গী করে নাচ। ঘুঙুর নেই. বাজনা নেই, তবু খুব ভাল লাগে।

খিট্টা খানিকটা দূরে বসে ঝিমোচ্ছিল, তিতিকে নাচতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল. তারপর আধ-খোলা পাখনা মেলে পা তুলে তুলে নাচতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তিতি বলল—'এস না তুমিও নাচবে।'

বললাম—'আমি যে নাচতে জানি না।'

'নাচতে নাচতে শিখবে।'

কি করি, উঠলাম। তিতি এসে আমার হাত ধরল। কল্পনা করো, নির্জন সমুদ্রতীরে একটা প্রকাণ্ড পাখি আর দু'টো মানুষ নাচছে। কিন্তু দর্শক নেই।

তারপর তিতির সঙ্গে অনেকবার নেচেছি। আমি ভালো নাচতে শিখেছিলাম। প্রাণে ফুর্তি এলে নাচা খুব শক্ত নয়। পশুপক্ষীও নাচে।

এইভাবে সাত মাস কাটার পর একটা দিন এল যেটা দ্বীপে আমার

শেষ দিন। আগে জানতে পারিনি। আমার দ্বীপে-আসা যেমন আকস্মিক, দ্বীপ ছাড়াও তেমনি আকস্মিক। হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়া। সেই দিনটার স্মৃতি কাঁটার মতন আজও বুকে বিঁধে আছে।

রাত্তিরে খুব ভূমিকম্প হয়ে গেছে, আধ ঘণ্টা ধরে দ্বীপ দুলছে। সকালবেলা কোটর থেকে বেরিয়ে দেখি অর্ধেক দ্বীপ লোপাট; দু'-চারটে নারকেল গাছ ছাড়া আর সব অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দ্বীপের পাথুরে মাথাটা জেগে আছে।

খিট্রা আমাদের দেখে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল; মনে হ'ল সে ভয় পেয়েছে। আমি তিতির মুখের পানে তাকালাম; তার মুখে মৃত্যুভয়ের ছায়া। নিজের মুখটা যদি দেখতে পেতাম তাহলে সেখানেও বোধহয় ওই কালো ছায়াই দেখতে পেতাম।

সেদিন দুপুরবেলা আমি আর তিতি দ্বীপের উত্তর দিকে একটা উঁচু ঢিবির ওপর গিয়ে বসেছিলাম। খিট্রাও ছিল। কাল রাত্রির ভূমিকম্পের পর সে এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সংগ ছাড়ছিল না।

বসে বসে আলোচনা হচ্ছিলঃ দ্বীপ তো আর দু'চার দিনের মধ্যেই সমুদ্রে ডুব মারবে, তখন আমাদের বাঁচার উপায় কি? নারকেল গাছের লম্বা গুঁড়ি নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু নারকেল গাছ কাটব কি দিয়ে? ভেলা টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসাবার শক্তি কি আমাদের আছে? যদি বা কোনো মতে ভাসাতে পারি, ভেলা তো নৌকা নয়, সে নিজের ইচ্ছেমত কোন্ দিকে যাবে তার ঠিক নেই। তারপর ভেলাতে ভাসতে ভাসতে খাব কি? কিছু নারকেল না হয় সংগে নিলাম; খিট্রাও সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কিংবা আকাশে উড়তে উড়তে আমাদের সংগে যাবে, সে মাছ ধরে এনে দেবে। কিন্তু কাঁচা মাছ খাব কি করে? নারকেলই বা ক'দিন চলবে? যদি ছ'মাস ভেসে বেড়াতে হয়!

কোনো দিক দিয়েই নিস্তার নেই। সলিল-সমাধি অনিবার্য। হতাশ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইলাম।

তারপর হঠাৎ।

দেখলাম ঈশান কোণে সমুদ্র যেখানে গিয়ে আকাশে ঠেকেছে সেইখানে ছোট্ট একটি ধোঁয়ার পতাকা! চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম, তারপর সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় বললাম—'তিতি, দ্যাখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

তিতি দেখে বলল—'ধোঁয়ার মতন লাগছে। কী ওটা?'

'জাহাজ। জাহাজ আসছে।' আমি লাফিয়ে উঠে নাচতে আরম্ভ করলাম। তিতি চোখ বিস্ফারিত করে বলল—'জাহাজ কাকে বলে?'

আমি তখন নাচ থামিয়ে তিতিকে বোঝালাম জাহাজ কাকে বলে।

বললাম—'আর ভাবনা নেই, জাহাজ আমাদের নিতে আসছে। আর আমাদের ডুবে মরতে হবে না।'

ইতিমধ্যে জাহাজটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনো চার-পাঁচ মাইল দূরে; মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার পর বুকটা ধড়াস করে উঠল। জাহাজ দ্বীপের দিকে আসছে না, চার-পাঁচ মাইল দূর দিয়ে দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে চলে যাচ্ছে। সত্যিই তো! ওরা কি করে জানবে যে, এই দ্বীপে মানুষ আছে; ওরা নিজের পথে চলে যাচ্ছে। এত দূর থেকে আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না। হায় হায়, যদি কাঠ-কুটো জমা করে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করে রাখতাম! তাহলে ওরা ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারত। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আগুন জ্বালতে জ্বালতে জাহাজ চলে যাবে।

হতাশ চোখে জাহাজের পানে চেয়ে বসে রইলাম। জাহাজ দ্বীপের প্রায় সামনাসামনি এসেছে, দূরত্ব মাইল তিনেকের বেশী নয়। জাহাজের ডেক দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ডেকে মানুষ আছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ তিতি বলল—'এক কাজ করলে হয়।'

'কি কাজ?'

'খিট্টা আমাদের জাহাজে পৌঁছে দিতে পারে।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম—'আরে তাই তো! এ কথাটা এতক্ষণ মনে আসেনি। তিতি, তোর ভারি বুদ্ধি। খিট্টার পক্ষে আমাদের নিয়ে তিন-চার মাইল উড়ে যাওয়া কিছুই নয়।—কিন্তু—কিন্তু—'

আমি আবার বসে পড়লাম—'খিট্টা আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে কি করে? আমরা দু'জন ওর পকেটে আঁটবো না।'

'দু'জনকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? একজনকে আগে নিয়ে যাবে, তারপর ফিরে এসে আর একজনকে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক তো, ঠিক তো। আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। তাহলে তুই আগে যা তিতি, জাহাজে পৌঁছে খিট্টাকে পাঠিয়ে দিস।'

তিতি বলল—'আমি আগে গেলে চলবে না। তুমি ওদের ভাষা জানো, তুমি আগে যাও।'

তাও তো বটে। জাহাজের লোকদেব ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে হবে, তাহলে তারা জাহাজ থামাবে; হয়তো দ্বীপের কাছে আসবে। তিতি আগে গেলে তা হবে না।

উঠে পড়লাম। খিট্টার কাছে গিয়ে বললাম—'ওই জাহাজ দেখতে

পাচ্ছিস, আমাকে ওখানে নিয়ে চল।' খিট্টা ঘাড় তুলে জাহাজের পানে চাইল, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তার পকেটে ঢ্বকলাম। তিতিকে বললাম—'আচ্ছা তিতি, আমি গিয়েই খিট্টাকে পাঠিয়ে দেব।'

তিতি হেসে ঘাড় নাড়ল। তখনো জানি না তিতির সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা, ইহজীবনে আর দেখা হবে না।

খিট্টা দ্ব'চার বার পাখনা নেড়ে আকাশে উঠল; জাহাজের দিকে ম্বখ করে সোজা উড়ে চলল। বেচারা খিট্টা।

আমি খিট্টার পকেটের মধ্যে বসে নানান রংবেরঙের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম; খিট্টাকেও যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, খিট্টাকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করব। তখন আমাদের পায় কে! হায় খিট্টা!

খিট্টা জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। জাহাজও দাঁড়িয়ে নেই; তব্ব দেখতে দেখতে জাহাজের চেহারা বড় হচ্ছে। প্রথমে ছিল মোচার খোলার মতন, তারপর পানসির মতন, ক্রমে আরো বড়। এবার জাহাজের ডেকের ওপর মান্বষ দেখতে পাচ্ছি, ইউনিফর্ম-পরা মান্বষগ্বলো ছ্বটে আসছে ডেকের কিনারায়, রেলিং-এর ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জাহাজ অত চিনি না, কিন্তু মনে হল এটা মানোয়ারী জাহাজ; তার লেজের দিকে পতাকা উড়ছে, সাদা জমির ওপর লাল চাকতি।

আমরা জাহাজের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছি, খিট্টা জাহাজের খোলা ডেকের দিকে নামতে শ্বর্ব করেছে এমন সময় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। জাহাজ থেকে দ্বম্ করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে খিট্টা প্যাঁক করে ডেকে উঠল; তারপর সোজা নীচের দিকে পড়তে লাগল। তোমরা পাখি শিকার করেছ, উড়ন্ত পাখি ব্বকে গ্বলি খেয়ে যেভাবে পড়ে খিট্টা ঠিক সেই ভাবে পড়তে লাগল।

কী হল ভাল ভাবে ধারণা করবার আগেই জলে পড়লাম। পড়ার বেগে খিট্টার সঙ্গে সম্বদ্রে তলিয়ে গেলাম। তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে ভেসে উঠলাম। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, জলে পড়ার সময় মাথায় চোট লেগেছিল, কেমন যেন ধন্দ লেগে গিয়েছিল। আবছা ভাবে দেখলাম জাহাজ থেকে জালি-বোট নামছে। জালি-বোট এসে আমাকে জল থেকে টেনে তুলল। তারপর কিছ্ব মনে নেই, বোধহয় কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান হয়ে দেখি জাহাজের ডেকের ওপর শ্বয়ে আছি, আমাকে ঘিরে একদল ফৌজি পোশাক-পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সব মনে পড়ে গেল, আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মান্বষগ্বলোর

মুখ দেখে মনে হল এরা যেন স্বাভাবিক নয়। তারপরই বুঝতে পারলাম, এরা জাপানী; জাহাজটা জাপানী জাহাজ।

আমি তখন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে চিৎকার করে বললাম—'ও জাপানী সায়েব, তোমরা এ কি সর্বনাশ করলে! খিট্টাকে গুলি করে মেরে ফেললে কেন? তিতি এখন জাহাজে আসবে কি করে?'

জাপানীরা কেউ কথা বলল না, বাদামের মতন চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে রইল। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, পাগলের মতন লাফাতে লাফাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করতে লাগলাম—'থামাও থামাও, শীগ্‌গির জাহাজ থামাও। তিতিকে ফেলে কোথায় চলে যাচ্ছ! খিট্টা মরে গেছে, এখন কে তাকে মাছ ধরে খাওয়াবে, কে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দেবে? তিতি যে না খেয়ে মরে যাবে। তোমরা কেমন লোক, বুঝতে পারছ না!'

তখন একজন জাপানী অফিসার আমার হাত ধরে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বয়স্থ মানুষ, অল্প ইংরেজি জানেন; কিন্তু চোয়ালের হাড় লোহার মতন শক্ত। তখন রুশ-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

আমি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ক্যাপ্টেনকে সব কথা বললাম। শুনে ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন—'এত বড় পাখি সভ্য জগতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই একজন নাবিক ভয় পেয়ে তাকে গুলি করে মেরেছে। যাহোক, আমরা বিশেষ সামরিক কাজে যাচ্ছি, এখন আর দ্বীপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা নোট করে নেওয়া হয়েছে। পরে এই দ্বীপে অনুসন্ধান করব।'

জিজ্ঞেস করলাম—'সাহেব, কবে দ্বীপে ফিরে আসবে?'

জাপানী ক্যাপ্টেন বললেন—'এখন যুদ্ধ চলছে, কিছুই বলা যায় না।'

তারপর ক্যাপ্টেনকে অনেক মিনতি-স্তুতি করলাম, কিন্তু ফল হল না। ওদের কাছে তিতির জীবনের কোনো মূল্য নেই।

দু'হপ্তা পরে একটা অন্ধকার রাত্রে জাপানী জাহাজ আমাকে মালয় দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি সেখান থেকে সিংগাপুরে গেলাম, তারপর দেশে ফিরে এলাম।

তিতিকে যখন মনে পড়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। বড় ভাল মেয়ে ছিল। যদি দেশে আনতে পারতাম তাকে বিয়ে করতাম।

রণদামামা চুপ করলেন। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতার মধ্যে রণদামামার গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

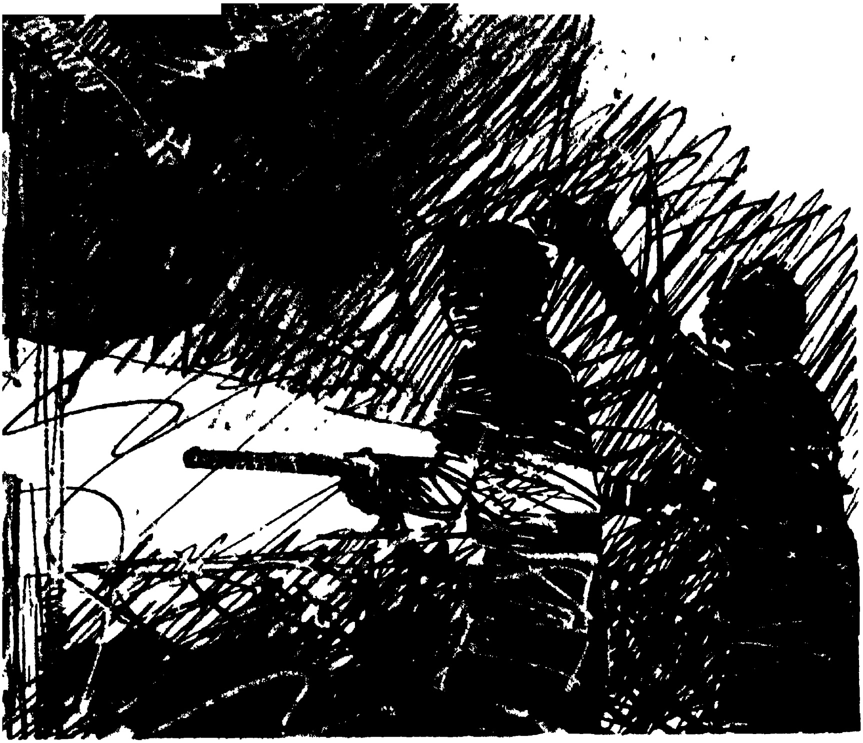

নন্দনগড় রহস্য

পঙ্কজ বাঙালী আর হনুমন্ত সিং বেহারী। ম্যাট্রিক পাস করে দু'জনে পাটনার কলেজে ভরতি হয়েছিল, একই হস্টেলের একই ঘরে জায়গা পেয়েছিল। পঙ্কজ পড়তে এসেছিল হাজিপুর থেকে, আর হনুমন্ত এসেছিল নন্দনপুর নামে এক গ্রাম থেকে। এক ঘরে থাকার ফলে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। পঙ্কজ হনুমন্তকে হনু বলে ডাকত, হনু পঙ্কজকে বলত—পাংখা।

পঙ্কজের চেহারা সাধারণ বাঙালী ছেলের মতন; লম্বা একহারা শরীর, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ; সে লেখাপড়ায় ভাল, আবার খেলা-ধুলাতেও ওস্তাদ। হনুমন্তর চেহারা রাজপুত্রের মতন; টকটকে রং, মুখশ্রীর তুলনা নেই; লেখাপড়ায় একটু নরম, কিন্তু হকি ফুটবল ক্রিকেট সব খেলাতেই আছে।

কলেজের হস্টেলে বছরখানেক কাটবার পর গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল। পঙ্কজ হনুমন্তকে জিজ্ঞেস করল—'হনু, গরমের ছুটিতে গাঁয়ে গিয়ে কি করবি?'

হনু একটু লজ্জিতভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'কি আর করব, খাব ঘুমোব কবড্ডি খেলব—।'

পঙ্কজ তার মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিল, তার পাশে গিয়ে বসল, বলল—'আর কী?'

'আর কিছু না। পাংখা, তুইও আমার সঙ্গে গাঁয়ে চল না। দু'জনে পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াব, পাখি শিকার করব—'

'পাখি শিকার করব কি দিয়ে—লাঠি দিয়ে?'

'না না, আমার বাবার বন্দুক আছে, দোনলা বন্দুক।'

'তাই নাকি! আচ্ছা, তাহলে যাব। কিন্তু তুই গাঁয়ে গিয়ে আর কি করবি?'

হনু হেসে ফেলল—'বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন, এই ছুটির মধ্যেই বিয়ে হবার কথা।'

'অ্যাঁ—বলিস কি! এরি মধ্যে বিয়ে! তোর বয়স কত?'

'আঠারো। আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি করব, আমাদের বংশের এই রেওয়াজ।'

যে সময়ের কাহিনী তখনো ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়নি, স্বাধীনতার হাওয়া আমাদের গায়ে লাগেনি।

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। বউকে দেখেছিস?

'দূর, বিয়ের আগে কি বউকে দেখতে আছে! ভিন্ গাঁয়ের মেয়ে। শুনেছি লেখাপড়া জানে না, খাজা মুখ্খু। তুই চল না ভাই, তুই যদি বাবাকে বলিস আমার ইচ্ছে নেই, বাবা নিশ্চয় তোর কথা শুনবেন।'

'আচ্ছা, যাব।'

পঙ্কজ নিজের বাড়িতে চিঠি লিখে দিল, তারপর ছুটি আরম্ভ হলে দুই বন্ধু নন্দনপুর গ্রামে চলল।

পাটনা থেকে গয়া লাইনে মাইল পঁচিশেক গেলে ছোট্ট একটি স্টেশন পড়ে, এইখানে ট্রেন থেকে নামতে হয়। তারপর পাঁচ মাইল গরুর গাড়ির রাস্তা।

হনুমন্তর বাবা গরুর গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, গরুর গাড়ির পুরনো গাড়োয়ান ছেদিরাম গোয়ালা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিল। আরো কয়েকজন যাত্রী উপস্থিত ছিল। পঙ্কজ আর হনুমন্ত যে কামরা থেকে নামল সেই কামরাতে একটি পরিবার উঠল; স্বামী-স্ত্রী এবং একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে। হনুমন্ত তাদের চেনে না, সে তাদের পানে এক নজর তাকাল। তারা কামরায় গিয়ে বসল, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছেদিরাম চোখ মটকে বলল—'হনুমন্ত-ভাইয়া, কেমন দুল্হন্ দেখলে?'

হনুমন্ত অবাক হয়ে বলল— দুল্‌হন্‌! বউ! কোথায়?'

ছেদিরাম বলল—'বাঃ, দেখলে না! শ্যামনন্দন সিং তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে রামদুলারীকে নিয়ে গয়ায় পুজো দিতে গেল। ওই মেয়েই তো তোমার হবু বউ।'

হনুমন্ত নাক সিঁটকে বলল—'ওই পুচকে মেয়েটা! রাম রাম!'

পঙ্কজ হেসে বলল—'দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। তোর সঙ্গে খুব মানাবে।

'দুৎ, ঐটুকু বেরালছানার মতন মেয়ে আমি বিয়ে করব না।' হনুমন্ত মুখ গোমড়া করে গরুর গাড়িতে উঠে বসল। পঙ্কজ আর কিছু বলল না, গাড়িতে উঠল। মালপত্র তুলে নিয়ে ছেদিরাম গাড়ি ছেড়ে দিল।

পাথুরে রাস্তা, চারিদিকের দৃশ্য পাথুরে, উঁচুনীচু ঢেউখেলানো জমি, সামনে দূরে ছোট ছোট লম্বাটে ধরনের পাহাড় কুমিরের মতন পড়ে আছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে চাষের জমি। গাছপালা গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে গেছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তারা গ্রামে এসে পৌঁছুল। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রায় আড়াইশো ঘর মানুষের বাস। বেশির ভাগই ভুঁইয়া রাজপুত, তাছাড়া দু-চার ঘর কামার কুমোর ময়রা গয়লা ছুতোর নাপিত আছে। গ্রামটি ভারী শ্রীমন্ত; একটি প্রকাণ্ড দীঘিকে ঘিরে লোকালয় গড়ে উঠেছে। কতদিনের পুরনো দীঘি কেউ বলতে পারে না; চারটি পাড়ে পাথর বাঁধানো ঘাট, মাঝখানে কাকচক্ষু জল টলটল করছে। অতিবড় অনাবৃষ্টির বছরেও দীঘির জল শুকোয় না।

হনুমন্তদের বাড়িটা দীঘির পশ্চিম দিকের ঘাটের ঠিক সামনে। সেকেলে গড়নের দোতলা বাড়ি, ছোট ছোট জানালা দরজা, মোটা মোটা কপাটের ওপর লোহার গুল বসানো। যেন ছোটখাটো দুর্গ।

গরুর গাড়ি গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই হনুমন্তর বাবা রঘুবীর সিং বেরিয়ে এলেন। হনুমন্তর চেহারা যদি হয় রাজপুত্রের মতন, রঘুবীর সিং-এর চেহারা রাজার মতন। বয়স পঁয়তাল্লিশ, প্রসন্ন মুখ। তিনি এসে দাঁড়ালে হনুমন্ত পঙ্কজের পরিচয় দিল। তিনি হাসিমুখে বললেন—'এস বাবা। গরুর গাড়ির হয়রানিতে নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।'

দু'জনের কাঁধে দু'হাত রেখে তিনি তাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। হনুমন্ত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দোতলায় চলে গেল। নীচের তলার একটা ঘরে পঙ্কজকে নিয়ে গিয়ে রঘুবীর সিং বললেন— 'এই ঘরে তোমরা দুই বন্ধু থাকবে।'

ঘরে পাশাপাশি দু'টি খাট পাতা। একটি চৌকির ওপর খুঞ্চি-

পোশ ঢাকা খাবারের স্তূপ।

কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত ফিরে এল। দু'জনে খেতে বসল। নানা রকম খাবারঃ কচুরি সিঙাড়া বালুসাই গুলাবজামুন মোতিচুর। দু'জনে পেট ভরে খেল। খাওয়া শেষ হলে হনুমন্ত বলল—'চল্ পাংখা, তোকে আমাদের গ্রাম দেখিয়ে আনি।'

তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে, মাথার ওপর কড়া রোদ্দুর; কিন্তু রোদ্দুর ওদের গায়ে লাগে না। দুই বন্ধু গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ বেড়ালো। মাটকোঠা একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল মেয়েলী গলায় কান্নার আওয়াজ। হনুমন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ির সামনে কেউ নেই। একটি বুড়ো লোক লাঠি ধরে রাস্তা দিয়ে আসছিল। হনুমন্ত তাকে জিজ্ঞেস করল—'মাহতো, ফেকুরামের বাড়িতে কান্নাকাটি কিসের?'

মাহতো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'ফেকুরাম পরশু সকালে পাটনা গিয়েছিল, কাল রাত্তিরে ফিরে আসবার কথা ছিল কিন্তু ফেরেনি। আজ সকালে তার বউ বম্‌বম্‌দাস বাবাজীর কাছে গিয়েছিল, বাবা ইশারায় জানিয়েছেন যে ফেকুরাম মরে গেছে।'

হনুমন্ত কি বলবে ভেবে পেল না, বুড়ো মাহতো নিজে থেকেই বলে চলল—'ফেকু হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল, দু'বছরে দশ বিঘে জমি কিনেছিল, বউকে সোনার গহনা দিয়েছিল। অত সুখ কি সহ্য হয়?' বুড়ো লাঠি ঠুকঠুক করে চলে গেল।

দুই বন্ধু আবার চলতে শুরু করল। যেতে যেতে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল—'বম্‌বম্‌দাস বাবাজী কে?'

হনুমন্ত বলল—'একজন সাধু। গ্রামের কিনারায় থাকেন। মৌনী সাধু, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কেবল মাঝে মাঝে বম্‌বম্‌ করেন। চল্ তোকে দেখাই।'

সাধুদের ওপর পঙ্কজের ভক্তি ছিল না, সে একটু ঠাট্টার স্বরে বলল—'সাধুবাবা বুঝি ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?'

হনুমন্ত বলল—'দূর, সে রকম সাধু নয়। কারুর সঙ্গে কথাই বলেন না, জপতপ নিয়ে থাকেন। তবে কেউ গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে ওঁর কাছে গেলে উনি ইশারায় জানিয়ে দেন।'

গ্রাম পেরিয়ে কিছুদূর পূর্বদিকে গেলে একটা আমবাগান পড়ে। সেই আমবাগানে প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় একটা চালাঘর· ঘরের সামনে এক গাদা ছাই-এর ওপর ধুনি জ্বলছে, ধুনির সামনে বসে আছেন বম্‌বম্‌দাস বাবাজী। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, বেশী দাড়ি গোঁফ নেই, মাথার কাঁচাপাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসেছে, কপালে ভস্মটিকা।

মুখের ভাব শান্ত, চোখে স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি।

হনুমন্ত গিয়ে প্রণাম করল, পঙ্কজও হাত জোড় করে মাথা নোয়াল। বাবা হাসি-হাসি মুখে দু'জনের পানে চাইলেন। হনুমন্ত বলল—'আজ গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। এ আমার কলেজের বন্ধু।—বাবা, ফেকুরাম নাপিত কি মরে গিয়েছে?'

বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন, উত্তর দিলেন না। পঙ্কজ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'সামনের পরীক্ষায় আমরা পাস করতে পারব কি?'

বাবার মুখ আবার প্রফুল্ল হল। এবারো তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল চোখ তুলে উঁচু দিকে চাইলেন।

এই সময় একটু আশ্চর্য রকমের ব্যাপার ঘটল। বাগানের গাছে গাছে আম ফলে ছিল, চারদিকে পাকা ফলের গন্ধ ভরভর করছিল; হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে গাছের ডালপালা নাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি রং-ধরা সোনালী আম গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে ধুনির পাশে এসে স্থির হল। বাবাজী আম দু'টি তুলে দুই বন্ধুর হাতে দিলেন, কৌতুক-ভরা চোখে চেয়ে হাত তুলে তাদেব বিদায় দিলেন। বললেন—'বম্ বম্!'

দু'জনেরই যেন ধন্ধ লেগে গিয়েছিল, তারা যন্ত্রের মতন কয়েক পা গিয়ে পরস্পরের মুখে চেয়ে বোকাটে হাসি হাসল। তারপর হনুমন্ত উত্তেজিত চাপা গলায় বলল—'বুঝতে পারলি? আমরা দু'জনেই পরীক্ষায় পাস করব এই কথা বাবা ইশারায় জানিয়ে দিলেন।'

পঙ্কজ বিবেচনা করে বলল—'তাই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেল, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হত তোর বিয়ে কবে হবে।'

হনুমন্ত বলল—'না না, বাবাকে ওসব বাজে প্রশ্ন করলে বাবা রেগে যান।—চল্ তোকে একটা মজার জিনিস দেখাই।'

'কী মজার জিনিস?'

'আমাদের রাজবাড়ি। নন্দনগড়ের রাজবাড়ি।'

'সে আবার কি?'

'আমার পূর্বপুরুষেরা এক সময় এই তল্লাটের রাজা ছিলেন। আজ রাত্তিরে বাবার মুখে গল্প শুনিস।'

আমবাগানের ওপারে খানিকটা পাথুরে মাঠ, তারপর হঠাৎ মাঠ শেষ হয়ে গেছে। মাঠের কিনারায় একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তার-পরেই অতলস্পর্শ খাদ। প্রায় একশো গজ চওড়া আর দেড়শো গজ লম্বা জায়গা ধসে গিয়ে একটা বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করেছে। গহ্বরের চার পাশ খাড়া উঁচু,শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি, নীচে নামার কোনো রাস্তা

নেই।

তেঁতুল গাছটা খাদের ওপর খানিকটা ঝুঁকে আছে, তার একটা ডাল ধরে পঙ্কজ নীচের দিকে উঁকি মারল। পঞ্চাশ-ষাট গজ নীচে খাদের অসমতল জমির ওপর ঝোপঝাড় গজিয়েছে; এখানে ওখানে চাপ চাপ পাথরের ঢিপি পড়ে আছে, তার মধ্যে দূরের একটা ঢিপি বেশ উঁচু। এখান থেকে কেউ যদি নীচে পড়ে যায় তার নির্ঘাত মৃত্যু।

পঙ্কজ বলল—'কই, রাজবাড়ি কোথায়?'

হনুমন্ত বড় ঢিপির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'ওইখানে রাজবাড়ি ছিল, এখন মাটি চাপা পড়েছে। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি, অনেক বছর আগে এখানে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল, রাজবাড়িসুদ্ধ সমস্ত দুর্গ মাটির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। আমার সব কথা ভাল মনে নেই, তুই যদি শুনতে চাস রাত্তিরে পিতাজীকে জিজ্ঞেস করিস, পিতাজী জানেন। আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি পুঁথি লিখে গিয়েছিলেন, সেই তালপাতার পুঁথি আমাদের বংশে আছে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এল, দীঘিতে স্নান করে খেতে বসল। দোতলায় খাবার ঘর, রঘুবীর সিং দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে খেতে বসলেন; হনুমন্তর মা পরিবেশন করলেন। মোটাসোটা ফরসা মানুষটি। হাসিভরা মুখে প্রকাণ্ড মুক্তোর নথ।

খেতে খেতে হনুমন্ত জিজ্ঞেস করল—'বাবুজী, ফেকুরাম নাপিত কি সত্যিই মরে গেছে?'

রঘুবীর বললেন—'কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিছুদিন থেকে ফেকুরামের চালচলন বদলে গিয়েছিল। আগে ফেকু গাঁয়ের লোকের চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে যা দু-চার পয়সা পেত তাতেই কষ্টেসৃষ্টে পেট চালাত। তারপর হঠাৎ সে পাটনায় যেতে আরম্ভ করল। যেদিন যায় তার দু'দিন পরে ফিরে আসে। দেখতে দেখতে তার অবস্থা ফিরে গেল। গাঁসুদ্ধ লোকের চোখ টাটালো; কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না ফেকু কোথা থেকে টাকা নিয়ে আসে। আমার বিশ্বাস ফেকু পাটনায় কোনো চোর-ডাকাতের দলে মিশেছিল। শেষ পর্যন্ত অধর্মের ফল ফলল। ফেকু হয়তো পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা ডাকাতের দল তাকে খুন করেছে। কিছুই বলা যায় না। তবে মৌনীবাবা নাকি জানিয়েছেন ফেকু বেঁচে নেই। তাই হবে; বাবার কথা কখনো মিথ্যে হয় না। দু-চার দিনের মধ্যেই পাকাপাকি জানা যাবে।'

আর কোনো কথা হল না এ বিষয়ে। পঙ্কজ বলল—'রাজবাড়ির গহ্বর দেখে এসেছি। রাত্তিরে আপনার কাছে গল্প শুনব।'

রঘুবীর খুশী হয়ে বললেন—'বেশ বেশ, সন্ধ্যের পর চবুতরায়

বসা যাবে।'

দুপুরবেলাটা দুই বন্ধু নিজের নিজের খাটে শুয়ে কাটাল, তারপর উঠে খানিকক্ষণ দাবা খেলল। সূর্যাস্ত হতে বেশী দেরি নেই দেখে পঙ্কজ বলল—'চল্ হনু, বেড়িয়ে আসি। দুপুরের খাওয়া এখনো হজম হয়নি।'

হনুমন্ত বলল—'তা চল্। কোন্ দিকে যাবি?'

'রাজবাড়ির দিকে।'

'রাজবাড়ির গর্ত তো দেখলি, আর কী দেখবি?'

'আবার দেখব। জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে।'

দু'জনে বেরুল, রাজবাড়ির খাদের কাছে গিয়ে তেঁতুলতলায় বসল। সূর্য তখনো অস্ত যায়নি, কিন্তু ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায় অন্ধকার। নীচে গহ্বরের তল পর্যন্ত দেখা যায় না: কালো জলের মতন অন্ধকার ভরে ভরে উঠেছে, মনে হয় সূর্যাস্ত হলে গহ্বর কানায় কানায় কালো জলে ভরে উঠবে। পঙ্কজ সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

'কি ভাবছিস?'

'ভাবছি, কত কাল আগে এখানে একদল মানুষ বাস করত, সন্ধ্যে হলে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠত, রাজবাড়ির মেয়েপুরুষ নানা কাজে ঘুরে বেড়াত কেমন ছিল তাদের জীবন, তারা কী ভাবত, কী কাজ করত.. যেদিন ভূমিকম্প হয় সেদিন তারা কে কী করছিল—'

পঙ্কজ আপন মনে বলে চলল। এলোমেলো কল্পনার খেলা। সে ইতিহাসের ছাত্র, অতীতের কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। আহা, মূক অতীত যদি কথা কইতে পারত! কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত—

কিছুক্ষণ তার কল্পকথা শোনবার পর হনুমন্ত হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, তার হাত ধরে টেনে বলল—'নে ওঠ, এবার বাড়ি যাই। পাঁচশো বছর আগে যারা মরে গেছে তাদের কথা ভেবে কি হবে?'

পঙ্কজ বলল—'তুই একটা আস্ত হনু।'

বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা দেখল ভাঙের শরবত তৈরি হয়েছে, দই মিছরি গোলমরিচ শসার বিচি দিয়ে অপূর্ব ঠাণ্ডাই শরবত। গ্রীষ্ম-কালে এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়। হনুমন্ত বড় এক ঘটি ঠাণ্ডাই নিজেদের ঘরে নিয়ে এসে বলল—'আয়।'

দু'জনে বসে বসে ঘটি শেষ করল। চাকরেরা ঘরে ঘরে কেরোসিন লণ্ঠন রেখে গেছে, ধূপধুনো দিচ্ছে। দোতলার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের শীতলভোগ হচ্ছে, শাঁখ ঘড়ি-ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পঙ্কজের মনে হল সে কতকাল আগেকার ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছে।

চাকর এসে জানালো, মালিক চবুতরায় তলব করেছেন। দু'জনে উঠে বাইরে গেল।

বাড়ির সামনে শানবাঁধানো গোল চত্বর, তার ওপর জাজিম পাতা হয়েছে, দু'টি মোটা তাকিয়ার মাঝখানে রঘুবীর সিং বসেছেন; হাতে গড়গড়ার নল, গয়ার তামাকের অম্বুরী গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রঘুবীর সিং-এর গায়ে মিহি মলমলের আংরাখা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার। তাঁকে সেকালের রাজার মতন দেখাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আছে, বেশ গোলগাল চাঁদ। তারই আলোয় পঙ্কজ আর হনুমন্ত রঘুবীর সিং-এর সামনে গিয়ে বসল।

রঘুবীরও ঠাণ্ডাই খেয়েছিলেন, তাঁর মন প্রফুল্ল, মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি বললেন—'আমি হনুমন্তর বিয়ে ঠিক করেছি; পাশের গাঁয়ের শ্যামনন্দন ভারী গৃহস্থ, তারই মেয়ে। শ্রাবণ মাসে বিয়ে দেবো। পঙ্কজ, তোমাকে কিন্তু আসতে হবে।'

পঙ্কজ চকিতে হনুমন্তর দিকে চেয়ে দেখল সে ঘাড় হেঁট করে আছে। পঙ্কজও ঘাড় হেঁট করে দ্বিধা ভরে বলল—'আজ্ঞে।'

রঘুবীর তার দ্বিধা লক্ষ্য করলেন না, বললেন—'তুমি নন্দনগড়ের গল্প শুনতে চাইছিলে, তাহলে বলি শোন।' কয়েকবার গড়গড়ার নলে টান দিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—•

আজ থেকে আন্দাজ পাঁচশো বছর আগে এখানে নন্দনগড় নামে একটি রাজ্য ছিল। ছোট রাজ্য, আজকাল একটা জেলার আয়তন যতখানি, ততখানি জায়গা নিয়ে রাজ্য। আশেপাশে এমনি ছোট ছোট রাজ্য আরো আছে। তখন মোগলেরা ভারতবর্ষে ঢুকেছে, মোগল-পাঠানে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। তার মধ্যে ছোট ছোট হিন্দু রাজ্যগুলি কোনোমতে টিকে আছে।

যাঁরা নন্দনগড় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন রাজপুত ক্ষত্রিয়, কোন স্মরণাতীত যুগে রাজস্থান থেকে বেরিয়ে পূর্বদিকে এসে এই পার্বত্য এলাকায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, রাজ্যের মাঝখানে পাথর দিয়ে দুর্গ রচনা করেছিলেন। এই দুর্গই ছিল একাধারে তাঁদের রাজপুরী এবং রাজধানী।

রাজস্থান ছেড়ে আসার পরও রাজপুতেরা নিজেদের সাবেক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ছাড়েননি। শরৎকালে হরিণ বরাহ মারবার জন্যে শিকারে বেরুতেন, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকত। মাঝে মাঝে পড়শী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেত। ছেলেমেয়ের বিয়ে হত জাতের মধ্যে; এক রাজার ছেলের সঙ্গে অন্য রাজার মেয়ের।

এমনিভাবে কত শতাব্দী কেটে গেল তার ঠিক নেই। তারপর হঠাৎ একটা দিন এল যে-দিনটা নন্দনগড় রাজ্যের শেষ দিন। হঠাৎ ভাগ্যবিপর্যয় হল, এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল।

সে সময় যিনি নন্দনগড়ের রাজা ছিলেন তাঁর নাম ছিল বলবন্ত সিং। আমার পূর্বপুরুষ যশবন্ত সিং ছিলেন রাজার ছোট ভাই। রাজপরিবারের আশি জন স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে দুর্গে বাস করতেন।

রাজা বলবন্ত সিং-এর বড় ছেলে যুবরাজ কুমার সিং-এর বিয়ে ঠিক হয়েছে পাশের একটি রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে। একমাস ধরে রাজ্যে হইহই আমোদ আহ্লাদ উৎসব চলল। তারপর যুবরাজ লোক-লশকর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে গেলেন।

সাতদিন পরে যুবরাজ বিয়ে করে ফিরলেন, সঙ্গে চতুর্দোলায় বউ। অপরূপ সুন্দরী বউ, যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। আবার রাজ্যে উৎসব শুরু হল।

দু'হপ্তা ধরে হইহই চলবার পর উৎসব যখন ঝিমিয়ে এসেছে, দূরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা একে একে বিদায় নিচ্ছে, সেই সময় আমার পূর্বপুরুষ যশবন্ত সিং-এর খেয়াল হল তিনি শিকারে যাবেন। দু'মাস ধরে ভোজ চলেছে। ছাগল ভেড়া সব শেষ হয়ে গেছে, জঙ্গল থেকে হরিণ মেরে আনতে হবে।

কুড়ি জন সঙ্গী নিয়ে যশবন্ত সিং বেরুলেন। হাতে বল্লম, কাঁধে ধনুক। পুব দিকের পাহাড় পার হলেই প্রকাণ্ড জঙ্গল, সেখানে হরিণ তো আছেই, বাঘ-ভাল্লুকও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ওঁদের ইচ্ছে ছিল দু'দিন ধরে জঙ্গলে শিকার খেলবেন। তারপর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা শিকার নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন হেমন্ত-কাল, গাছে সবুজ পাতা, মাটিতে সবুজ ঘাস। প্রথম দিন তাঁরা খুব শিকার খেললেন, কয়েকটা হরিণ ও ময়ূর মারলেন। রাত্রি হলে হরিণ আর ময়ূরের মাংস সিক-কাবাব করে খেলেন। তারপর কচি ঘাসের বিছানায় শুয়ে পরম আবামে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল, তাঁরা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। মাটি দুলছে, চারিদিকের গাছ মড়মড় শব্দে ডালপালা নাড়ছে, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে, মাটির তলা থেকে বিকট গড়গড় ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। প্রথমটা কেউ বুঝতেই পারে না কী হচ্ছে, তারপর বুঝল—ভূমিকম্প!

সে কী ভূমিকম্প! সারা পৃথিবী যেন তোলপাড় হচ্ছে। যে দাঁড়িয়ে উঠেছে সে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, যে শুয়ে আছে সে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এমন ভয়ংকর ভূমিকম্প এ তল্লাটে কখনো হয়নি।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের বেগ

কমে এল, তারপর মাটি স্থির হল।

যশবন্ত সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বসে আছেন; চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। রাত্রি কত তাও জানার উপায় নেই; বনের মধ্যে প্রহরের ঘণ্টা বাজে না। সকলের মন বাড়ি ফেরার জন্যে অধীর হয়েছে; না জানি সেখানে কী হচ্ছে। সকলেরই স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

অবশেষে রাত কাটল। পূবের আকাশে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যশবন্ত সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া ছোটালেন। জঙ্গল থেকে নন্দনগড়ের দূরত্ব যদিও পাঁচ-ছয় ক্রোশের বেশী নয়, তবু মাঝ-খানে পাহাড়, সংকটপথে ঘুরে ফিরে সাবধানে ঘোড়া চালাতে হয়। তাঁরা যখন পৌঁছলেন তখন বেলা দুপুর।

নানা রকম আশা আশঙ্কা নিয়ে তাঁরা ফিরেছেন, কিন্তু ফিরে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁদের বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নন্দন-গড় দুর্গ আর নেই, তার জায়গায় বিরাট একটা হ্রদ তার ঘোলা জল নিয়ে টলমল করছে। ভূমিকম্পের ফলে দুর্গ অতলে তলিয়ে গিয়েছে, আর মাটির তলা থেকে অন্তঃসলিল উঠে এসে গহ্বরটাকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। দুর্গ এবং দুর্গের আশেপাশে যারা ছিল, তারা একজনও বেঁচে নেই, যারা চাপা পড়েনি তারা ডুবে মরেছে। সপুরী একগড়।

তখন যশবন্ত সিং-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে রাজবাড়িতে ছিল, সবাই মরেছে। যশবন্তের সঙ্গীদের অবস্থাও তাই, সবাই সর্বস্ব হারিয়েছেন; সঙ্গে যে অস্ত্রগুলো ছিল তা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা রাজপুত, এই দারুণ অবস্থাতেও ভেঙে পড়লেন না। প্রথম শোকের ধাক্কা সামলে নিয়ে আবাব গড়তে শুরু করলেন।

এই যে বাড়িটা দেখছ এটাও তখনকার সময়ের বাড়ি; দুর্গ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তাই বেঁচে গিয়েছিল। বাড়িটা তখন নিম্নশ্রেণীর অতিথিদের জন্যে ব্যবহার হত; নাচিয়ে-গাইয়েরা আসত, দূরের বণিকেরা সওদা নিয়ে এসে থাকত, মাঝে মাঝে এখানে নাচ গান মুজ্‌রোর মৌফিল বসত। ভূমিকম্পে বাড়িটা বিলক্ষণ জখম হয়েছিল কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েনি।

যশবন্ত সিং এই বাড়ি মেরামত করিয়ে বাস করতে লাগলেন, দূরে দূরে থেকে লোক এনে গ্রাম বসালেন। নতুন লোকেরা মাটি কেটে নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করল; ঘরবাড়ির সঙ্গে পুকুরও হল। গ্রামের নাম হল নন্দনপুর। এই সেই নন্দনপুর গ্রাম।

যশবন্ত সিং আর তাঁর সঙ্গীরা আবার বিয়ে করলেন, নতুন করে

সংসার পাতলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের বংশধরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। যথাকালে যশবন্ত সিং স্বর্গে গেলেন। তারপর পাঁচশো বছর কেটে গেছে। আমরা যশবন্ত সিং-এর বংশধরেরা এই গ্রামে এই বাড়িতে এখনো বাস করছি। কিন্তু নন্দনগড় রাজ্যের গৌরব-গরিমা আর ফিরে আসেনি।

যশবন্ত সিং ছিলেন নন্দনগড়ের রাজার ভাই। ভূমিকম্পের পর তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু নামেই রাজা। নন্দনগড় রাজ্যের সর্বনাশের খবর পেয়ে প্রতিবেশী রাজারা তাঁদের লাগোয়া জমি গ্রাস করেছিল। যশবন্ত সিং-এর টাকা নেই, সৈন্য নেই, কিসের জোরে রাজ্য রক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত নন্দনপুর গ্রামের চারপাশের হাজার খানেক বিঘে জমি রয়ে গিয়েছিল। এই হাজার বিঘে জমিই এখন আমাদের সম্বল।

আর সম্বল আমাদের বংশমর্যাদা। বংশের সাবেক চালচলন আমি বজায় রেখেছি এবং যতদিন ক্ষমতা থাকবে রাখব।

রঘুবীর সিং চুপ করলেন। ইতিমধ্যে চাঁদ প্রায় মাথার ওপর উঠেছে, চারদিকের দৃশ্য যেন পাঁচশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখছে। একটা পাপিয়া দূরের আমবাগান থেকে বুকফাটা ডাক ডেকে উঠল—পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!'

পঙ্কজ আস্তে আস্তে বলল—'দুর্গ ধসে গিয়ে যে গহ্বর হয়েছে, আপনি বললেন তা জলে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তো জল নেই—'

রঘুবীর বললেন—'না, এখন জল নেই। কিন্তু আমার মনে আছে পঁয়ত্রিশ বছর আগেও খাদের মধ্যে কাদা ছিল, বর্ষার সময় জল জমতো, বকেরা গিয়ে ব্যাঙাচি ধরে খেত। তারপর ক্রমে কাদাও শুকিয়ে গেল। ভেবে দেখ, পাঁচশো বছর লাগল জল শুকোতে। বোধহয় অন্তঃসলিলা নদীটা আস্তে আস্তে মজে গেল।'

পঙ্কজ বলল—'তাই হবে। এখন যদি খাদে নেমে মাটি খোঁড়া হয় তাহলে হয়তো নন্দনগড় দুর্গ খুঁড়ে বার করা যায়।'

রঘুবীর বললেন—'তা হয়তো যায়। কিন্তু ওই অতলস্পর্শ গর্তে নামবে কে? কারুর সাহস নেই। তাছাড়া দুর্গ খুঁড়ে বার করা তো দু-চার জন লোকের কাজ নয়। দুর্গের মধ্যে অনেক সোনাদানা হীরে জহরত চাপা পড়ে আছে, কিন্তু তা বার করতে হলে পাঁচশো জন লোক দরকার। অত লোক পাব কোথায়, তাদের মজুরীর টাকাই বা আসবে কোত্থেকে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—'আমার আমলে হল না। শুনেছি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে. তারা হয়তো কোনোদিন—'

পরদিন ভোরবেলা হনুমন্ত ঘুম ভেঙে দেখল পাশের খাটে পঙ্কজ নেই। তার বুঝতে বাকী রইল না পঙ্কজ কোথায় গিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে খাদের পানে ছুটল।

তেঁতুল গাছের তলায় পঙ্কজ বসে আছে, তার দৃষ্টি নীচে খাদের দিকে। হনুমন্ত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু পঙ্কজ জানতে পারল না। হনুমন্ত তখন বলল—'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

পঙ্কজ তার দিকে ফিরল, যেন তার প্রশ্ন শুনতে পায়নি এমনিভাবে বলল—'হনু, একটা মতলব মাথায় এসেছে।'

হনু সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে তাকাতে তার পাশে বসল—'কি মতলব?'

'আমি খাদে নামব, খুঁজে দেখব দুর্গের মধ্যে সেঁধোবার কোনো রাস্তা আছে কিনা।'

হনু ছানাবড়ার মতন চোখ করে বলল—'তুই একটা বদ্ধ পাগল। খাদে নামবি কি করে—লাফ মেরে? কোথাও নামবার রাস্তা নেই।'

পঙ্কজ বলল—'রাস্তা আছে। এই তেঁতুল গাছে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবো, দড়ি ধরে নামব। আমি খুব সহজে দড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পারি।'

'ওসব চলবে না। ওঠ, বাড়ি যাই।'

দুই বন্ধুতে তর্ক বেধে গেল। হনুও যেতে দেবে না, পঙ্কজও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত হনু বলল—'তুই যদি নামিস, আমিও নামবো, তোকে একলা নামতে দেবো না।'

পঙ্কজ বলল—'তা কি করে হবে। তুই ওপরে থেকে দড়ি পাহারা দিবি। মনে কর, আমরা দু'জনে নীচে নেমেছি। কেউ একজন এসে দড়ি খুলে নিয়ে চলে গেল। তখন কি হবে?'

হনু বলল—'হুঃ, বাবুজী যদি জানতে পারেন, দু'জনকেই ঘরে বন্ধ করে রাখবেন। চল্, ওঠ এখন।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে হনু বলল—'অত লম্বা দড়িই বা কোথায় পাওয়া যাবে? দশহাত বিশহাত দড়ি হলে তো চলবে না, পঞ্চাশ ষাট হাত দড়ি চাই।'

পঙ্কজ বলল—'তোদের গোয়ালঘরে তো অনেক গরু, গরু-বাঁধা দড়ি জোড়া দিয়ে লম্বা করা যাবে না?'

হনু উত্তর দিল না। তার মনেও সাড়া জেগেছে। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা স্নায়ুতে বইতে আরম্ভ করেছে। তবু সে দ্বিধাভরে বলল—'খাদের দিকে অবশ্য গাঁয়ের কেউ যায় না, কিন্তু যদিই কোনোরকমে জানাজানি হয়ে যায়—'

'জানাজানি হতে দেবো না। চুপি চুপি কাজ করব।'

সমস্যার নিষ্পত্তি হল না, কিন্তু বোঝা গেল হনুও রাজী। এত বড় অ্যাডভেঞ্চারের লোভ কতক্ষণ সামলে থাকা যায়।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পঙ্কজ তার বিছানায় লম্বা হয়েছে, হনুমন্ত এসে তার পাশে বসল, বলল—'বাবা কাল ভোরে পাটনা যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি! তাহলে তো লাইন ক্লিয়ার!' পঙ্কজ উঠে বসল, কিন্তু হনুমন্তর মুখ দেখে থমকে গেল—'কেন রে হনু, পাটনা যাচ্ছেন কেন?'

হনু বিষণ্ণ গলায় বলল—'বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র ছাপাবেন, গয়নাগাঁটি কাপড়চোপড় কিনবেন—'

পঙ্কজ চুপ করে রইল। হনু তখন মিনতি করে বলল—'তুই একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না পাংখা, তোর কথা বাবা শুনতেও পারেন।'

'তুই নিজেই বল না কেন?'

'ও বাবা, অত সাহস আমার নেই। মাকে বলেছিলাম, তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন।'

'আচ্ছা, আমি বলব।'

সেদিন সন্ধ্যের পর রঘুবীর সিং চাতালে বসে গড়গড়া টানছেন, পঙ্কজ তাঁর কাছে গিয়ে বসল। আজ রঘুবীর সিং-এর গায়ে সাধারণ সাজপোশাক, কানে কুণ্ডল গলায় হার নেই। তিনি হেসে বললেন—'কী, গল্প শুনবে নাকি? আরো অনেক গল্প আছে, মজার মজার গল্প।'

পঙ্কজ কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'আজ্ঞে, গল্প আর একদিন শুনব। যদি অনুমতি দেন হনুমন্তর বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা বলি।'

রঘুবীর সিং বললেন—'আমি কাল পাটনা যাচ্ছি বিয়ের বাজার করতে। কি বলবে বলো।'

'বিয়ে কবে স্থির করেছেন?'

'শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে। আজ থেকে দেড় মাস পরে।'

পঙ্কজ একটু চুপ করে থেকে বলল—'হনুমন্তর এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, ওর এখন পড়াশুনো করার ইচ্ছে।'

রঘুবীর বললেন—'পড়াশুনো করুক না, আমি কি ওকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি?'

'না, তবে ওর ইচ্ছে—'

'দ্যাখ বাবা, আমাদের বংশে আবহমানকাল নিয়ম চলে আসছে। ছেলের আঠারো বছর বয়স হলে তার বিয়ে হবে। হনুমন্তর এত ভয়টা কিসের?'

'এত ছোট মেয়ের সঙ্গে—'

'ছেলেমানুষী আর কাকে বলে। বউ তো আর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-ঘর করতে আসবে না। তিন-চার বছর বাপের বাড়িতে থাকবে। তারপর গৌনা হবে, তখন বউ শ্বশুরবাড়ি আসবে। এর মধ্যে হনুমন্ত যত ইচ্ছে পড়ুক, বি-এ, এম-এ পাস করুক, আমি কি মানা করেছি?'

এর পর আর তর্ক চলে না। পঙ্কজ ফিরে এসে হনুমন্তকে বলল। হনুমন্ত মুখ গোঁজ করে রইল, তারপর বলল—'আমি পালাব। বিবাগী হয়ে যাব।'

পরদিন সকালে রঘুবীর সিং দু'জন গোমস্তা সঙ্গে নিয়ে পাটনা চলে গেলেন। হনুমন্তর মন খারাপ, পঙ্কজ তাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসল। হনুমন্ত বলল—'আমার কিছু ভাল লাগছে না। যা করবার তুই কর্, আমিও সঙ্গে আছি।'

পরামর্শ করে স্থির হল, প্রথমে দড়ি যোগাড় করতে হবে। সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়; গোয়ালঘরের লাগাও গুদামঘরে প্রচুর শণের দড়ি আছে। আসল সমস্যা দাঁড়াল, দু'জনেই যদি খাদে নামে তাহলে দড়ি আগলাবে কে? পঙ্কজ বলল—'ছেদিরামকে দলে টানলে কেমন হয়?'

হনুমন্ত বলল—'ও বাবা, ছেদিরাম গরুর গাড়ি চালায় বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রভুভক্ত, সটান গিয়ে মাকে বলে দেবে। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

সমস্যা রয়েই গেল। যাহোক একটা কিছু করা যাবে, এই ভেবে তারা দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দড়ি নিয়ে বেরুল। দুপুরের কড়া গরমে সবাই ঘরে ঢুকে ঘুমোচ্ছে, কেউ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করল না।

আমবাগান দিয়ে যাবার সময় তারা মৌনীবাবার আস্তানার সামনে দিয়ে গেল, কিন্তু বাবাকে দেখতে পেল না। তখন তারা খাদের দিকে চলল।

মাঠ পার হয়ে তেঁতুলতলায় পৌঁছে তারা দেখল, মৌনীবাবা তেঁতুল গাছের ছায়ায় পদ্মাসনে বসে আছেন, তাদের দেখে মিটি মিটি হেসে বললেন—'বম্‌বম্—বম্‌বম্!'

দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তবে কি বাবা তাদের প্ল্যান

বুঝতে পেরেছেন? তারা তাঁর কাছে গিয়ে বসল, তাঁকে প্রণাম করে তাদের প্ল্যানের কথা বলল।

শুনে বাবা কিছু বললেন না, দড়িগুলো টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। নতুন শণের আট-দশটা দড়ি, প্রত্যেকটা আট-দশ হাত লম্বা, কুয়োর দড়ির মতন মোটা আর মজবুত। বাবা প্রত্যেকটি দড়ির মাঝে দুটো করে গেরো বাঁধলেন, যাতে হাত পিছলে না যায়; তারপর দড়ি-গুলোকে জুড়ে জুড়ে লম্বা করলেন, আশি-নব্বই হাত লম্বা দড়ি ছিলণ দড়ির একটা খুঁট তেঁতুল গাছের ডালে বেঁধে বাবা দড়ি খাদে ফেলে দিলেন। দড়ি ঝুলতে লাগল। বাবা তখন ভুরু তুলে দুই বন্ধুর পানে চাইলেন।

হনুমন্ত বলল—'আমি আগে নামব।'

পঙ্কজ বলল—'না, আমি আগে।'

হনুমন্ত কাতর ভাবে মৌনীবাবার পানে তাকাল—'বাবা, আপনি বলুন কে আগে নামবে। ওর যদি কোনো দুর্ঘটনা হয় আমি মুখ দেখাব কি করে?'

পঙ্কজ বলল—'আর তোর দুর্ঘটনা হতে পারে না! বুদ্ধিটা আমিই বের করেছিলাম, দুর্ঘটনা যদি হয় আমারই হওয়া উচিত।'

'বাবা, আপনি বলুন কে আগে নামবে।'

বাবা পঙ্কজের দিকে আঙুল দেখালেন।

পঙ্কজ মহানন্দে জুতো খুলে মালকোঁচা বেঁধে তৈরি হল; তার গায়ে শুধু কামিজ রইল। গিঁট বাঁধা দড়ি ধরে ওঠানামা করা খুব শক্ত নয়: হাত এবং পা দিয়ে দড়ি ধরা যায়। পঙ্কজ দড়ি ধরে সাবধানে খাদের মধ্যে নেমে গেল। হনুমন্ত তেঁতুল গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে চেয়ে রইল। বাবা প্রসন্ন মুখে গাছতলায় বসে রইলেন।

দড়িটা টান হয়ে ছিল, চার-পাঁচ মিনিট পরে আলগা হয়ে গেল। বোঝা গেল পঙ্কজ মাটিতে পা দিয়েছে।

মাটিতে নেমে পঙ্কজ দড়ি ছেড়ে দিল; এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর ঝোপঝাড় শুকিয়ে ডাঁটাসার হয়ে গেছে। ওই ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তার মতন একটা দাগ দূরে উঁচু ঢিপির দিকে চলে গেছে। ওই ঢিপিটাই বোধহয় রাজবাড়ি ছিল।

একটা বিশ্রী গন্ধ পঙ্কজের নাকে আসছিল, তার উত্তেজিত মন এতক্ষণ তা লক্ষ্য করেনি। এখন পিছন দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল—শুকনো ঝোপঝাড়ের তলা থেকে একটা মানুষের পা বেরিয়ে আছে!

পঙ্কজ সেখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে একটা পাথরের ওপর

বসল। দড়িটা নড়তে আরম্ভ করেছে, তার মানে হনুমন্ত নামছে। পংকজ উ'চু দিকে চাইল, তারপর উঠে গিয়ে দড়িটা টেনে ধরল। কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত নেমে তার পাশে দাঁড়াল, একটু নেচে নিয়ে বলল—'কি মজা! পাঁচশো বছর পরে এখানে মানুষের পা পড়ল।' তারপর নাক সি'টকে বলল—'কিসের পচা গন্ধ বেরুচ্ছে রে পাংখা?'

পংকজ আঙুল দেখিয়ে বলল—'ঐ যে। আমরা প্রথম নয়, আমাদের আগেও এখানে মানুষের পা পড়েছে।'

হনুমন্ত কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল, তারপর ঝোপের কাছে গেল; পংকজও নাকে কাপড় দিয়ে কাছে গেল। দু'জনে ঝোপের শুকনো ডালপালা সরিয়ে দেখল, একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। তার গা এবং মুখের ওপর একরাশ দড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছে, মানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শরীরের যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, তার হাড়গোড় ভেঙে চুর হয়ে গেছে।

ডালপাকানো দড়িগুলো সরিয়ে নেবার পর মৃত লোকটার মুখ দেখা গেল; হনুমন্ত তীক্ষ্ম নিশ্বাস টেনে বলে উঠল—'ফেকুরাম নাপিত।'

কিছুক্ষণ মৃত্যু-শিথিল মুখের পানে চেয়ে থেকে হনুমন্ত শঙ্কা-ভরা চোখ পংকজের পানে তুলল; পঙ্কজও একদৃষ্টে বীভৎস মড়ার পানে চেয়ে ছিল, বলল—'ওর কোমরের কাছে কি চকচক করছে!'

মৃতের পরনে ধুতি ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না; কোমরে গি'ট বাঁধা। হনুমন্ত চোখ বুজে সেই দিকে হাত বাড়িয়ে মুঠিতে কিছু তুলে নিল, তারপর হাত খুলে দেখল—এক মুঠি মোহর।

দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর দূরে সরে গিয়ে পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল। বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল।

ব্যাপারটা যে কী হয়েছিল তা এখন অনুমান করা যায়।—ফেকুরাম নাপিত ছিল ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। সে বুঝেছিল মাটিচাপা রাজ-বাড়িতে অনেক সোনাদানা আছে। একদিন সে চুপিচুপি তে'তুল গাছে দড়ি বে'ধে নীচে নামল, রাজবাড়ি খুঁড়ে সোনাদানার সন্ধান পেল। তখন সে এক ফন্দি করল: সোনাদানা যা পায় তাই নিয়ে পাটনায় যায়, সেখানে মাল বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোক ভাবে, ফেকু পাটনা থেকে রোজগার করে আনে। এইভাবে অনেক দিন চলল, ফেকুর চালাকি কেউ ধরতে পারল না। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। দু-তিন দিন আগে ফেকু আবার খাদে নেমেছিল, কিন্তু দড়িটা সাবধানে গাছের ডালে বাঁধেনি। নামবার সময় দড়ি আলগা হলেও খুলে যায়নি, কিন্তু ফেকু যখন কোমরে মোহর গুঁজে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল তখন দড়ি খুলে গেল। ফেকু অনেক দূর উঠেছিল কিন্তু

তেঁতুল গাছ বরাবর পেঁছুবার আগেই দড়ি খুলে গেল; ফেকু পঞ্চাশ-ষাট হাত নীচে পড়ল, তার দেহ একেবারে থেঁতো হয়ে গেল। লোকে জানে ফেকু পাটনায় গিয়েছে; কেবল মৌনীবাবা বোধহয় আসল কথা জানতেন।

হনুমন্ত চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল, পঙ্কজের কথায় চমক ভাঙল—'দুপুর গড়িয়ে গেছে। যা ভাববার পরে ভাবা যাবে। এখন চল্, দেখি রাজবাড়িতে কোথায় কি আছে।'

হনুমন্ত উঠে দাঁড়াল, মোহরগুলো মেলে ধরে বলল—'এগুলো কী হবে?'

পঙ্কজ বলল—'কি আর হবে। তোদের জিনিস, পূর্বপুরুষের সোনা; ফেকু চুরি করছিল। এখন তোরা নিবি।'

হনুমন্ত একটু দ্বিধাভরে মোহরগুলো রুমালে বেঁধে পকেটে রাখল, বলল—'চল্।'

সামনে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট পায়ে-হাঁটা পথের রেখা, ওরা সেই রেখা ধরে চলল। রেখাটা এঁকেবেঁকে ঢিপি-ঢাপা এড়িয়ে বড় ঢিপির দিকে গিয়েছে। ফেকুর যাতায়াতের ফলে বোধহয় এই পথ তৈরি হয়েছে।

বড় ঢিপিটা দূর থেকে দেখেও বেশ বোঝা যায়, একটা প্রাসাদ বহু কাল জলের তলায় থাকার পর কাদা আর পাঁকের নীচে চাপা পড়েছে; জল শুকিয়ে যাবার পর প্রাসাদের আদল ও গড়ন জমাট-বাঁধা কাদার ভেতর দিয়েও বেশ আন্দাজ করা যায়। একতলাটা মাটির নীচে বসে গেছে। দোতলা এবং চিলে কোঠা উঁচু হয়ে আছে। তার সারা গায়ে কাঁটাগাছের জঙ্গল।

ঢিপির কাছে পেঁছে তারা দেখল ফেকুরামের পায়ে-হাঁটা পথ শেষ হয়নি, ঢিপির গা ঘেঁষে পাশের দিকে গিয়েছে। তারা মোড় ঘুরল।

মোড় ঘুরে কয়েক পা গিয়েই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢিপির গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মুখ, তার পাশে একটা গাঁইতি আর একটা খন্তা দাঁড় করানো রয়েছে।

তারা সুড়ঙ্গের কাছে গেল। শুধু গাঁইতি আর খন্তা নয়, সুড়ঙ্গের মুখের মধ্যে রাখা রয়েছে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন।

সুড়ঙ্গের ভেতর দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সুড়ঙ্গ কোথায় কত দূরে গিয়েছে বোঝা যায় না, তবে একটা মানুষ নীচু হয়ে তার মধ্যে ঢুকতে পারে।

দুই বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বলা-কওয়ার কিছু ছিল না, ফেকু নাপিত তোড়জোড় করে এই সুড়ঙ্গ কেটে ভেতরে

ঢুকেছিল এবং মোহরের সন্ধান পেয়েছিল তা অতিবড় মূর্খও বুঝতে পারে।

পঙ্কজ হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা বাইরে আনল। দেখা গেল তার খোলের মধ্যে তেল আছে; শুধু তাই নয়, লণ্ঠনের মাথার ওপর একটা দেশলাই-এর বাক্স। ফেকুরাম খুব গোছালো লোক ছিল, সবরকম ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।

লণ্ঠন জেলে পঙ্কজ বলল—'চল্ এবার চল্লিশ চোরের গুহায় প্রবেশ করা যাক। ফেকুরাম অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছে। ফেকুরাম না থাকলে আমরা কি করতাম!'

লণ্ঠনের হাতল দাঁতে কামড়ে ধরে পঙ্কজ হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল; হনুমন্ত তার পেছনে রইল। যদিও মাথার ওপর বেশ খানিকটা জায়গা আছে, তবু হামা দিয়ে অগ্রসর হওয়াই সুবিধে।

লণ্ঠনের আলোয় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দশ-বারো হাত এগিয়ে যাবার পর পঙ্কজ বলল—'হনু, তোর রাজবাড়ির পাকা মেঝে এসে গেছে রে!'

'তাই নাকি!'

দু'জনে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, মাটির সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে, দু'পাশে পাথরের দেয়াল, ছাদও উঁচু। পঙ্কজ লণ্ঠন তুলে ধরে দেখতে লাগলঃ একটা লম্বা বারান্দার মতন জায়গা, প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে ভূমিকম্পের ঝাঁকানিতে ভেঙে পড়েনি, তার মধ্যে বেশী কাদামাটিও জমেনি। বারান্দার বাঁ দিকের দেয়ালে আগে বোধহয় দোরের কপাট ছিল, এখন কপাট অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দোরের ফোকর দেখা যাচ্ছে। এই ফোকরের মধ্যে আবার সুড়ঙ্গ। কিন্তু বেশী লম্বা নয়, দু-চার হাত গিয়ে আবার একটা ঘরের মতন জায়গা।

সেখানে ঢুকে ওরা লণ্ঠন ধরে ধরে চারদিক দেখল। ঘরটাতে কিছু মাটি জমেছিল, কেউ সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পরিষ্কার করেছে। ফেকুরাম ছাড়া আর কে হতে পারে? হয়তো এই ঘরে কাঠের সিন্দুকে দামী জিনিস ছিল; কাঠের সিন্দুক ও নশ্বর সবকিছু বহুকাল নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল সোনা হীরা মোতি নষ্ট হয়নি। ফেকু সেইসব জিনিস সংগ্রহ করতে আসত। এখন ঘরে সোনাদানা আর কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারা বারান্দা দিয়ে সামনের দিকে চলল। আরো কিছুদূর গিয়ে বারান্দা শেষ হয়েছে, সামনে দেয়াল। ওরা আলো ধরে দেখল, দেয়ালটা পাথরের কিন্তু তার মাঝখানে দোরের মতন চৌকস জায়গায় কাদা আর পাঁক জমাট হয়ে সিমেণ্টের মতন শক্ত হয়ে গেছে। ওরা টোকা মেরে দেখল, দেয়ালের মতন পুরু নয়।

ওপারে হয়তো আর একটা ঘর আছে।

হনুমন্ত বলল—'দ্যাখ, দেয়ালের গায়ে গাঁইতির দাগ; ফেকু বোধহয় ভাঙবার চেষ্টা করেছিল।'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। ও ঘরের সব সোনাদানা শেষ করে এইঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজ আর নয়, ফিরে চল্। সময়ের কোনো আন্দাজ নেই, হয়তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

হনুমন্ত বলল—'হ্যাঁ, মৌনীবাবা তেঁতুলতলায় বসে দড়ি পাহারা দিচ্ছেন। আজ চল, কাল আবার আসা যাবে, কি বলিস?'

'সে আর বলতে!'

দু'জনে বাইরে ফিরে এল। লণ্ঠন নিবিয়ে রেখে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় কিছুক্ষণ নিশ্বাস নিল। সন্ধ্যে হয়নি বটে, কিন্তু নীচে রোদ নেই, দূরে ওই তেঁতুল গাছের পাতায় নিবন্ত সূর্যের সোনালী আলো ঝিলমিল করছে।

যেতে যেতে হনুমন্ত বলল—'ফেকুরামের মড়াটা নিয়ে কী করা যায়! ওপরে তোলা আমাদের কর্ম নয়। তাছাড়া তুললেই গাঁয়ে জানাজানি হবে, আমাদের গুপ্তকথাও ফাঁস হয়ে যাবে।'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। কিন্তু মৌনীবাবাকে জানাতে হবে। তিনি অন্য কাউকে কিছু বলবেন না কিন্তু আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন।

দড়ি যেমন ঝুলেছিল তেমনি ঝুলছে। প্রথমে পঙ্কজ ওপরে উঠে গেল; সে পৌঁছুবার পর হনুমন্ত উঠল। মৌনীবাবা দড়ি আগলে বসেছিলেন, বললেন—'বম্ বম্!'

ওরা তখন মৌনীবাবার সামনে বসে সব কথা বলল, বাবা মন দিয়ে শুনলেন। শেষে হনুমন্ত বলল—'বাবা, কাল আবার আমরা নামব। একটু সকাল সকাল আসব। কিন্তু ফেকুর মড়াটা নিয়ে কী হবে?'

বাবা হাত তুলে আশ্বাস দিলেন, যেন বললেন—ভাবিসনে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গাছের ডাল থেকে দড়ি খুলে নিয়ে তারা মৌনীবাবার সঙ্গে আমবাগানে গেল, সেখানে চালাঘরে দড়ি লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে গেল। তাদের অভিযানের খবর কেউ জানল না।

সন্ধ্যের পর ঘরে দোর বন্ধ করে তারা পরামর্শ করতে বসল। হনুমন্ত বলল—'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, মোহরগুলো মৌনীবাবার কাছে রেখে এলেই হত, বাড়িতে রাখার জায়গা নেই, বাইরে রাখলে চাকরদের নজরে পড়বে। মাকে দিলে মা জানতে চাইবেন কোথা থেকে মোহর এল।—কি করি বল তো?'

পঙ্কজ ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত নিজেই বলল—

'এক কাজ করা যাক, ওগুলো তোর সুটকেসে রেখে দে। তোর সুটকেস কেউ খুলবে না।'

পঙ্কজ বলল—'আচ্ছা।'

মোহরগুলো পঙ্কজের সুটকেসে রেখে চাবি লাগিয়ে তারা আবার মুখোমুখি বসল। পঙ্কজ বলল—'কাল সকাল সকাল বেরুতে হবে। মা কিছু সন্দেহ করবেন না তো?'

হনুমন্ত একটু ভেবে বলল—'মাকে যদি বলা যায় আমরা জঙ্গলে পাখি-শিকার করতে যাচ্ছি তাহলে মা কিছু সন্দেহ করবেন না।'একটা অসুবিধে, বন্দুকটাও নিয়ে যেতে হবে; বন্দুক কার্ট্রিজ সব সঙ্গে নিতে হবে। উপায় কি! ওগুলো মৌনীবাবার ঝোপড়িতে রেখে গেলেই হবে।'

পঙ্কজ বলল—'একটা জোরালো আলো যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত! লণ্ঠনের আলোয় ভালো দেখা যায় না।'

হনুমন্ত বলল—'দাঁড়া, ঠিক হয়েছে। বাবুজীর একটা ইয়াব্বড় টর্চ আছে, দিনের মতন আলো হয়। সেটা চুরি করব।'

রাত্রে খাবার সময় হনুমন্ত মাকে শিকারে যাবার কথা বলে রাখল। মা বললেন—এই জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরে পাখি কোথায় পাবি!'

হনুমন্ত বলল—'না পাই, বন্দুক ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াব।'

'তা বেড়াস। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবি কিন্তু।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ দুই বন্ধু খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে বেরুল। হনুমন্তর কাঁধে দোনলা বন্দুক, পঙ্কজের হাতে টর্চ আর কার্তুজের থলি।

আমবাগানে গিয়ে তারা দেখল, মৌনীবাবা ধুনির সামনে বসে আছেন। হনুমন্ত বলল—'বাবা, এই বন্দুকটা ঝোপড়িতে রেখে দড়িটা নিয়ে যাব।'

বাবা মাথা নাড়লেন, হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নিজের হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হনুমন্ত যখন দড়ির কুণ্ডলী একচালা থেকে বার করে আনল তখন তিনি বন্দুক কাঁধে ফেলে কার্তুজের থলি হাতে তেঁতুল গাছের দিকে পা বাড়ালেন।

দু'জনে মুখ তাকাতাকি করল। হয়তো বাবা নিজের শূন্য আস্তানায় বন্দুক ফেলে রেখে যেতে চান না; ঘর থেকে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়—

তেঁতুলতলায় পেঁছে বাবা প্রথমে দড়ির একটা খুঁট তেঁতুল গাছের ডালে বেঁধে ফেললেন, অন্য খুঁটে বন্দুক আর কার্তুজের থলি বেঁধে নীচে নামিয়ে দিলেন। তারপর হনুমন্তকে ইশারা করলেন। আজ হনুমন্ত আগে নামল, পরে পঙ্কজ। তারা আন্দাজ করল, বাবার

ইচ্ছে বন্দুকটা তাদের সঙ্গে থাকে।

নীচে নেমে তারা একটা নতুন দৃশ্য দেখল। যেখানে ফেকুরামের মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে দশ-বারোটা শকুনি এসে জুটেছে। শকুনিরা খুবই ব্যস্ত। দুই বন্ধু সেদিকে তাকালো না। তাড়াতাড়ি দড়ি থেকে বন্দুক আর থলি খুলে নিয়ে রাজবাড়ির ঢিপির দিকে চলল। যেতে যেতে হনুমন্ত বলল—'বাবা নিশ্চয় জানতেন শকুনি আসবে।'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। শকুনিরা হল প্রকৃতির সেরা মুদ্দাফরাশ। আমরা যখন মড়া নাড়াচাড়া করছিলাম তখন বোধহয় ওরা দেখতে পেয়েছিল।'

'কিন্তু বাবা আজ আমাদের সঙ্গে বন্দুক দিলেন কেন ভাই? এখানে কি হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে নাকি?'

'কই, কাল তো কিছু চোখে পড়েনি। যাহোক, বন্দুক সঙ্গে আছে ভালই। বাঘভালুক না থাক, সাপখোপ থাকতে পারে।'

সুড়ঙ্গের সামনে পৌঁছে পঙ্কজ বলল—'আজকের প্রোগ্রাম কি?'

হনুমন্ত বলল—'ফেকুরাম যে দেয়ালটা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল সেটা আগে ভাঙতে হবে। ওখানে নিশ্চয় অনেক দামী মাল আছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে গাঁইতি আর শাবল চালালে ভাঙতে পারব না?'

পঙ্কজ বলল—'চেষ্টা করতে দোষ কি! কিন্তু কি রকম দামী মাল তুই আশা করিস?'

হনুমন্ত এদিক ওদিক চেয়ে বলল—'তা কি বলা যায়। হয়তো কিছুই নেই। তবু—'

দু'জনে উঠল, বন্দুক আর কার্তুজের থলি বাইরে রেখে লণ্ঠন জেলে সুড়ঙ্গে ঢুকল। তাদের সঙ্গে রইল টর্চ গাঁইতি আর শাবল।

সুড়ঙ্গের শেষ বরাবর পৌঁছে হনুমন্ত টর্চ জ্বালল; তীব্র আলোয় সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ ভরে গেল। লণ্ঠনের আলো তার কাছে টিমটিম করতে লাগল।

লণ্ঠন আর টর্চ নামিয়ে রেখে ওরা শাবল আর গাঁইতি হাতে নিল; পঙ্কজ দেয়ালের সামনে গিয়ে দু'হাতে শাবল তুলল, বলল—'এক সঙ্গে এক জায়গায় লাগাবি। রেডি ? ওয়ান টু থ্রি।'

শাবল আর গাঁইতি একসঙ্গে দেয়ালের গায়ে পড়ল। ঠং করে শব্দ হল। শব্দ শুনে বোঝা যায় ইট-পাথরের দেয়াল নয়; কিন্তু উপাদান যা-ই হোক, এক চুল নড়ল না।

আরো আট-দশ বার শাবল গাঁইতি চালিয়েও কোনো ফল হল না, দেয়াল অটুট দাঁড়িয়ে রইল। পঙ্কজ আর হনুমন্ত দু'জনেরই গা ঘামে ভিজে গেছে, দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। হনুমন্ত বলল—'চল্ বাইরে

যাই, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সুড়ঙ্গের মধ্যে বায়ু চলাচল কম. ওরা ফিরে এসে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বসে খানিক জিরিয়ে নিল। বাইরে রোদ্দুর আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাতাসও আছে।

গায়ের ঘাম শুকোতে না শুকোতে পঙ্কজের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল—'হনু!'

'কি রে!'

'এক কাজ করলে হয় না? দোনলা বন্দুকে দুটো টোটা পুরে যদি একসঙ্গে ফায়ার করা যায়—'

হনুমন্ত চোখ গোল করে খানিক চেয়ে রইল. তারপর পঙ্কজের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'পাংখা! সাবাস তোর বুদ্ধি। একথা তো এতক্ষণ মাথায় আসেনি!' একটু থেমে বলল—'দ্যাখ. মৌনীবাবা নিশ্চয় অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ পুরুষ. তাই বন্দুকটা আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন।—তুই আগে কখনো বন্দুক ছুঁড়েছিস?'

'অনেকবার ছুঁড়েছি। হাঁস মেরেছি. খরগোশ মেরেছি। আমার বাবারও বন্দুক আছে।'

'তবে. তুইই ফায়ার কর।'

'কেন. তুইও তো অনেক বন্দুক চালিয়েছিস।'

'তা চালিয়েছি। কিন্তু বুদ্ধিটা তোর' নে. বন্দুকে টোটা ভর।'

'এখন ভরব না. ভেতরে গিয়ে ভরব।' থলি থেকে পঙ্কজ কার্তুজগুলো বার করল। দশটা কার্তুজের মধ্যে গোটা ছয়েক এস্ এস্ জি ছিল. পঙ্কজ সেগুলো পকেটে পুরে বলল—'চল্। তুই টর্চ নিয়ে আগে যা।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে তারপর খাড়া হেঁটে তারা দেয়ালের সামনে উপস্থিত হল। দুজনেরই মনে হল তারা একটা বিরাট রহস্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুক দুরুদুরু করে উঠল।

পঙ্কজ চাপা গলায় বলল—'কত দূর থেকে ফায়ার করব?'

হনুমন্ত বলল—'অন্ততঃ দশ-বারো হাত দূর থেকে. নইলে ছর্রা ছিটকে গায়ে লাগতে পারে। পাংখা. তুই বরং বন্দুক আমাকে দে, আমি এ বন্দুক অনেকবার ছুঁড়েছি. এর ধাত জানি।'

'না, আমি ফায়ার করব। কিন্তু বন্ধ জায়গায় ভীষণ শব্দ হবে। হনু, তুই কানে আঙুল দিয়ে থাকিস, নইলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে।' 'আর তুই?'

'আমি কানের ওপর শক্ত করে রুমাল বাঁধব। এই দ্যাখ্।'

রুমালকে কোনাকুনি ভাবে দুপাট করে পঙ্কজ মাথা ঘিরে

কপালের ওপর বেঁধে ফেলল, কান চাপা পড়ল। তারপর বন্দুকের দুই নলে টোটা পুরে দেয়াল থেকে দশ পা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হনুমন্ত তার পাশে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙুল পুরে দিল। টর্চ জ্বালা হল না, কেবল লণ্ঠনের আলো।

'এইবার!' বলে পঙ্কজ বন্দুকের ঘোড়া টিপল।

বিকট শব্দ হল। সংকীর্ণ জায়গায় ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি মিলে যেন দৈত্য দানবের মতন লড়াই করতে লাগল। ওপর থেকে খানিকটা মাটি খসে মেঝেয় পড়ল। লণ্ঠনের কাঁচ চিড় খেয়ে গেল।

পঙ্কজ আর হনুমন্ত ছুটে দেয়ালের কাছে গেল। দেয়াল ভেঙে পড়েনি, কিন্তু তার চার পাশ থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। দু'জনে অবুঝের মতন মুখ তাকাতাকি করল, তারপর পঙ্কজ লাফিয়ে উঠে বলল—'বুঝেছি. দেয়ালের ওদিকে হাওয়া নেই, এদিক থেকে হাওয়া ঢুকছে, তারই শব্দ। তার মানে দেয়াল আলগা হয়েছে, আবার বন্দুক ছুঁড়লেই—'

হনুমন্ত বলল—'এবার আমি বন্দুক ছুঁড়ব।'

'আচ্ছা।'

পঙ্কজ বন্দুকের দুই নলে আবার টোটা ভরে হনুমন্তর হাতে দিল, নিজের মাথা থেকে রুমাল খুলে তার মাথায় বেঁধে দিল, তারপর কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়াল।

হনুমন্ত দেয়াল লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল—গুড়ুম।

প্রতিধ্বনির শব্দ থেমে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শব্দ হল—ধপাস। লণ্ঠনটা দু'বার খাবি খেয়ে নিভে গেল।

টর্চটা পঙ্কজ কনুই-এর খাঁজে চেপে রেখেছিল, এখন সেটা জ্বেলে সে দেয়ালের দিকে আলো ফেলল; দেখল দেয়াল নেই, ছর্‌রার ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। দু'জনে একসঙ্গে সেইদিকে ছুটল।

টর্চের আলোয় একটি ঘরের অভ্যন্তর উদ্ভাসিত হল। বেশ বড় একটি শয়নকক্ষ। দরজা জানালা আগে ছিল, এখন দেয়ালে পরিণত হয়েছে। ঘরে অনেক রকম সেকেলে আসবাব সাজানো রয়েছে, উঁচু পিঁড়ি, স্ফটিকের ভৃঙ্গার, দীপদণ্ড, আরো কত কি; এগুলো অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। টর্চের তীব্র ছটা গিয়ে পড়েছিল ঘরের মাঝখানে। একটি পালঙ্কে শয্যা পাতা রয়েছে, বিচিত্র কারুকার্যের একটি পালঙ্ক, আর সেই পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছে দু'টি মানুষ।

হনুমন্ত আর পঙ্কজ অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যে-দু'টি মানুষ পালঙ্কে শুয়ে আছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি কিশোর যুবা,

আর তার পাশে শুয়ে আছে বারো-তেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা, অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। দু'জনেই মৃত। কিন্তু তাদের দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে, ঘরে লোক ঢুকেছে সাড়া পেয়ে এখনি জেগে উঠবে।

হনুমন্ত গলার মধ্যে একটা শব্দ করে পঙ্কজের কাঁধ চেপে ধরল 'পাংখা! চিনতে পারছিস?'

পঙ্কজের গলা প্রায় বুজে গিয়েছিল সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল - 'পারছি। তুই আর তোর ভাবী বউ রামদুলারী—

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই, তারপর হনুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলল -'ওর নাম ছিল মৈথিলী। চেহারা পাঁচশো বছর আগে যা ছিল এ জন্মেও তাই আছে। সে রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ গভীর রাত্রে এল ভূমিকম্প আর জলোচ্ছ্বাস—ঘরের দরজা জানালা দিয়ে হাওয়া বাতাসের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল—তারপর কী যে হল'

পঙ্কজ বলল -'ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই দেখে তোরা আবার বিছানায় গিয়ে শুলি ঘরের হাওয়া ফুরিয়ে আসতে লাগল, দীপদণ্ডে দীপ নিভে গেল তোরা অজ্ঞান হয়ে পড়লি তারপর তোদের মূর্ছা মহানিদ্রায় পরিণত হল -'

হনুমন্ত হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে বলল -'আমি—আমার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—আমি আর মৈথিলী আমি আর মৈথিলী-' সে আর বলতে পারল না তার গলা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল।

দু'জনে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। এইভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল তার ঠিকানা নেই। কেবল টর্চের উগ্র আলো পালঙ্কের দুটি মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

হঠাৎ পঙ্কজ চিৎকার করে উঠল—'একি! একি! এ কি হচ্ছে!'

তাদের চোখের সামনে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। পালঙ্কে শোয়া মূর্তি দুটি কর্পূরের পুতুলের মতন উবে যেতে লাগল। পঙ্কজ আর হনুমন্তের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে তাদের মুখ হাত পা সব শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় মিশিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পালঙ্কে পড়ে রইল ধুলোগুড়োর মতন খানিকটা পদার্থ। পাঁচশো বছর বন্ধ ঘরের মধ্যে যা অটুট ছিল আলো-বাতাসের স্পর্শে দেখতে দেখতে তা অণুপরমাণুতে পরিণত হল।

রাত্রে পঙ্কজ আর হনুমন্ত নিজের নিজের খাটে শুয়ে চিন্তা করছিল। দু'জনেরই মাথা উত্তপ্ত হয়েছে, ঘুম আসছে না। কিন্তু কথা কইবার মতন মনের অবস্থা নয়।

মোহাচ্ছন্ন মন নিয়ে তারা নন্দনগড়ের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কেউ কোনো কথা বলল না, নির্দিষ্ট পথে ফিরে চলল। দড়ির কাছে এসে পঙ্কজ আবছায়া ভাবে অনুভব করল, ফেকুরামের মড়াটা নেই, শকুনিগুলোও অদৃশ্য হয়েছে।

ওপরে এসে মৌনীবাবার মুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল বাবা সবই জানেন বলেই তাদের নন্দনগড় দুর্গের রহস্য সন্ধানে যেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কি করে জানলেন? হয়তো তাঁর দৈবশক্তি আছে। সাধুরা সকলেই ভণ্ড নয়, দু'চারজন খাঁটী সাধু থাকতে পারে—

দুপুর রাত্রে হনুমন্ত উঠে এসে পঙ্কজের খাটের পাশে বসল, বলল—'পাংখা, জেগে আছিস?'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। কি খবর?'

হনুমন্ত বলল—'আমি ঠিক করেছি, রামদুলারীকে বিয়ে করব।'

পঙ্কজ মুখ টিপে হাসল—'তাহলে বিবাগী হবি না?'

হনুমন্তও হাসল—'উঁহু, এখন নয়। পাঁচশো বছরের পুরনো বউকে বিয়ে না করলে অন্যায় হবে।'

পঙ্কজ উঠে বসল—'আচ্ছা হনু, আগের জন্মের সব কথা তোর মনে পড়েছে?'

'সব কথা নয়, অনেক কথা মনে পড়েছে। চেষ্টা করলে বোধ হয় সব কথা মনে পড়বে।'

'তোর বউ-এর নাম ছিল মৈথিলী। তোর কি নাম ছিল?'

'আমার নাম ছিল রঘুনন্দন সিং।'

'হুঁ। আগের জন্মে তোদের নামের বেশ জোড় মিলেছিল, এজন্মে গরমিল হল কেন?'

'গরমিল কোথায়?'

'তুই হলি হনুমন্ত, মানে হনুমান, তোর বউ রামদুলারী, মানে সীতা। গরমিল হল না?'

'তুই কিচ্ছু জানিস না। আমার পুরো নাম হনুমন্তরাজ সিং; মানে হনুমান নয়, হনুমানের মালিক। হনুমানের মালিক কে? রামচন্দ্র। বুঝলি?'

'বুঝলাম। এবার তুই আগের জন্মের গল্প বল্, যা মনে আছে সব বলবি, কিচ্ছু বাদ দিবি না।'

'আচ্ছা, শোন তবে—'

হনুমন্ত গল্প বলতে আরম্ভ করল—

কিন্তু সে-গল্প অন্য গল্প।